BanglaBook.org

যে-বৃষ্টির জন্ম হয়নি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ

ওরা তিনজন। পিঠে রুকস্যাক, গ্রিপ সোলের জুতো, পর্যাপ্ত শীতপোশাক পরে সরকারি লজ থেকে বেরিয়ে এল। এখন সকাল আটটা।

বিবর্ণ স্যাঁতসেঁতে দোকান-বাড়ির ফাঁক গলে সোনারোদ রাঙিয়েছে পাহাড়ি পথের শেষ শহর।

বুক ভরে শ্বাস নিল তিন বন্ধু। হাওয়ায় হিমালয়ের আবছা গন্ধ। ছাব্বিশের আশেপাশে এই তিনটি ছেলের মুখ-চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিন পর নির্মল এক ভোরের স্পর্শ পেল তারা।

কাল সন্ধেবেলা গাড়ি করে এখানে যখন পৌঁছেছিল, মন খারাপ হয়ে যায় মলিন শহরটা দেখে। হাতে গোনা কয়েকটা সিমেন্ট ও কাঠের বাড়ি, অপরিচ্ছন্ন দু'-চারটে দোকান, টিমটিমে ইলেকট্রিক বাতি, সরকারি লজটাও কলকাতার এঁদো গলির মেসবাড়ির মতো। যেমন ভেবে রেখেছিল তার সঙ্গে কিচ্ছুটি মেলেনি।

সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে বেলার দিক করে পৌঁছোয় নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে পাঁচ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে এই শহর। খুবই ক্লান্ত ছিল ওরা। শহরের চেহারা দেখে আরও অবসন্ন হয়েছিল। রাস্তায় ইতিউতি পুরনো আমলের লজঝড়ে জিপ। লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পাওয়া যাচ্ছিল দেশি মদ আর পানমশলার গন্ধ। রেস্টোরেন্ট অথবা এসটিডি বুথের মধ্যে রঙিন টিভির কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট ছবি। অলস দোকানদার চেয়ে আছে টিভির দিকে।

সন্ধের গায়ে ভর দিয়ে নামছিল ভারী ঘন অন্ধকার রাত। তার সঙ্গে বাড়ছিল ঠান্ডা।

তিন বন্ধু লজের বারান্দা ছেড়ে সেঁদিয়ে যায় ঘরে। আড্ডা তেমন জমেনি। লজে রান্নার ব্যবস্থা আছে, খাবার পাওয়া যায়। গরম গরম ডাল,

BanglaBook.org

ভাত, তরকারি খেয়ে তিনজনেই শুয়ে পড়েছিল সাততাড়াতাড়ি। ঘুম আসতে দেরি হয়নি।

সকালে উঠে দু'রাউন্ড চা খেয়ে, ফ্রেশ হয়েছে ওরা। ধড়াচুড়ো পরে চেকআউট করেছে লজ। রাস্তায় আসতেই মনটা ভাল হয়ে গেল।

বাপ্পা বলল, আচ্ছা, আমাদের ট্রেকিং কি শুরু হয়ে গেছে?

রায়ন, সুগত উত্তর দিল না। পিচের রাস্তা সংগোপনে খাড়াই হচ্ছে। খুলে গেছে দু'পাশের দোকানপাট। পুরনো জিপগুলোর হুড খুলে ধোয়ামোছা চলছে। দু'-একটা গাড়িতে ইতিমধ্যেই উঠে বসেছে লোকাল প্যাসেঞ্জার। ওরা যাবে নীচের আর এক পাহাড়ি শহরে। সুগতরা হেঁটে উঠবে প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচুতে।

উত্তর না পেয়ে প্রশ্নটা আবার করল বাপ্পা। সুগত বলে, কেন, তুই কি পাঁজি দেখে ট্রেকিংয়ের শুভ সময়টা বার করতিস?

না, তা নয়। এত বড় একটা অভিযানে বেরোলাম আমরা, কোথাও কোনও আলোড়ন নেই। বাড়ি থেকে যেমন বাজার করতে বেরোই সেরকমই।

রায়ন হাসতে হাসতে বলে, তুই বোধহয় আশা করেছিলি ট্রেকিং শুরুর সময় দু'পাশে বিউগল বাজবে, ছোট ছোট বাচ্চারা পতাকা নাড়বে। তুইও হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যাবি বীরদর্পে।

কটাক্ষ গায়ে মাখল না বাপ্পা। বলল, দাঁড়া, তিনজনে একসঙ্গে সিগারেট ধরাই। এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের এক্সপিডিশন।

প্রস্তাবটা মনঃপূত হয় বাকি দুই বন্ধুর। দাঁড়িয়ে পড়ে ওরা। বাপ্পা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে থাকে।

এমন সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে ওদের কাছে এসে পৌঁছোয় নরেন তামাং, ম্যায়নে আভি লজ মে যা কে শুনা আপলোগ নিকল পড়ে।

তো? কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করে বাপ্পা।

করুণ আর্তি নিয়ে নরেন তামাং বলে, চলিয়ে না বাবু, হাম লে যায়েঙ্গে আপ লোগো কো। সামান ভি ক্যারি করেগা। কই তকলিফ।

বাপ্পা এবার স্পষ্টত বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, দুর বাবা, কাল বলেছি তো গাইড লাগবে না আমাদের। হাম একবার আয়া।

BanglaBook.org

মিথ্যে বলল বাপ্পা। কোনওদিনই এ পথে সে ট্রেক করেনি, এমনকী এই প্রথম সে হেঁটে পাহাড়ে উঠছে। বাকি দু'জনও তাই।

নরেন তামাং পিছু ছাড়ে না। হেঁটে যাচ্ছে বাপ্পাদের সঙ্গে। কাল তিন বন্ধু গাড়ি থেকে নামতেই নরেন তামাং এসে ধরেছিল। কার্ডও দেখিয়েছিল সরকার স্বীকৃত গাইড হিসেবে। সুগত তখনই সপাটে 'না' বলে দেয়। বেড়াতে এসে অজানা-অচেনা কাউকে সঙ্গে নিতে তাদের খারাপ লাগে। মাল বওয়ানোটাও খুব অস্বস্তিকর। তা ছাড়া লোকটা সারাক্ষণ বকবক করবে।

সুগতরা রাজি হচ্ছে না দেখে নরেন ভয় দেখিয়েছিল, এই রাস্তায় গাইড ছাড়া কেউ যায় না। রাস্তা হারিয়ে ফেলার ভয় আছে।

বাজে কথা। বাপ্পা এমন লোকের কাছেই সব জেনেবুঝে এসেছে, যে বিনা গাইডে এই রুটে চারবার ট্রেক করেছে।

কাল অনেকক্ষণ পিছনে লেগে থেকে কখন যেন চলে গিয়েছিল নরেন তামাং। রাতে কথা তুলেছিল সুগত, গাইড একটা নেওয়াই যাক। এতটা রাস্তা

কোনও দরকার নেই। এখানে কোন এমন পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল যে গাইডের গল্প শুনতে হবে? আর রাস্তা সম্বন্ধে আমি জেনেই এসেছি, পি ডব্লু ডি-র সাইন, মাইলস্টোন সবই আছে। রাস্তাটা শুধু পাকা হয়নি এই যা— বলেছিল বাপ্পা।

সুগত বলে, কত অচেনা গাছপালা, পাখি, নদী, ঝরনা পড়বে রাস্তায়। গাইড নামগুলো বলতে পারত।

রায়ন কম কথা বলে। সব শুনে ওর সেই ভয়ংকর উদাসীন হাসিটা হেসে বলেছিল, গাইডরা বেশির ভাগই ভুলভাল বলে, ওদের ভেটারেন্টদের বানানো গল্পকে সত্যি মনে করে ওরা। তা ছাড়া সব কিছুর নাম-ধাম জানা কি ভাল? কী লাভ হয়?

সেই যে চাপা পড়ে গিয়েছিল গাইডের প্রসঙ্গ, আর ওঠেনি। নরেন তামাংয়ের তো ভুললে চলবে না ট্যুরিস্টদের কথা, এটা তার রুজি।

দোকান-বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছে সুগতরা। এখন দু'পাশে অগভীর জঙ্গল। আশপাশে লোকজন নেই। চওড়া পিচের রাস্তাটা এগিয়ে গেছে

BanglaBook.org

স্মার্টলি। নরেন তামাং খানিকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলে ওঠে, শর্টকাট রাস্তা হামলোগো কা জিতনা মালুম, আপলোগো কা নেহি। জলদি পঁহুচা দেঙ্গে।

হামারা কই জলদি নেহি। বলে সুগত।

ফির ভি হাতমে টাইম রাখনা ঠিক রহে গা। আভি বারিস কা মৌসম। কব কাঁহা রাস্তা বন্ধ হো জায়গা কোই ঠিক নেহি। দুসরা রাস্তাসে লে যানে পড়ে গা আপলোগো কো।

লোকটা প্রকারান্তরে জোর খাটাচ্ছে বলেই মনে মনে বেঁকে বসছে তিন বন্ধু। রায়ন, সুগত মুখ চাওয়াচায়ি করে। নরেন তামাংয়ের উদ্দেশে রায়ন বলে, ঠিক আছে, তুমি তো গাইড, বলো তো এখন আমরা যে-পাহাড়ে উঠছি তার পা'টা কোথায়?

নরেন তামাংয়ের হাঁটা থেমে গেছে, অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে তিনজনের দিকে। রায়ন বলে যাচ্ছে, বলো না ভাই 'পা' কোথায়? সেখানে প্রণাম করে নিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠব। এই ক'দিন ওঁর গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটেচলে বেড়াব, বিরক্ত হবেন নিশ্চয়ই। একটা প্রণাম ঠুকে নিয়ে ওঠা ভাল।

নরেন তামাং তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পিছু হটতে থাকে। যতটা সহজসরল ভেবেছিল এই তিন ইয়াং ট্যুরিস্টকে, তা এরা নয়। বরং পাহাড়ি প্রকৃতির পক্ষে এরা একটু বেশিই চালাক। খাপ খাওয়াতে পারবে তো পাহাড়ের সঙ্গে?

নরেন তামাংয়ের মনের আশঙ্কা মুখ দেখে পড়তে পারে না তিন বন্ধু। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে ঘুরে যায়। নরেন তামাং নামতে থাকে নীচের বাজারে।

পিচের রাস্তা বাঁক নিল। সুগত বলে, হ্যাঁরে রায়ন, তোর মাথায় এসব কথা আসে কোথা থেকে! পাহাড়ের 'পা'। মাইরি পারিসও বটে!

বাপ্পা হাসছে। বলে, লোকটা হেভি ঘাবড়ে গেছে! দ্যাখ হয়তো এখন নীচে গিয়ে পাহাড়ের 'পা' নিয়ে আলোচনা করছে।

রায়ন হাসছে না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, পাহাড়ের 'পা' কিন্তু আছে। 'পাহাড়ের পাদদেশ' কথাটা শুনিসনি। আক্ষরিক অর্থে দুটো পায়ের কথাই ভাবছিস কেন তোরা?

BanglaBook.org

বাকি দু'জন একটু থমকায়। সুগত বলে, তাই যদি বলিস 'পাহাড়ের পাদদেশ' আমরা শিলিগুড়িতে ছেড়ে এসেছি। তুই বেচারাকে এখানে খুঁজতে বললি কেন?

আমি সেই পাহাড়ের কথা বলিনি। শিলিগুড়ি থেকে এত দূর পর্যন্ত পাহাড়কে দাস বানিয়ে রেখেছে মানুষ। চওড়া পিচঢালা রাস্তা। সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে ঝকঝকে গাড়ি। দৌড় শেষ এখানে এসে। শুধু ল্যান্ডরোভার জিপ যাবে ওপরে। তাও দিনে হয়তো একটা কি দুটো যায়। আর কোনও গাড়ির যাওয়ার ক্ষমতা নেই। মানুষ যাবে হেঁটে। আমি এই রিমোট পাহাড়টার কথা বলেছি।

কিন্তু তার পা কোথায় পাবি তুই? বিস্ময় মিশিয়ে প্রশ্ন করে বাপ্পা।

পাব। একটু পরেই।

আর একটা বাঁক নেয় রাস্তা। প্রতি বাঁকেই বেশ খাড়াই হচ্ছে পথ। একদম নির্জন হয়ে গেছে আশপাশ। বাতাসে গাছপালার নিবিড় গন্ধ।

খানিক আগে বার করা সিগারেটের প্যাকেটটা বাপ্পার হাতে, ধরানো হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে এখন একটা ধরায়। তিন বন্ধু এখন পাশাপাশি নেই, সামনে পিছনে হয়ে গেছে। সব থেকে আগে রায়ন।

ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বাপ্পা লক্ষ করে রায়ন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে, তাদের দিকে ফিরে হাসছে।

বাপ্পার থেকে ফুট দশেক সামনে হাঁটছে সুগত, রায়নকে বলে, কী হল, হাসছিস কেন?

রায়ন হাতের ইশারায় ডাকে। বলে, দেখে যা।

সুগত বাপ্পা জানে রায়নের বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা অশেষ, এই ট্যুরে অনেক কিছুই দেখতে হবে তাদের। তাড়াহুড়ো করে না। একই গতি বজায় রেখে দুই বন্ধু এসে পৌঁছোয় রায়নের কাছে।

রাস্তার দিকে আঙুল নির্দেশ করেছে রায়ন। বলে, এই দ্যাখ, পাহাড়ের পা।

পিচরাস্তা শেষ হয়ে বোল্ডার ফেলা পথ শুরু হয়েছে এখান থেকে। পুরোপুরি না হলেও বাপ্পা আন্দাজ করতে পারে কেন এই জায়গাটাকেই 'পাহাড়ের পা' বলছে রায়ন। এখান থেকেই শুরু হয়েছে দুর্গম গিরিপথ।

BanglaBook.org

চল, প্রণামটা সেরে নিই। বলে, রায়ন সত্যি সত্যি মঞ্চে ওঠার স্টাইলে বোল্ডারের রাস্তাটাকে প্রণাম করে। সুগত, বাপ্পা অনুসরণ করে রায়নকে। এই তিনজন মোটেই তেমন সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। মজার ভঙ্গিতে প্রণামটা সারলেও, মনের মধ্যে কোথাও কি ঘাপটি মেরে বসে আছে অজানা পাহাড়ি পথের প্রতি সম্ভ্রম?

বাপ্পার থেকে সিগারেটের শেষ অংশ নিয়ে নেয় সুগত। পাথরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রায়ন বলে, একটা লাঠি হাতে থাকলে হাঁটতে সুবিধে হত।

বাপ্পার কাছে ছ'ইঞ্চির ধারালো ছুরি আছে। সদ্ব্যবহারের সুযোগ আসছে দেখে উৎসাহিত হয়। বলে, জঙ্গল থেকে কেটে নিয়ে আসব তিনটে লাঠি?

সুগত বলে, এখন থাক। পরে যখন খুব অসুবিধে হবে, তখন কাটিস। এখনই লাঠির ওপর ডিপেন্ড করার কোনও মানে হয় না।

রায়নের হাঁটা দেখে বাপ্পা বলে ওঠে, তোর স্টেপিং ভুল হচ্ছে। ছোট ছোট স্টেপ কর আর নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নে, মুখ বন্ধ রাখবি।

ট্রেকিংয়ে আসার আগে বাপ্পাই একমাত্র কোনও এক পাহাড়-অভিজ্ঞ দাদার কাছে হোমওয়ার্ক সেরে এসেছে। সুগত, রায়ন ঠিকই করে রেখেছে ওর কথা শুনে চলবে। এর আগে ওরা তিনজন মিলে নানান জায়গায় বেড়াতে গেছে, ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

তিনজন কলেজ সূত্রে বন্ধু। থাকে ভিন্ন জায়গায়। সুগত মানিকতলা, বাপ্পা বেলুড়, রায়ন আগে থাকত বাগবাজারে যৌথ পরিবারে, এখন বরানগরের সিঁথিতে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে বাবা।

তিন বন্ধু পড়ত বিদ্যাসাগর কলেজে। বাংলা অনার্স। সেকশনে মাত্র দশজন ছেলে, বাকি সব মেয়ে। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে ছেলেদের গ্রুপের ইউনিটি ছিল অটুট। পাশ করার পর কে যে কোথায় ছড়িয়ে গেল! কোনও এক আশ্চর্য কারণে এই তিন বন্ধু যোগাযোগ রেখে চলেছে।

কলেজে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে থাকাকালীন এরা কিন্তু বুঝতে পারেনি, তাদের তিনজনের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে। হইহট্টগোলের মধ্যে অজান্তে

BanglaBook.org

একে অপরকে পছন্দ করে নিয়েছিল। গ্র্যাজুয়েশনের পর আবিষ্কার করে তিনজন একটা ইউনিট। ফলে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়।

যে যত কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, প্রত্যেক শনিবার এরা মিট করে, হয় কফি হাউস নয়তো নন্দন চত্বরে।

তিনজনের কেউই এখন বেকার নয়। বাপ্পা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। এক ঘণ্টার ওপর ট্রেন জার্নি করে গ্রামের স্কুলে পড়াতে যায়। সুগতর ব্যাবসা। নানান স্টেশনারি জিনিসের ডিলারশিপ নিয়েছে সে। রায়ন চাকরি করে তার মামার ফ্যাক্টরিতে। সুপারভাইজার।

কলকাতায় এখন বীভৎস গরম। লেচি বেলে রাস্তায় ফেলে দিলে রুটি হয়ে যাবে। মানুষজন তুলেছে ত্রাহি ত্রাহি রব। বাপ্পার স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। ওই প্রথম হিড়িক তুলল, চল, নর্থ বেঙ্গলের দিকে কোথাও ঘুরে আসি। তারপর একথা সেকথায় ট্রেকিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্পোর্টসের স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এদের। মোটামুটি স্বাস্থ্য। তবু পাহাড়ে হাঁটার ইচ্ছা প্রকাশ করার কারণ, তিনজনই নির্জনতাপ্রিয়, প্রকৃতিবিলাসী।

ট্রেকিং রুটের দৈর্ঘ্য নব্বই কিলোমিটার। সব থেকে উঁচুতে সান্দাকফু। সেখান থেকে অন্য পথে নেমে আসা হবে। ওরা খবর নিয়ে জেনেছে, এই পথটুকু পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সের মানুষজন দিব্যি ট্রেক করে। মারাত্মক কঠিন পথ নয়। সেই ভরসায় বেছেছে জায়গাটা।

এই টোটাল রুটটা যে তাদের কভার করতেই হবে, এমন কোনও প্রতিজ্ঞা করেনি ওরা। রুকস্যাকের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার মতো ভারী জিনিস বওয়ার কোনও মানে হয় না।

যখনই ভাল লাগবে না আর হাঁটতে অথবা ভাল লেগে যাবে কোনও স্পট, সেখানেই কাটিয়ে দেবে ছুটির দিনগুলো।

কলকাতায় ফিরে 'এই দ্যাখো, আমরা সান্দাকফু ট্রেক করে এলাম' বলে নিজেদের জাহির করার কোনও আগ্রহ নেই ওদের।

তিন বন্ধুর অনেক বিষয়ে খুব মিল। যেমন, কোনও প্রেমিকা নেই তিনজনের। জীবনে কিছু করে দেখানোর ইচ্ছে নেই। আগ্রহ নেই রাজনীতিতে। ঘৃণা নেই মানুষের প্রতি। ভক্তি নেই ভগবানের ওপর। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনও লক্ষ্য নেই জীবনের।

BanglaBook.org

তিনজনের পারিবারিক আর্থিক কাঠামোয় প্রচুর বৈষম্য। স্বাভাবিক কারণে পরিবেশও আলাদা। তবু কী করে এত মিল হল কে জানে!

সম্ভবত বয়স এবং এই সামাজিক ব্যবস্থা ওদের জীবন সম্বন্ধে অমনোযোগী করে রেখেছে।

বাপ্পার বাড়ির অবস্থা সব থেকে খারাপ। বাবা কলেজ স্ট্রিটে এক প্রকাশকের কাছে কাজ করতেন। ওখানে রিটায়ারমেন্ট নেই, এমন অসুস্থ হয়েছেন আর যেতে পারেন না। ক্লাস এইট অবধি পড়ে লেখাপড়ায় ইতি টেনেছে ভাই। সকালে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দেয়। ষোলো বছরের মানসিক প্রতিবন্ধী বোন, সাড়া দেয় নিজের নামটুকুতে। এত কিছুর মধ্যে একটাই ভাল ব্যাপার, তিরিশ বছরের ভাড়াবাড়িটা এখন প্রায় ওদের হয়ে গেছে। এত কম ভাড়া, মালিকের নিতে আসতে লজ্জা হয়।

সুগতর অবস্থা তুলনায় ভাল। মাথার ওপর দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। রাইটার্সের কেরানি রিটায়ার্ড বাবা এখন নিঃস্ব। ওদের যৌথ পরিবার। সুগত একটা অ্যামাউন্ট তুলে দেয় বড়জ্যাঠার হাতে, মা, বাবা, সুগতর খাওয়াপরা চলে যায় তাতে। এ ছাড়াও প্রতি মাসে মায়ের হাতে কিছু টাকা দেয় সুগত, দিদিদের শ্বশুরবাড়ি সামলানোর হ্যাপা আছে।

আত্মীয়স্বজনের থেকে অল্প কিছু টাকা ধার করে প্রথমে মিনারেল ওয়াটারের এজেন্সি নেয় সুগত, ধীরে ধীরে অন্যান্য জিনিসের ডিলারশিপ নিয়ে ব্যাবসাটা রীতিমতো দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। সে কথা অবশ্য রিলেটিভদের কাছে স্বীকার করে না, করলেই ধার শোধ করতে বলবে। তা কিছুতেই করবে না সুগত। যারা টাকা দিয়েছিল, তাদের অঢেল পয়সা। গরিব আত্মীয়র জন্য না হয় একটু করলই।

রায়নের অবস্থা বেশ সচ্ছল। বাবা চাকরি করতেন। ন্যাশানালাইজড ব্যাঙ্কের উঁচু পোস্টে। সদ্য অবসর নিয়েছেন। যা জমিয়েছেন, রায়নের জীবনটা ভালভাবেই কেটে যাবে। একমাত্র সন্তান রায়ন। ফ্যামিলিতে একটাই অপূর্ণতা, রায়নের মা নেই। রায়নের ষোলো বছর বয়সে মারা গেছেন। তার বছর দুয়েক পরেই বাবা বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন সিঁথিতে। ঘর জুড়ে ছড়ানো স্মৃতি বাবাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

সিঁথির ফ্ল্যাটে বাবা, রায়ন আর একজন কাজের বুড়ি। এই হচ্ছে

BanglaBook.org

রায়নদের সংসার। বাবা নিখুঁত অবসরজীবন কাটাচ্ছেন, মর্নিংওয়াক, খবরের কাগজ, পাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে হেল্‌প করা। দুপুরে খাওয়া-ঘুম। বিকেলে সমবয়স্কদের সঙ্গে আড্ডা। সন্ধে উতরে গেলে বাড়িতে বসে ধীর লয়ে মদ্যপান আর বই পড়া। তারপর ছেলের সঙ্গে বসে ডিনার। তখনই অনেক গল্প হয় বাবার সঙ্গে। রায়ন লক্ষ করেছে, মায়ের প্রসঙ্গ ভুলেও তুলে ফেলেন না বাবা। যদি রায়ন তোলে, বাবা কথা ঘুরিয়ে নেন। মা না থাকার বেদনাটা বাবা একা বইতেই ভালবাসেন।

রায়নকে রোজগার করার জন্য কখনও তাগাদা দেননি বাবা। সেও শুয়ে, আড্ডা মেরে দিন কাটাচ্ছিল। বড়মামা এসে ধরল একদিন, কী রে ইয়াং ম্যান, কাজকর্ম না করলে তো মাথায় চর্বি জমে যাবে। চল, আমার ফ্যাক্টরিতে লেবার দেখাশোনা করবি।

রায়ন রাজি হয়ে যায়। বাবার মুখে আবছা খুশির আভাস দেখতে পায় যেন। মামার ফ্যাক্টরি বেলঘরিয়ায়। তিনটে বিশাল লেদ মেশিন আছে, এ ছাড়া খুচখাচ আরও অনেক মেশিন। বত্রিশজন লেবার, দুটো শিফটে কাজ হয়। রায়নের কাজ হচ্ছে লেবাররা ফাঁকি মারছে কিনা দেখা আর স্টক মেনটেন করা। সকাল দশটা থেকে ছ'টা অবধি ডিউটি রায়নের। নিজের আলাদা চেম্বার আছে। মাঝেমধ্যে টহল দিতে বেরোয় ফ্যাক্টরি শেডে, লেবাররা নিজের মনে কাজ করে যায়, রায়নকে দেখে অযথা একাগ্র হওয়ার এবং তাড়াতাড়ি হাত চালানোর চেষ্টা করে না। ডেলি প্রোডাকশন রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখে রায়ন, ফাঁকির 'ফ' খুঁজে পায় না। স্টক মেলাতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও গরমিল পায়নি। রায়ন বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে, তার পোস্টটা না থাকলেও, মামার কারখানা তড়গড় করে চলত। মামার লেবাররা অত্যন্ত সৎ এবং কর্মঠ। সবার ভাগ্যে এমন হয় না। হয়তো বা মামা এমন কোনও থিয়োরি কায়দা করেছে, লেবার-মালিক সম্পর্ক সুস্থ থাকে। থিয়োরিটা কী মামা রায়নকে বলেনি, জানতেও চায়নি রায়ন।

মাইনেটা বেশ ভালই দেয় মামা। রায়নের কুণ্ঠা হয়। তবে ফ্যাক্টরিতে থাকতে তার ভালই লাগে। দুপুরভর ঠুংঠাং ধাতব শব্দ রায়নের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ছুটির পর অনেকক্ষণ শব্দগুলো লেগে থাকে কানে।

BanglaBook.org

মাথার ওপর সুতীক্ষ্ণ এবং মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডেকে উঠল। পা থেমে গেল তিন বন্ধুর। ডাকটা এতই মিষ্টি, একসঙ্গে তিনজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে পাখিটা।

মাথা তুলে গাছের ফাঁকে পাখিটাকে খোঁজে তিনজন। পায় না। আবার ডাকে পাখিটা। বাপ্পা কিছু একটা দেখতে পায়। আঙুল তুলে রোদ আড়াল করা বিশাল পাতা দেখায় বাপ্পা, যার ওপরে বসে আছে পাখিটা। আলোকিত সবুজ পাতায় ছায়াটা শুধু দেখা যাচ্ছে। বাপ্পা বলল, পাখিটাকে আমি চিনি। আলতাপরি।

সুগত বলল, কাক, চড়ুই ছাড়া তুই বোধহয় এই পাখিটাকেই চিনিস, না রে?

শালিখও চিনি। বলে, হাসতে থাকে বাপ্পা।

'আলতাপরি' সত্যিই সে দেখেছিল একবার। স্কুলে পড়ার সময় সুন্দরবনে এস্কারশনে গিয়ে। চকচকে কালোর ওপর লাল বর্ডার দেওয়া পাখি। স্টিমারে যেতে যেতে দেখিয়ে ছিলেন সুনির্মল স্যার। পাখিটা ডাকছিল মিষ্টি সুরে। ডাকটা এখন সেভাবে আর মনে নেই। স্যার পাখিটার দিকে ঢিল ছোড়ার ভান করে বললেন, ওটা পুরুষ। ওর দেখাদেখি স্ত্রী পাখিরাও উড়বে।

স্যারের কথা মিলে গেল, ঢিল ছোড়ার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে নদীর পাশে গাছে বসে থাকা পাখিটা উড়তে শুরু করল, ওকে অনুসরণ করল জলপাই-হলুদ, ধূসর, লাল, কালো আরও সব পাখি, বিকেলের নদীতে সে কী অপরূপ বর্ণচ্ছটা। সুনির্মল স্যার বলেছিলেন এদের নাম সয়ালি, সাহিত্যিক 'বনফুল' নাম রেখেছিলেন, আলতাপরি। সত্যিই যথার্থ নাম।

তারপর থেকেই বাপ্পা অচেনা, আড়ালে থাকা পাখি দেখলেই 'আলতাপরি' ভাবতে ভালবাসে।

পাখির ডাক পিছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চলল। দু'পাশে জঙ্গল ঘন হচ্ছে। কানে লেগে থাকছে ঝিনঝিনে একটা আওয়াজ। এটা কি কোনও ঝিঁঝি জাতীয় পোকার শব্দ, না নির্জনতার, ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর জঙ্গল খানিকটা পাতলা হল। রোদ পড়েছে রাস্তায়। হাঁটার পরিশ্রম আর রোদের কারণে বেশ গরম লাগছে ওদের।

BanglaBook.org

কাঁধ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সুগত বলে, দাঁড়া, জ্যাকেটটা খুলে ফেলি।

বাপ্পাও খুলে ফেলে জ্যাকেট। রায়ন যেমনকার তেমন থাকে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে একটা পাহাড়চুড়ো। তাকিয়ে থাকে রায়ন। একখণ্ড কালো মেঘ পাহাড়ের মাথা আড়াল করতে আসছে। রায়ন আন্দাজ করতে পারে সামনের পাহাড়টার থেকেও অনেক উঁচুতে তাদের গন্তব্য। সেই পাহাড়টা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। যেতে হবে সামনের পাহাড়টার গা দিয়ে, অনেকটা পথ, অনেক উঁচুতে। কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। পারবে কি?

এতদিন পাহাড়ে বেড়িয়েছে গাড়ি করে। সব পোষমানা পর্বত। এবারই প্রথম পাহাড়ের সঙ্গে বোঝাপড়া। নিবিড় সান্নিধ্যের সুযোগ। বাবা জানেন রায়ন দার্জিলিং যাচ্ছে। এখানে আসছে জানলে, কিছুতেই ছাড়তেন না। সামান্য হলেও রায়নের ভার্টিগো মতো আছে, উঁচু থেকে নীচের দিকে তাকালে অল্প অল্প মাথা ঘোরে। তবে সবসময় নয়। কখনও কখনও। বাবা রোগটার কথা জানেন। বন্ধুদের কাছে চেপে গেছে রায়ন।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এত দূর পর্যন্ত একবারও রোগটা জানান দেয়নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছে রায়নরা। ভাড়া করা গাড়ি যখন পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছিল, রায়ন বেশ কয়েকবার ভুল করে তাকিয়ে ফেলেছে খাদের দিকে, কোনও রি-অ্যাকশান হয়নি। অলক্ষ্যে রোগটা কি তা হলে সেরে গেছে? শেষ দেখা দিয়েছিল বাবার রিটায়ারমেন্টের দিন। যত এগিয়ে আসছিল দিনটা কেমন যেন মনমরা হয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। সুস্থ, সবল, কাজপাগল মানুষ হলে যা হয় আর কী। বাবার মুখচোখের অবস্থা ভাল লাগেনি রায়নের। নির্দিষ্ট দিনটায় বাবাকে বলে, আজ আমি তোমার সঙ্গে যাব। ফেরার সময় হোটেলে খেয়ে ফিরব বাড়ি।

বাবা কিছুতেই রাজি হন না। বলেন, আজ না অন্য দিন হবেখন। কলিগরা নানান রকম গিফটটিফট দেবে, সেসব নিয়ে হোটেলে ঢোকা...

তখনকার মতো আর জোর করেনি রায়ন। বাবা বেরিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর সে বেরোয়। সোজা চলে যায় ডালহৌসি পাড়ায় বাবার মেন অফিসে। কুড়িতলা বিল্ডিং। বাবার ডিপার্টমেন্ট চোদ্দো তলায়। এই

BanglaBook.org

অফিসে আগে আসেনি রায়ন। রিটারমেন্টের আগের দু'বছর বাবা বদলি হয়ে এখানে এসেছেন।

লিফটে উঠে সোজা চোদ্দো তলায় যায় রায়ন। ডিপার্টমেন্টে বাবা নেই। কলিগরা বলেন, একটু বোসো। হয়তো অন্য ফ্লোরে গেছেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। এক্ষুনি ফিরে আসবেন।

রায়নের জানতে ইচ্ছে করছিল, রিটায়ারমেন্ট কি হয়ে গেছে, আপনাদের ফাংশন...

বোকাবোকা শোনাবে বলে, আর জিজ্ঞেস করেনি। ভেতর ভেতর একটা টেনশন হচ্ছিল, অফিস ছেড়ে কি বেরিয়ে গেলেন বাবা? নাকি বাথরুমে অথবা কোনও ফাইল-ভরতি র‍্যাকের পিছনে বসে কাঁদছেন। এতদিনের সংসর্গ কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। মা মারা যাওয়ার পর বাবার অবলম্বন ছিল অফিসের কাজ।

রায়নের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার এক সহকর্মী বলে উঠেছিলেন, চক্রবর্তীদা বলে গেছেন, ফেরার সময় আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। তুমি ততক্ষণ বারান্দায় গিয়ে ঘুরে এসো। এখান থেকে কলকাতাটা দারুণ লাগে।

বাবার চিন্তায় অন্যমনস্ক রায়ন ভুলেই গিয়েছিল রোগটার কথা। বারান্দায় গিয়ে যখনই নীচের দিকে তাকিয়েছে, বিচ্ছিরি একটা কল্পদৃশ্য ভেসে উঠল চোখে।

মাথা ঘুরে তক্ষুনি মেঝেতে বসে পড়েছিল রায়ন। গা গুলোচ্ছিল ভীষণ। ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। ততক্ষণে বাবা এসে পড়েছেন বারান্দায়, সে এক লজ্জাজনক দৃশ্য। বাবাকে আগলে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার বদলে রায়ন নিজেই বাবার কাঁধে মাথা রেখে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরল।

রায়নের কেন জানি মনে হয় সেদিনের অতটা অসুস্থতা শুধুমাত্র ভার্টিগোর কারণে নয়। রাস্তায় পড়ে থাকা কল্পদৃশ্যটাও এর জন্য দায়ী। কেন যে মাঝেমধ্যে চোখে ভেসে ওঠে স্বকল্পিত অশুভ সব দৃশ্য! এটাও কি কোনও রোগ?

কী রে, উদাস হয়ে গেলি যে, চল!

BanglaBook.org

সংবিৎ ফেরে সুগতর ডাকে। সামনের পাহাড়ের মাথা দখল করেছে মেঘ। দৃষ্টি নামিয়ে পা বাড়ায় রায়ন। এখন বেশ খানিকটা চড়াই। দু'পাশে সবুজ মাঠ আর ইতস্তত কিছু বড় বড় গাছ। খানিকটা উপত্যকা মতন। পি ডব্লু ডি-র পাথর ফেলা রাস্তা চলে গেছে এঁকেবেঁকে। বাপ্পা আগে আগে হাঁটছে। এখন আর স্টেপিংয়ের কড়াকড়ি নেই। বাপ্পার চলনে বেশ দিলখোলা ভাব। শনিবারের আড্ডায় এত ফ্রি থাকে না। চেহারায় লেগে থাকে অসচ্ছল সংসারের ছায়া, প্রতিবন্ধী বোনের দুঃখ।

সুগত, রায়ন লক্ষ করে, কানের পাশে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাপ্পা। কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে।

পা চালিয়ে দুই বন্ধু গিয়ে পৌঁছোয় বাপ্পার কাছে। সুগত জিজ্ঞেস করে, কী হল, কী শুনছিস?

ঠোঁটে আঙুল দেয় বাপ্পা। অস্ফুটে বলে, চুপ করে শোন।

রায়ন সুগত কান পাতে বাতাসে, দূরবর্তী একটা-দুটো পাখির ডাক ভেসে আসে, আর কিছু নয়।

রায়ন বলে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো!

একটা জিপের আওয়াজ পাচ্ছিস না?

না।— এটা বলে সুগত।

অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বাপ্পা বলে, সেকী রে! আমি তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি গাড়ি চলার আওয়াজ। নয় আমাদের আগে আগে যাচ্ছে অথবা পিছন থেকে উঠে আসছে।

রায়ন আরও একবার শোনার চেষ্টা করে, দূরের জঙ্গলের কিছু অচেনা ক্ষীণ শব্দ কানে এসে ধরা দেয়, এমনও মনে হয় শব্দগুলি বুঝি নিজের বানানো। অনাবিল প্রকৃতিতে জন্ম নিচ্ছে কল্পিত শব্দ।

দ্বিতীয়বার শোনার চেষ্টা না করেই সুগত বাপ্পাকে বলে, তুই ভুল শুনছিস। কেন শুনছিস, তাও বলে দিতে পারি।

কেন? জানতে চায় বাপ্পা।

সুগত বলে, মুখে যতই বলিস না কেন, ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে থাকতে চাই। চল, একদম ফাঁকায় কোথাও বেড়িয়ে আসি। যেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। সেটা আসলে মনের কথা নয়। এতটা ফাঁকায় এসে

BanglaBook.org

তোর 'বোর' লাগছে। চাইছিস আমাদের আশেপাশে কিছু লোকজন থাকুক। তাই শুনছিস গাড়ির আওয়াজ।

শালা, জ্ঞান দিতে পারলে আর কিছু চাস না। না? খেঁচিয়ে উঠে হাঁটতে থাকে বাপ্পা।

সুগত হাসতে হাসতে বলে, আমি এটাও বলে দিতে পারি তুই ধরে নিয়েছিস ওই জিপে একদল কুড়ি-বাইশের মেয়ে যাচ্ছে এক্সপিডিশনে।

হাঁটতে হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে বাপ্পা বলে, নিজের ভাবনা আমার ঘাড়ে চাপাস না। শালা মেয়েবাজ।

সুগত প্রাণখুলে হাসে। রায়ন একটু যেন সিরিয়াস। সুগত বলে, কী রে, তুই এরকম গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?

মাথা নিচু করে নিবিষ্ট ভঙ্গিতে রায়ন বলে, আমার মনে হয় বাপ্পা যা বলছে, সত্যি বলছে। ও যা শুনতে পাচ্ছে, আমরা পাচ্ছি না।

কারণ?

আমরা শহরে অনেক শব্দের মধ্যে থাকি। শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা। ও থাকে মফস্সলে, পড়াতে যায় গ্রামে। কান এখনও দূষিত হয়নি।

কথাটা সুগত মানল কিনা বোঝা গেল না, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল বাপ্পার দিকে। রায়নের বাড়ি বি টি রোডের ধারে, সারাক্ষণ গাড়ির হর্নের আওয়াজ, চাকরির জায়গা কারখানায় লোহা পেটার শব্দ। সুগতর কাজও রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। একটু আগের কথাটা ভাবনাচিন্তা করেই বলেছে রায়ন। তবে দূষণ নিয়ে আক্ষেপ তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। রোদ উঠে যাওয়া সত্ত্বেও দূরের আকাশ কত নীল, ঘন সবুজ পাহাড় ছুঁতে চাইছে আকাশটাকে। রাজহাঁসের মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের জঙ্গলে।

এখানে আসার প্রোগ্রাম শুনে অনেকে বলেছিল, জুন মাসে ওদিকে যাচ্ছিস, বৃষ্টি পাবি। ভাল করে ঘুরতেই পারবি না তোরা। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার ভাবনা ছেড়েই দে।

শিলিগুড়ি থেকে মানেভঞ্জন অবধি মেঘলা ভাব, অল্পস্বল্প বৃষ্টি ছিল ঠিকই, যত ওপরে উঠছে রায়নরা, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। তবে

BanglaBook.org

কতক্ষণ বা কতদিন এরকম থাকবে বোঝা মুশকিল। পাহাড়ের প্রকৃতি নাকি ভীষণই খামখেয়ালি।

ক্লাস সিক্সে বাবা-মার সঙ্গে দিল্লি হয়ে নৈনিতাল গিয়েছিল রায়ন। হোল নাইট বাস জার্নি। ভোরবেলা বৃষ্টির মধ্যে বাস ঢুকল পাহাড়ি এলাকায়। সেই যে বৃষ্টি পিছনে লাগল, গোটা ট্যুরে সঙ্গে রইল। সে যেন বৃষ্টির ঘর-বাড়ি। হোটেল পৌঁছোতেই জ্বর এসে গেল রায়নের। বাবা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এক দিনেই। পরের দিন রায়নকে হোটেল বয়ের হেপাজতে রেখে ছাতা মাথায় আশপাশটায় ঘুরতে বেরোল।

রায়নের একটুও মন খারাপ করেনি। জ্বরো গায়ে হোটেলের বিছানায় শুয়ে, কাচ ঢাকা জানলা দিয়ে দেখছিল লেকের ওপর বৃষ্টির টাপুরটুপুর। বৃষ্টির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল চপল মেঘ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টি ধোওয়া পথঘাট, সামনেই লাল-কালো রঙের ডাকঘর, ল্যাম্পপোস্টের মাথায় বসে পাখি ডানা ঝাড়ছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা আকাশি রঙের ছাতা মাথায় ফিরছে বাড়ি।

সবার ছাতার রং এক দেখে রায়ন বুঝেছিল বৃষ্টির দেশে ছাতাটাও একটা ইউনিফর্ম।

একটি মেয়ে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল ল্যাম্পপোস্টের নীচে। হয়তো ওকে কেউ নিতে আসবে। ভীষণ মিষ্টি দেখতে ছিল মেয়েটা। হোটেলের দিকে দু'-একবার তাকালেও রায়নের দোতলার জানলায় চোখ থামাচ্ছিল না। রায়নের খুব ইচ্ছে করছিল ওর উদ্দেশে হাত নাড়তে, কাচ ঢাকা জানলাটা ছিল বাধা। অত বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা মাথায় নির্বিকার অপেক্ষায় ছিল মেয়েটা। বৃষ্টি ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

রাস্তায় যখন একটাও লোক নেই, লেক থেকে ভেসে আসা মেঘ মেয়েটাকে হাপিশ করে দিচ্ছিল। মেঘ সরে গেলে ফুটেছিল গোল মুখ, নাক চাপা, ভীষণ ফরসা সেই মেয়েটা। একটা সময় মেঘের আড়ালে থাকাকালীন কেউ একজন এসে ওকে নিয়ে গেল।

বাবা-মা ফিরল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। রুমে ঢুকে মা দৌড়ে এসেছিল রায়নের কাছে, কপালে গলায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিল জ্বর। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, এর মধ্যে কোনও কষ্ট হয়নি তো

BanglaBook.org

বাবা! জ্বর বাড়েনি তো? দ্যাখ না, আমি যেতে চাইনি। তোর বাবা...

মায়ের গায়ে বৃষ্টিভেজা হ্রদের গন্ধ। রায়ন কিছুতেই বলে উঠতে পারছিল না, সময়টা আমার খারাপ কাটেনি। তোমরা থাকলে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা মিষ্টি একলা মেয়েটাকে আমি লক্ষই করতে পারতাম না।

মায়ের শরীরের ওই গন্ধটা আজও ভোলেনি রায়ন। ভোলেনি মেয়েটাকেও। সে বড় হয়ে এখন কোথায় আছে, কী করছে, কে জানে! মেয়েটা জানলই না এক কিশোর তার ছবি এতদিন বুকে করে রেখে দিয়েছে।

নৈনিতালের সেই বৃষ্টি যদি এখানে শুরু হয়, কোথায় আশ্রয় নেবে রায়নরা? এখানে হোটেলও নেই, ফায়ারপ্লেস তো দূরের কথা। টেন্ট নেই ওদের সঙ্গে। তবে এসব দুর্ভাবনা এখন না ভাবলেও চলবে। রীতিমতো গরম করছে, চারপাশে ঝলমলে রোদ।

রাস্তা আবার খাড়াই হতে শুরু করেছে। গলা শুকোচ্ছে রায়নের। জল খেতে পারলে হয়। দু'লিটারের মিনারেল ওয়াটার তিনজনের কাছে এক বোতল করে আছে। দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁধ থেকে ব্যাগ নামায় রায়ন। সুগত বলে, কী হল?

জল খাব। বলে, চেন খুলে ব্যাগে হাত ঢোকায় রায়ন। বোতলের ছোঁয়া পায় না। অবাক হয়। সুগতকে বলে, আমার জলের বোতলটা কোথায় গেল? তোরা রেখেছিস?

তোরটা রাখতে যাব কেন? আমারটা আমার কাছেই আছে। ব্যাগে ভাল করে দেখেছিস, নেই?

আরও একবার ভাল করে ব্যাগ হাঁটকায় রায়ন। সুগতর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ে।

সুগত বলে, তা হলে মনে হয় বাপ্পা তোরটা ব্যাগে রেখেছে। তুই তো ভুলো মন।

অনেকটা এগিয়ে গেছে বাপ্পা। সুগত চেঁচিয়ে ওকে দাঁড় করায়। তারপর দু'জনেই যায় বাপ্পার কাছে। জলের কথা বলতেই কপালে হাত চাপড়ে রাস্তাতেই বসে পড়ে বাপ্পা।

BanglaBook.org

'কী রে, কী হল' 'কী হল বলবি তো' চার-পাঁচবার জিজ্ঞেস করল রায়ন, সুগত।

বাপ্পা বলে ওঠে, ব্লান্ডার হয়ে গেছে রে, তিনটে বোতল আমিই লজের দোরগোড়ায় রেখেছিলাম, বেরোনোর সময় ঢুকিয়ে নেব যে যার ব্যাগে। তা আর হয়নি। আমাদের কারও কাছেই এখন এক ফোঁটা জল নেই।

দুই

গাড়ির যে-শব্দটা বাপ্পা শুনতে পেয়েছিল, সেটা বিভ্রম নয়। আবার সুগত, রায়ন যে শুনতে পায়নি, তারও একটা কারণ আছে। তিন বন্ধুর থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে একটা জিপ খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

ঘন জঙ্গলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে পথ এখানে খানিকটা সমান্তরাল। জিপটাকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর একটা গাড়ি যেন যেতে পারে।

হুড তুলে গাড়ি সারানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ড্রাইভার, হেল্‌পার। দুই যাত্রীর একজন উদ্বিগ্ন, অন্যজন উদাসীন।

পৃথা, অনিমেষ। এরা স্বামী-স্ত্রী। নীচের পাহাড় পথের শেষ শহর মানেভঞ্জন থেকে জিপ ভাড়া করে চলেছে সান্দাকফু। পথে এই নিয়ে তিনবার জিপটা দাঁড়িয়ে গেছে।

ড্রাইভারের সিটের নীচের খোপে মোটর গ্যারাজের সমস্ত যন্ত্রপাতি মজুত। বুধিলাল গুরুং ড্রাইভার যেমন ভাল, মেকানিক হিসেবে কম যায় না। আগের তিনবার হেঁচকি তুলে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলেও, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চালু করেছে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে গাড়ি একেবারেই দেহ রাখল। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বুধিলাল। কোনও রেজাল্ট নেই। অনিমেষ আশা ছেড়ে দিয়ে গাড়ির পিছনে রাস্তাতেই বসে পড়েছে। চোখ রেখেছে নিসর্গে।

পৃথা টেনশনে পৌঁছে গেছে খোলা হুডের সামনে, গাড়ির যন্ত্রপাতির

BanglaBook.org

ব্যাপারে কিছুই বোঝে না তবু দেখছে বুধিলালের কাজ। হেল্‌পার সুমন বেশ চটপটে ছেলে, মেশিন-টুলস, জ্যারিকেনের জল, তেল এগিয়ে দিচ্ছে বুধিলালকে। অনিমেষ আড়চোখে দেখল রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের টুকরো, গাছের ছোট ডাল ড্রাইভারকে সাপ্লাই দিচ্ছে সুমন। যন্ত্রে যখন প্রাকৃতিক জিনিস ঢুকে যাচ্ছে, তার মানে খুব একটা আশা নেই।

সিগারেট ধরায় অনিমেষ। ঘড়ি দেখে, দশটা। হাতে গোটা দিন। অনায়াসে ফিরে যেতে পারবে নীচের শহরে। হেঁটেই যেতে হবে, কষ্ট একটু হবে ঠিকই, কিন্তু উপায় কী?

একটা খুচরো ভুল অনিমেষ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে, গাড়িটা প্রথম আধঘণ্টা এত ভাল চলেছে, মেজাজ এসে গিয়েছিল। ব্যাগ থেকে মদের আর পৃথার আধখাওয়া কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল বার করেছিল সন্তর্পণে। কোল্ডড্রিঙ্কের সঙ্গে মদ মিশিয়ে বেশ কয়েকবার খেয়েছে। গোটা ঘটনাটা উলটো দিকের সিটে বসে হাসিহাসি মুখ করে হেল্‌পার সুমন দেখছিল। অনিমেষ, সুমন বসেছে ড্রাইভারের পেছনে লম্বালম্বি সিটে। পৃথা ড্রাইভারের পাশে। লেডিস, তাই ঝাঁকুনি কমের সিট।

পৃথা নিশ্চয়ই মদের গন্ধ পেয়ে থাকবে, একবারের জন্য মুখ ঘোরায়নি।

সবে যখন নেশাটা লেগেছে, প্রকৃতিকে ক্রমশ ক্যানভাসের ওয়াশ পেন্টিং মনে হচ্ছে তখনই গাড়িটা প্রথম হেঁচকি তুলল।

নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যেস অনিমেষের নেই, কালেভদ্রে খায়, সম্ভবত সেই কারণে নেশা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ঘোর কাটতে সময় লাগে। এখন নেশায় ভোম হয়ে বসে আছে রাস্তায়, ঠান্ডা হাওয়া, যাত্রা পথের দুশ্চিন্তা, কোনওটাই তাকে সেভাবে স্পর্শ করছে না।

কানের পাশে পায়ের আওয়াজ, ঘাড় না ফিরিয়েই অনিমেষ বুঝতে পারে, পৃথা এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের সবুজ মাঠ থেকে দুটো পাখি উড়ে গেল জঙ্গলের দিকে। তারও খানিকটা পর পৃথা বলল, কী হবে এখন?

তক্ষুনি কোনও উত্তর দিল না অনিমেষ। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে, বসার

BanglaBook.org

ভঙ্গিটা পালটে নিয়ে জানতে চাইল, গাড়ির অবস্থা কী বুঝলে, চান্স আছে কোনও?

গাড়ির আমি কী বুঝি। পৃথার গলায় উষ্মা প্রকাশ পেল।

অনিমেষ বলতেই পারত, যদি না বোঝো তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে কী করতে? বলল না। পৃথার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছেটাও হারিয়ে গেছে ক'মাস ধরে। পৃথারও হয়তো তাই।

তুমি একবার গিয়ে দেখবে না গাড়ির অবস্থা? বলে পৃথা। অনিমেষ স্পষ্ট করে উত্তর দেয় না। গাড়ির মেকানিজম আমিও কিছু বুঝি না।

অর্থাৎ কাটাকুটি খেলার মতো দ্রুত নিস্ফল হয়ে গেল কথপোকথন। দু'জনের মধ্যে এমনটাই হয় ইদানীং। এটা বাড়িতে বা বলা ভাল নাগরিক জীবনে হলে খুব একটা অসুবিধে হয় না। সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখে যে যার নিজের মতো দিনযাপন করতে পারে। কিন্তু সেই পদ্ধতি পাহাড়ে চলে না। কিছু তো একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। উদ্যোগী হয় পৃথা। বলে, আমরা একটা কাজ করি, হাঁটতে শুরু করে দিই। ইতিমধ্যে যদি ঠিক হয়ে যায় গাড়ি, তুলে নেবে আমাদের।

যদি ঠিক না হয়?

সামনে টেকার্স হাটে গিয়ে একরাত্র হল্ট করব। ড্রাইভার বা হেল্পার মানেভঞ্জন নেমে গিয়ে অন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

আমি এক পা-ও হাঁটতে পারব না। পাহাড়ে হাঁটা মুখের কথা নয়। তা ছাড়া হাঁটার ডিসিশন আমাদের ছিল না।

পৃথা বুঝতে পারে খুবই ট্যাক্সফুলি অনিমেষ বিঘ্নিত যাত্রার দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। কেননা সান্দাকফু আসার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। না দিয়ে উপায় ছিল না। পৃথারা নিউজলপাইগুড়ি থেকে প্রথমে যায় দার্জিলিং। ওদের ট্যুর প্রোগ্রাম ছিল সে রকমই। দার্জিলিংয়ে দিন পাঁচেক কাটিয়ে ফিরবে বাড়ি, মানে শ্বশুরবাড়ি। কোন্নগর। দার্জিলিং পৃথার একদম ভাল লাগেনি। কিশোরীবেলায় একবার এসেছিল, বাবা-মা জেঠা-জেঠি, নতুন বিয়ে হওয়া কাকা-কাকি, জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা, বিরাট একটা গ্রুপ। সেবারের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা মোহাঞ্জনের মতো লেগে ছিল চোখে, পলক ফেললেই পৌঁছে যেতে

BanglaBook.org

পারত কুয়াশায় ভেসে ওঠা পাহাড়ি শহরে। এবারে চোখ থেকে মুছে গেল সেই শহর।

অসংখ্য হোটেল। এক একটা পাঁচ, ছয়, সাততলা অবধি। পাহাড়ের শরীর দেখা যায় না। অজস্র মানুষ। ম্যালে ওঠার রাস্তায় কলকাতার পুজো দেখার মতো ভিড়। অসহ্য লাগছিল। পৃথাদের হোটেলের রুমটাও ছিল অপরিসর। বাথরুমের গন্ধ ঘর জুড়ে। ভাড়া কিন্তু ভালই।

ট্রেনের টিকিট বুকিং থেকে হোটেলের রুম, সবটাই করে দিয়েছিল পৃথা-অনিমেষের কমন ফ্রেন্ড বিশ্বজিৎ। পৃথাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি দেখে বিশ্বজিৎ পরামর্শ দেয়, তোরা কোথাও ঘুরে আয়। দেখবি সম্পর্কের ফাটলগুলো অনেকটা রিপেয়ার হয়ে যাবে।

টোটকাটা এককথায় অনিমেষ গ্রহণ করলেও, পৃথা প্রথমে রাজি হয়নি। তারপর বিশ্বজিৎ যখন বলল দার্জিলিংয়ের কথা, বুকিংটুকিংয়ের দায়িত্ব নিল, পৃথা আর না করেনি। আর কিছু না হোক দার্জিলিংটা তো একবার দেখা যাবে।

খুবই হতাশ করল শহরটা। ছোট্ট রুম আরও অস্বস্তিকর। পৃথার শ্বশুরবাড়ি পুরনো আমলের। লিভিংরুম বিশাল বড়, ইচ্ছেমতো একলা হওয়া যায়। দমবন্ধ হয়ে আসছিল দার্জিলিংয়ের হোটেলে। একরাত কোনওক্রমে কাটিয়ে পৃথা বাধ্যত অনুনয় করার মতো নত হয়। অনিমেষকে বলে, একদম ভাল লাগছে না এখানে। আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি না?

ভাল লাগছে না কেন? জানতে চেয়েছিল অনিমেষ।

শহরটা বড্ড ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। ভীষণ ভিড়। আগে এরকম ছিল না।

জনসংখ্যা বাড়ছে, ভিড় তো হবেই। তা ছাড়া ভাল না লাগার দায়টা শুধু শহরকে দিয়ো না। আমাদের মনও খানিকটা দায়ী। অন্য কোথাও গিয়েও দেখা যাবে জায়গাটা মনঃপূত হচ্ছে না। তার থেকে বরং এই ক'টা দিন এখানেই...

অনিমেষের কথা কেটে পৃথা বলে উঠেছিল, সান্দাকফু গেলে হয়।

প্রস্তাবটা আসলে অনুরোধ। যতটা সম্ভব নির্মোহভাবে বলেছিল পৃথা।

BanglaBook.org

অনিমেষ অবাক হয়, অনেকদিন পর পৃথা তার কাছে কিছু বায়না করছে। যদিও খুব আবছাভাবে।

চট করে কোনও মতামত না দিয়ে অনিমেষ চুপ করে ছিল। পৃথার আচরণগত বদল নিয়েই ভাবছিল হয়তো।

রুমের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পৃথা তখন দেখছে, পাশের হোটেলের দু'তলার বারান্দায় উবু হয়ে বসে মোটামতো ভদ্রমহিলা এক ডাঁই জামাকাপড় কাচছেন। কাচার শব্দ ভেসে আসছে পৃথাদের চারতলার রুমে। মহিলা নিশ্চয়ই বাতিকগ্রস্ত। এত কাপড় শুকোবে কী করে! সারাক্ষণ মেঘলা হয়ে আছে চারপাশ।

সান্দাকফু শুনেছি হেঁটে উঠতে হয়।

অনিমেষের কথায় সংবিৎ ফিরেছিল পৃথার। একটু সময় নিয়ে উত্তর দেয়, গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়। ওই রাস্তায় শুধুমাত্র জিপ চলে।

বেডসাইড টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনে উপুড় হয়ে শুয়েছিল অনিমেষ। বইয়ের মধ্যে থেকে বলে, যাও তা হলে, রিসেপশনে গিয়ে অ্যারেঞ্জ করো সান্দাকফুর ট্রিপ।

তার মানে ইচ্ছেটা যেহেতু পৃথার, ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। মেনে নিয়েছিল পৃথা। সান্দাকফু যাওয়ার অভিলাষ তার অনেকদিনের। সোনাদা অর্থাৎ বড়জ্যাঠার ছেলে, যে এখন আমেরিকায় থাকে। কলেজ পড়াকালীন ট্রেক করে গিয়েছিল সান্দাকফু। বাড়ি এসে খুড়তুতো দুই বোন তিথি-পৃথাকে বলেছিল অভিযানের গল্প। দিদি তিথি আর পৃথা দু'জনেই তখন স্কুলে পড়ে। সোনাদার গল্প শুনে দুই বোনই খুব উত্তেজিত। রাতে বিছানায় শুয়ে দিদি বলেছিল, বুঝলি বোন, তুই আর আমি কেউই বিয়ে করব না। বড় হয়ে চাকরি করব, ইচ্ছেমতো ঘুরব, বেড়াব। হেঁটে হেঁটে উঠব সান্দাকফু।

পৃথার তখন ক্লাস সিক্স, দিদির নাইন। পৃথা বুঝতে পারেনি পাহাড়ে ওঠার সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক! দিদির বোঝার বয়স হয়েছিল, বিয়ের ভীতিটা পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিল মাথায়। দিদি সিজোফ্রেনিয়ার রুগি। আর কোনওদিন আনা যাবে না দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায়। নানান উপসর্গ ওষুধ নিয়ে দিদি পড়ে আছে শ্রীরামপুরে মায়ের কাছে। বাবা

BanglaBook.org

মারা গেলেন পৃথার কলেজে ঢোকার আগেই। মা চলে গেলে দিদির কী হবে, তাই নিয়ে ভীষণ চিন্তা হয় পৃথার। দিদিকে নিজের শ্বশুরবাড়িতে এনে রাখতে পারবে না পৃথা, শ্বশুর শাশুড়ি তো রাজি হবেনই না, তার থেকেও বড় কথা পৃথাও হয়তো বেশিদিন থাকবে না কোন্নগরের বাড়িতে। তা হলে কি ফিরে যাবে শ্রীরামপুরে? কিন্তু পৃথাকে তো কলেজের চাকরিতে বেরোতেই হবে, সেই সময়টা কে দেখবে দিদিকে?

দিদির ভাবনা মাথায় এলেই দিশেহারা লাগে পৃথার। নিজের লক্ষ্য স্থির রাখা যায় না। তখনকার মতো দিদির চিন্তা সরিয়ে রেখে রিসেপশনে গিয়েছিল পৃথা।

কাউন্টারে বসেছিল হোটেলের কেয়ার টেকার কাম ম্যানেজার। মানুষটি ভাল। পৃথার প্রোগ্রাম শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের হোটেল কি আপনার ভাল লাগছে না ম্যাডাম?

না, তা নয়। দার্জিলিং তো এর আগেও এসেছি, এবার কেন জানি ইমপ্রেসড্ হচ্ছি না। তাই ভাবলাম... পৃথাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ম্যানেজার বলেছিল, ও কে, তা হলে আমাদের কোনও গাফিলতি নয়। সেটাই জেনে নিলাম। আমি এক্ষুনি ট্রাভেল এজেন্সিতে ফোন করে লোক ডেকে পাঠাচ্ছি। ওই আপনাকে গাড়ি বুক করে দেওয়া থেকে শুরু করে টোটাল রুটটা বুঝিয়ে দেবে। তবে মানেভঞ্জনের পর থেকে বোল্ডার ফেলা রাস্তা, জিপ নিতে হবে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, পারবেন?

পারব। বলে, রিসেপশনের পাশে সোফায় বসেছিল পৃথা। মিনিট পনেরোর মধ্যে লোক আসে। নাম বুকু। খুবই চালাক-চতুর, উদ্যমী ছেলে। তার মুখে লেগে আছে একটাই কথা, কোনও প্রবলেম হবে না ম্যাডাম। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব।

পৃথা বলেছিল, আমরা আজই, এক্ষুনি বেরোতে চাই।

কোনও প্রবলেম নেই। আপনারা লাঞ্চ করে নিন, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। বাট ওয়ান থিং, মানেভঞ্জন পৌঁছোতেই বিকেল হয়ে যাবে। আজ আর পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। কাল সকালে জিপে করে স্টার্ট নিতে হবে।

আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। বলেছিল পৃথা।

BanglaBook.org

বুকু বলে, এক তরফ দেখনে সে ইয়ে প্রোগ্রামই ঠিক রহে গা, ওয়ান নাইট মানেভঞ্জনে স্টে করলে হাই অলটিটিউটে অ্যাডজাস্ট করে যাবেন।

বুকুর কথা শুনে পৃথার ধারণা হয়েছিল, সে বুঝি সান্দাকফু অবধি সঙ্গে যাবে। যায়নি। কথার মাঝে ব্যবসায়িক ফাঁক রেখেছিল, ট্যুর অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া তার কাজ, সে গাইড নয়। মানেভঞ্জন পর্যন্ত মারুতি ভ্যানে পৌঁছে দিয়ে গেছে বুকু, একরাত্রের জন্য হোটেল, বুধিলালের জিপ বুক করে সে ফিরে গেছে দার্জিলিং। ছেলেটা থাকলে ভাল হত, রাস্তায় কথা বলার থাকত একজন, খুব দরকার ছাড়া অনিমেষের সঙ্গে কথা হয় না। এখন আবার খাঁড়ার ঘা, গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল।

মনটা এমন খিঁচড়ে গেছে, এই অপরূপ প্রকৃতিতে মুগ্ধ হতে পারছে না পৃথা। অনিমেষের পেছনে পায়চারি করছে। কী মনে হতে কাঁধে ঝোলানো ছোট ব্যাগটা থেকে সেলফোন বার করে পৃথা। মানেভঞ্জন থেকেই টাওয়ার পাওয়া যায়নি, এখানে কি আর পাওয়া যাবে!

ফোন সেট সামনে নিয়ে দেখে, সেই একই ব্যাপার, কানেকশন নেই। তখনই প্রশ্ন আসে মাথায়, আমি কার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চাইছিলাম? কে আমাকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করত? কারও কথাই মনে এল না। এই ফোনসেটটার মতোই নিজেকে এখন বিচ্ছিন্ন, একা অকেজো মনে হচ্ছে। অথচ তার বর মাত্র ফুট পাঁচেক দূরে বসে। অনিমেষ এতটা নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে কী করে, কে জানে! এমনিতে ছোটখাটো ব্যাপারে ভীষণ টেনশন করে। ওর কি নেশা হয়ে গেছে? পৃথা টের পেয়েছে জিপে বসে বোতল খুলেছিল অনিমেষ, গন্ধটা ঝপ করে নাকে এসে লেগেছিল। ইদানীং মাঝেমধ্যে মদ খাচ্ছে অনিমেষ, এমন সময় নেশাটা শুরু করল, বারণ করার মতো সম্পর্ক নেই পৃথার।

আজও সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেনি। দাম্পত্য বিবাদের ধকল নিতে পারছে না অনিমেষ, তাই হয়তো নিয়েছে নেশার আশ্রয়।

পৃথার কলেজে জি এস ছিল অনিমেষ। পৃথাদের ব্যাচ যেবার ঢুকল কলেজে, অনিমেষ পাশ করে গেল। ইউনিয়নের কাজে কলেজে আসত নিয়মিত। খুব ভাল সম্পর্ক ছিল স্টুডেন্টদের সঙ্গে। নতুন জি.এস-কে কেউ গ্রাহ্যই করত না। অনিমেষদা সবার আইডল। সেই একরোখা জেদি

BanglaBook.org

ছাত্রনেতা অনিমেষ চ্যাটার্জি মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে নেশা করে পাহাড়ে এলিয়ে পড়ে আছে, এটা ভাবাই যায় না। অথচ অনিমেষের সমসাময়িক ছাত্রনেতারা পার্টির অনেক ওপর মহলে চলে গেছে। অনিমেষের খুবই বন্ধু তাপসদা তো এখন পৃথার শ্বশুরবাড়ির এলাকার বিধায়ক।

অনিমেষও পৌঁছোতে পারত অনেক ওপরে, না পারার কারণ ওর পারিবারিক পরিবেশ। অনিমেষের বিশ্বাস মূল্যবোধের সঙ্গে বাড়ির লোকের আচারবিধি মেলে না। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এই নিয়ে কোনও তর্কবিতর্কে যায় না অনিমেষ। কেমন যেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। পৃথা এর কারণ জানতে চেয়েছে বহুবার, এড়িয়ে গেছে অনিমেষ। আর হয়তো জানাও হবে না। আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। এমন নয় যে মা, বাবার মন জুগিয়ে চললে প্রচুর সম্পত্তি পাবে অনিমেষ, বরং সংসারের সিংহভাগ খরচটা দিতে হয় তাকে। তা হলে কেন এই সমর্পণ? ভাবনার মাঝে হোঁচট খায় পৃথা, সেই থেকে অনিমেষকে নিয়ে ভেবে যাচ্ছে, তার এখন প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত কীভাবে পৌঁছোবে গন্তব্যে। তার মানে কি মনের গভীরে কোথাও একটু আশা এখনও পড়ে আছে, যদি অনিমেষের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল হয়ে যায়। কেন এই নির্লজ্জতা পৃথার?

চোখ যায় মাটিতে বসে থাকা অনিমেষের দিকে। এখন আর বসে নেই, পেছন দিকে হেলে, মাটিতে কনুই রেখে আধশোয়া হয়ে আছে। ঘুমিয়ে না পড়ে আবার!— আশঙ্কিত পৃথা এবার তাকায় গাড়ির দিকে। বুধিলাল হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসছে, ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওর। এরপর তা হলে কী হবে? সেটাই জানতে দু'পা এগিয়ে যায় পৃথা। বুধিলাল পৃথার উদ্বিগ্নতা গ্রাহ্য না করে তফাত রেখে গিয়ে পৌঁছোয় অনিমেষের কাছে। স্বাভাবিক কারণে অনিমেষকে গার্জেন ঠাওরেছে। বুধিলাল বলছে, না বাবু ঠিক নেহি হোগা।

নির্বিকার ভাব খানিকটা কাটে অনিমেষের। সোজা হয়ে বসে বুধিলালকে বলে, তো ক্যায়া করে গা হাম লোগ?

এক কাম কিজিয়ে, আপ লোগ এক-দো ঘণ্টা এহি ঠেহর যাইয়ে। হাম দোনো নীচে যা কর দুসরা গাড়ি ভেজ দেতে হ্যাঁয়।

BanglaBook.org

সমস্যা নিয়ে এবার একটু সজাগ হয় অনিমেষ। গলায় জোর এনে বলে, মাথা খারাপ নাকি তোমার। প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেগেছে গাড়ি করে এখানে আসতে। তুমি হেঁটে নীচে গিয়ে গাড়ি পাঠালে, চারঘণ্টার আগে সে গাড়ি এখানে পৌঁছোবে না। ততক্ষণ আমরা কি এখানে ভ্যারেন্ডা ভাজব?

'ভ্যারেন্ডা' শব্দটা নিশ্চয়ই অচেনা বুধিলালের, ভাজাভুজির কথা শুনেই হয়তো বলল, আপ লোগ ইঁহা নাস্তা পানি করকে থোড়া ঘুম লিজিয়ে। দো ঘণ্টে কা অন্দর হাম ওআপস করেঙ্গে। নীচে যানে কা একঠো শর্টকাট রাস্তা হ্যায়।

এর বেশি কথা খরচ করতে রাজি নয় বুধিলাল, হাঁটা দিয়েছে নীচের শহরের উদ্দেশে। ওর হেল্পারও চলেছে পাশে পাশে।

অনিমেষ তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। ডাকতে থাকে, বুধিলাল, ও বুধিলাল!

ডাকের মধ্যে অসহায়তার ছোঁয়া। ঘুরে দাঁড়ায় ড্রাইভার, হেল্পার। অনিমেষ বলে, তুম দোনো চলে যায়গা তো ক্যায়সা হোগা! হাম দোনো ইঁহা তুমাহারা জিপ গার্ড দেগা ক্যায়া?

গার্ড দেনেকা কই জরুরত নেহি। ইঁহা কুছ নেহি হোগা। আপ লোগ আপনা মরজি সে ঘুমিয়ে না। বলে বুধিলাল। অনিমেষের গলায় এবার অভিমানী অনুযোগের সুর, ইয়ে তুম ঠিক নেহি কিয়া। হাম লোগ ইঁহা কা কুছ জানতা নেহি হ্যায়। জঙ্গল কে অন্দর রাখ কর চলে যা রহে হো।

ইয়ে জঙ্গল মে কই খতরনাক জানওয়ার নেহি হ্যায়। আপ ডরিয়ে মাত। বলে, ঘুরে যায় বুধিলাল। এবার পৃথা বলে ওঠে, তোমাদের দু'জনেরই যাওয়ার কী আছে, বুঝতে পারছি না।

বুধিলাল দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দেয়, হামি ইয়ে জিপ কা পার্টস লাতে মার্কেট যাব। সুমন আপ লোগো কো লিয়ে গাড়ি লে আয় গা।

আর কিছুই বলার নেই। ওরা যদি আর না আসে, তা হলেও কিছু করার নেই। বুধিলাল, সুমন, ক্রমশ মিশে যাচ্ছে জঙ্গলের রাস্তায়।

দু'জনের অনুপস্থিতিতে আরও যেন নির্জন হয়ে যায় চারপাশ।

BanglaBook.org

অনিমেষের দিকে তাকাতে এখন অস্বস্তি হচ্ছে পৃথার। মুখে না হোক, চোখ দিয়ে অন্তত অনিমেষ বলবেই, তোমার হুজুগের কারণে আজ এই বিপত্তি।

অচল জিপটার দিকে চেয়ে থাকে পৃথা। দৃষ্টিপথে ঢুকে আসে অনিমেষ। এগিয়ে যাচ্ছে জিপের দিকে।— এ মা। এ কী! জিপে গিয়ে একটা লাথি মারল অনিমেষ। নিথর গাড়িটা কেঁপে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে খুবই হতাশ হয়ে এভাবে রাগ প্রকাশ করছে।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ। ফের এগিয়ে গেল জিপের দিকে। পিছনে সিট দুটোর মাঝে রাখা ব্যাগ হাঁটকাচ্ছে। কী খুঁজছে?

পৃথার কৌতূহল নিবৃত্ত করে অনিমেষ বার করেছে মদ এবং জলের বোতল আর গ্লাস। চানাচুরের প্যাকেটটাও মনে হচ্ছে হাতে আছে। নেশার সরঞ্জাম সব নিজের ব্যাগে গুছিয়ে তুলেছিল। এবার বেড়াতে বেরোনোর আগে ওরা যে যার নিজের ব্যাগ গুছিয়েছে।

নেশা করার আর সময় পেল না অনিমেষ! কেন এরকম হঠকারী কাজ করছে কে জানে! বেশি নেশা হয়ে গেলে হাঁটার শক্তি থাকবে না। গাড়ি যদি না আসে, রাত কাটাতে হবে এখানেই। অনিমেষ কি ঘুরিয়ে শাস্তি দিতে চাইছে পৃথাকে, নাকি চাইছে পৃথা ওকে গিয়ে মানা করুক?

দূরে ফাঁকা চাতাল দেখে, বসেছে অনিমেষ। পিঠ পৃথার দিকে। পৃথা দু'পা এগিয়ে ছিল কিছু বলবে বলে, দাঁড়িয়ে যায়। মনে পড়ে এক সপ্তাহ আগে একদিন রাগ করে রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়েছিল পৃথা। অনিমেষ একবারের জন্য সাধেনি। আগে সাধত, রাগারাগি করে পৃথা না খেলে, অনিমেষ অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বরফ গলাতে না পেরে নিজেও না খেয়ে শুয়ে পড়ত।

বিয়ের বয়স মাত্র চার বছর। অনিমেষ আর কেয়ার করে না পৃথা খেয়েছে কি খায়নি। পৃথাই বা কেন ওকে বারণ করতে যাবে নেশা করতে।

বাঁহাতি মানুষ-সমান একটা পাথরখণ্ড, সবুজ ঘাস, লতায় ঢাকা। ছোট্ট টিলাটার নীচে ছেয়ে আছে নীল ফুলের গাছ। অনেকটা লিলিফুলের

BanglaBook.org

মতো দেখতে। তবে হাইটে বেশ ছোট। ওই জায়গাটা পছন্দ হয় পৃথার। পায়ে পায়ে গিয়ে ফাঁকা দেখে বসে। নীল ফুলগুলোর আলোকিত মুখ দেখে মনে হয় বুঝি হাসছে। হাসিতে নিকটজনের সম্ভাষণ।

সামান্য পা ছড়িয়ে বসেছে পৃথা। একটা প্রজাপতি কোথা থেকে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। কী অপূর্ব তার ডানার রং কারুকাজ। কখনও সখনও প্রজাপতিটা গিয়ে বসছে ফুলের ওপর। ফিরেও আসছে তক্ষুনি। বাতাসে চোরা ঠান্ডা। অনিমেষের দিকে আর তাকায় না পৃথা। প্রজাপতির ওড়ায় চোখ রেখে ভাবতে থাকে হারিয়ে যাওয়া পার্সোনাল ডায়েরিটার কথা।

তেরো বছর বয়সে পাগল হয়ে যায় দিদি। তারপর থেকেই ডায়েরি লেখে পৃথা। যখন যেমন খুশি। ওই একটাই ডায়েরি, মোটা মতো, বাদামি কভার। বাবার স্নেহভাজন মলয়কাকু গিফট্ করেছিল। দিদিকেও দিয়েছিল, একটা অক্ষরও লেখেনি। পৃথার ডায়েরিটা হারিয়ে গেছে শ্বশুরবাড়ি এসে। খুব নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে 'চুরি গেছে' বলাই ভাল। কে চোর, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে পৃথা। ডায়েরিটা উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করে না। এ তো সোনার গয়না নয় যে ফেরত পেলে দাম একই থাকবে। ব্যক্তিগত ডায়েরি চুরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূল্যই নষ্ট হয়ে যায়।

নানা কাজের ফাঁকে একটু অন্যমনস্ক হলেই ডায়েরির নিরুদ্দিষ্ট অক্ষরগুলো মনে করার চেষ্টা করে পৃথা। মনে পড়ে অল্প অল্প, অক্ষরগুলো যেন হারিয়ে গেছে ভিড় বাজারে। যেখানে সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টি।

আজ এই পাহাড়ি নির্জনতায় ডায়েরির লাইনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে মনে আসছে। একটা পাতায় পৃথা লিখেছিল, আমাদের ছোটবেলায় বাবা বলত, আমার দুটো মেয়েই ছিটিয়াল, পাগলি। আদর করে বলত। দিদি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। আমি হলাম না। আমাকে কি কম ভালবাসত বাবা?...

বেশ গুছিয়েগাছিয়ে নেশা করতে বসলেও, আসলে কিন্তু করছে না অনিমেষ। সেই থেকে এক পেগ ঢেলে, ধীরে ধীরে চুমুক মারছে। ওর

BanglaBook.org

সমস্ত আয়োজনের লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথাকে শঙ্কিত রাখা। উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। পৃথা তো দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে আছে দূরে।

খানিক আগে পৃথাকে ঘিরে একটা প্রজাপতি উড়ছিল, এখন আরও দুটো জোগাড় হয়েছে। মানুষ তো বটেই, পৃথা কি এখন অন্য প্রাণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে?

পৃথা বেশির ভাগ সময় পরিবৃত থাকে। আলাপের প্রথম দিন থেকেই দেখেছে অনিমেষ। ওর উপস্থিতির মধ্যে ছটাকখানেক সম্মোহনকারক কিছু আছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ওকে ঘিরে রাখে। মোহমুগ্ধদের মুখে কোনও প্রত্যাশা নেই, কাছাকাছি থাকতে পারলেই তাদের ভাল লাগে। অনিমেষ ভেবে দেখেছে, পৃথার এই নির্দোষ সম্মোহনের উৎস হচ্ছে ওর অপাপবিদ্ধ লাবণ্যময়ী রূপ। ওর সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যখন ও রেগে ওঠে, বিরক্ত হয়, এতটুকু হানি হয় না রূপের। বরং আরও ধারালো হয়ে ওঠে।

ওই বিদগ্ধ রূপ ভেদ করে পৃথার হৃদয়ে পৌঁছোনো বড় কঠিন। ও আসলে কী চাইছে, ওর ক্ষোভটা কোথায়, কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। বিয়ের এই চার বছরে পৃথা মোটামুটি অচেনাই থেকে গেছে অনিমেষের কাছে।

এই যে এখন চারপাশে সবুজ, পায়ের কাছে নীল ফুলের মাঝে গোলাপি শাড়ি পরে বসে আছে সে, অল্প কোঁচকানো কালো চুলের এক গোছা এলিয়ে আছে ধবধবে সুডৌল গালের ওপর। শীত হাওয়ার কারণে চোখ ছোট করে, একটু যেন সিঁটিয়ে আছে মুখ। একটা প্রজাপতি এখন উড়ছে মাথার ওপর। এই মেয়েটাকে আজও অচেনা লাগে।

গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে নেয় অনিমেষ। পৃথার কি একটা ছবি তুলবে, এই প্রেক্ষাপটে ওকে দারুণ লাগছে। দার্জিলিংয়ে পৃথার একটাও ছবি তোলা হয়নি। তুলতে গেলে ন্যাকামি ভাববে। ভাবুক, এখন একটা ছবি তুলবেই অনিমেষ। মদের একটা মস্ত গুণ, দ্বিধা সংকোচ অনেকটাই কাটিয়ে দেয়।

ক্যামেরাটা রাখা আছে গাড়িতে, ব্যাগের ভেতর। নিয়ে আসার জন্য

BanglaBook.org

উঠতে যাবে অনিমেষ, পা-টা একটু টাল খেয়ে গেল। চট করে চোখ যায় পৃথার দিকে, ও কি লক্ষ করল? করেনি। যতটা সম্ভব নিজেকে স্টেডি রেখে জিপের দিকে এগিয়ে যায় অনিমেষ। নাঃ, আর একটুও নেশা করা ঠিক হবে না। নীচের শহরে হেঁটে যাওয়ার মতো সুস্থ রাখতে হবে নিজেকে। বুধিলাল যে আর ফিরবে না, ধরেই নিয়েছে অনিমেষ। পৃথার জন্য খারাপ লাগে, কত ইচ্ছে ছিল একদম সামনে থেকে দেখবে তুষারশৃঙ্গ। সান্দাকফু থেকে নাকি হিমালয়ের অনেকটা রেঞ্জ দ্যাখা যায়। অনিমেষ শিয়োর, সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পৃথা এখানে আসেনি, পাহাড়ের টানেই এসেছে। আর অনিমেষ কেন এল, সে নিজেই জানে না। হয়তো নির্জনে সম্পর্কের ফাটল ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে বলেই এসেছে।

জিপের কাছে গিয়ে ক্যামেরা বার করে আগের জায়গায় ফিরে এল অনিমেষ। ওর যাওয়া আসা হয়তো খেয়াল করেনি পৃথা। গভীর কোনও চিন্তায় ডুবে আছে।

পৃথার দিকে ক্যামেরা তাক করে অনিমেষ, ফোকাস করতে যেতেই ভেসে ওঠে কলেজের সেই দিন, পৃথাদের ব্যাচের নবীনবরণ হচ্ছে। দুটো ইউনিয়নের ছেলেরা বিষম ব্যস্ত। নতুন ছাত্রছাত্রীদের কনভিন্স করছে নিজেদের ইউনিয়নে নাম লেখাতে। অনিমেষ বসে ছিল সিঁড়ির নীচে চেয়ার-টেবিল নিয়ে। অনিমেষ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ওরাই কলেজে বিজয়ী দল। বিরোধী পার্টি যথেষ্ট সক্রিয়। গত ইলেকশনে মার্জিনাল ভোটে হেরেছে। চাঁদার রসিদ, নাম এন্ট্রির খাতা সামনে রেখে অনিমেষ শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল নতুন স্টুডেন্টদের দিকে। কারা স্বেচ্ছায় নাম লেখাতে আসছে, কারা চলে যাচ্ছে বিপক্ষের টেবিলে, কাদের বেশি বোঝাতে হচ্ছে। তখনই চোখে পড়েছিল ফুটফুটে সাবলীল এক মেয়েকে। তাকে ঘিরে বসে আছে গোটা দশেক মেয়ে। ওরা হয়তো এক স্কুল থেকে এসেছে।

পৃথার সৌন্দর্যের কাছে ঘেঁষতে বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল অনিমেষের ছেলেরা। ওরা কনভিন্স করার চেষ্টা করছিল পৃথাকে ঘিরে থাকা মেয়েগুলোকে। তারা আবার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। হঠাৎই উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়াল পৃথা। অনিমেষ দূর থেকে আন্দাজ করতে পারল, পৃথা বলছে, চল নামটা লিখিয়ে আসি।

পৃথাকে অনুসরণ করে এগিয়ে এল বাকি মেয়েরা।

স্বভাবগম্ভীর অনিমেষ সেদিন একটু বেশিই কথা বলেছিল পৃথার সঙ্গে। যার মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা ছিল, উইদাউট এনি হেজিটেশন তুমি আমাদের ইউনিয়নে জয়েন করলে, বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই আমাদের পার্টিকর্মী?

হ্যাঁ। আমার বাবা।

কী নাম তোমার বাবার?

শ্রীদেবনাথ কুশারী।

অনিমেষ দ্রুত নিজের মগজ হাতড়াচ্ছিল, ওই নামে কোনও কমরেডকে চেনে কিনা। মনে পড়ছিল না।

শ্রম লাঘব করতে পৃথা বলে ওঠে, আপনি চিনবেন না। বাবা সি পি আই করতেন।

পৃথার গলায় অভিমান না শ্লেষ ধরতে পারেনি অনিমেষ। সি পি আই ওদের ফ্রন্টে আছে ঠিকই, এই জেলায় তাদের প্রভাব প্রায় শূন্য। তবে ওর শেষ কথাটায় খটকা রয়ে গেল। অনিমেষ জিজ্ঞেস করে, করতেন মানে? এখন কি অন্য পার্টি...

না। এক বছর হল বাবা মারা গেছেন।

কথাটা শুনে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছিল অনিমেষ, সে ধরেই নিয়েছিল জেলার অনেক ফ্রন্ট বিক্ষুব্ধ সি পি আই কর্মীর মতো পৃথার বাবাও বুঝি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মুখে তক্ষুনি সরি বলে নিলেও মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছিল অনিমেষ। যাক, একজন কমরেড মৃত্যুর আগে তাঁর বিশ্বাস সন্তানের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছেন। বাম আন্দোলনে আস্থা রেখেছে পৃথা। মোটিভেট করেছে সঙ্গিনীদের। আর একটা জিনিস খেয়াল হয় তখন, বাবার নাম বলার আগে ঈশ্বর শব্দটা বসায়নি পৃথা, সেটা নিশ্চয়ই সচেতনভাবে। বাম আদর্শের শিক্ষাটা সঠিক পথেই হয়েছে।

মেয়েটাকে ভাল লেগে গেলেও, তার থেকে বেশি ভাবার অবকাশ

BanglaBook.org

পায়নি অনিমেষ। সে তখন বেজায় ব্যস্ত পার্টির কাজে। সে বছরই কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেল।

ভরতি হল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। সংগঠনের কাজে মাঝেমধ্যে আসতে হত পুরনো কলেজে। দেখা হত পৃথার সঙ্গে। নেতৃত্বে আগ্রহী নয় সে মেয়ে, পার্টিকে শুধু সমর্থন করে। আছে আগের মতোই হাসিখুশি। বন্ধুর সংখ্যা বেড়েছে।

কথায় কথায় অনিমেষ পার্টির অন্য কাজে ওকে টানার চেষ্টা করেছে, এড়িয়ে গেছে পৃথা। অনিমেষ তখন যেন নরমসরম, পাত্তা না-পাওয়া অভিভাবক। জোর খাটাতে পারত না পৃথার ওপর।

তারপর দীর্ঘ বিরতি। পৃথা কলেজ পার করে এম এ পড়ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনিমেষ মাস্টারস্ করে পড়ছে লাইব্রেরি সায়েন্স। রাজনীতির সঙ্গে যোগ তো আছেই। তার সঙ্গে জুড়েছে বিজ্ঞান ক্লাব, সাংস্কৃতিক মঞ্চ। এসব নিয়ে মেতে থাকতে থাকতে একটা ব্যাপার টের পাচ্ছিল অনিমেষ, কলকাতার যুব নেতৃত্ব তাকে কিছুতেই সামনের সারিতে আসতে দিচ্ছে না, দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে শাখা সংগঠনগুলোর। তা নিয়ে অবশ্য কোনও আক্ষেপ ছিল না অনিমেষের। পলিটিকাল কেরিয়ার তৈরি করার জন্য সে রাজনীতিতে আসেনি। মানুষের পাশে থাকবে বলেই এসেছিল। সমসাময়িক কমরেডদের মন্ত্রিত্বের বাসনা দেখে তার বেশ খারাপই লাগত। তবে প্রকাশ্যে পার্টির সমালোচনায় কোনওদিনই যায়নি অনিমেষ। এমন হতে পারে যতটুকু দায়িত্ব বা ক্ষমতা সে পেয়েছিল, তৃপ্ত ছিল অতটুকুতেই। পার্টির মূল স্রোতে না থাকার একটা খারাপ দিক আছে, আনুগত্যের রাশটা আলগা পড়ে যায়। হয়তো সেই কারণেই পার্টি থেকে আজ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন অনিমেষ। কিন্তু বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন নয়। পার্টির প্রতিপত্তি এখন এতটাই, অনিমেষের মতন সামান্য একজন কমরেডের বিচ্ছিন্নতায় খুব একটা কিছু যায় আসে না।

জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ ছেড়ে অনিমেষ ফিরে যায় সেই দিনে। অনেকদিন পর দ্বিতীয় দফায় দেখা হচ্ছে পৃথার সঙ্গে। লাইব্রেরি সায়েন্সের ক্লাস এবং সংগঠনের টুকটাক কাজ সেরে কলকাতা থেকে

BanglaBook.org

বাড়ি ফিরছে, হাওড়া স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে ছোট একটা জটলা, আলগা কৌতূহলে মুখ বাড়িয়েছিল অনিমেষ, ভিড়ের কেন্দ্রে একটি আলুথালু পোশাকের মেয়ে আর পৃথাকে দেখে অবাক হয়।

পৃথা মেয়েটিকে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে, মেয়েটা কিছুতেই বুঝবে না। বাচ্চাদের মতো মাথা নাড়ছে। বয়সে পৃথার থেকে কিন্তু বড়ই হবে।

ভিড় ঠেলে পৃথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অনিমেষ।

পাশে চেনা লোক দেখে এক নিমেষে সমস্ত উদ্বেগ উধাও হয়ে যায় পৃথার। যেন কালই দেখা হয়েছে এমন সুরে পৃথা বলে, ও, অনিমেষদা! ভালই হল। আপনি কাইন্ডলি দিদিকে একটু দেখুন, আমি চট করে টিকিটটা কেটে নিয়ে আসি।

অনিমেষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দিদিকে রেখে চলে গেল পৃথা। ঘিরে থাকা ভিড়টাও ক্রমশ পাতলা হতে হতে মিলিয়ে গেল। অনিমেষ জানতই না পৃথার কোনও দিদি আছে। দিদিটি যে একটু অস্বাভাবিক সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। মেয়েটি চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অনিমেষের দিকে।

মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে একটু ভয়, আশঙ্কাও হচ্ছিল। হঠাৎ যদি কিছু করে বসে, দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়!

স্নায়ু টানটান করে যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিল অনিমেষ। ওই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া মেয়েটি কিছুই করছিল না। বেশ খানিকক্ষণ পরে পৃথার দিদি একটি খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন করে, আপনি কি বোনের বন্ধু?

হঠাৎ কথা বলে ওঠাতে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল অনিমেষ। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ।

তা হলে টিকিটটা আপনি কাটতে গেলেন না কেন?

অত্যন্ত নায্য, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছিল না অনিমেষ। চেহারায় যতটা অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল পৃথার দিদিকে, দেখা গেল তা নয়।

একটু পরে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেয় পৃথার দিদি। বলে, জানি

BanglaBook.org

আপনি কেন যাননি টিকিট কাটতে। ছেলেদের তো লম্বা লাইন, মেয়েদের কম। বোন আপনার আগে টিকিট নিয়ে আসবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্যাবলার মতো হেসেছিল অনিমেষ। তারপর নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

মেয়েটির চোখে আরও এক পরত সন্দেহ ঘনীভূত হয়। একটু সময় নিয়ে বলে, নাম জেনে আপনি কী করবেন?

আর একদম কথা বাড়ায়নি অনিমেষ। অন্য দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল পৃথার।

খানিক বাদেই পৃথা ফিরে আসে। বলে, চলুন, বাড়ি ফিরবেন তো, একসঙ্গেই ফিরি।

একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে পৃথার সঙ্গে হাঁটতে থাকে অনিমেষ। অদ্ভুত মেয়েটি ততক্ষণে পৃথার ডানপাশে চলে গেছে। দিদির হাত ধরে আছে পৃথা। অনিমেষকে কোনও প্রশ্ন করতেই হয় না। পৃথা প্রথম কথাটা একটু চাপা গলায় বলে, দিদি সিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট। একটু গলা তোলে, ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। টিকিটের লাইনে কিছুতেই দাঁড়াবে না দিদি। ওকে একলা রেখে কী করে যাই টিকিট কাটতে। মাঝেমাঝে এমন জেদ ধরে না।...

কথাগুলো এমনভাবে বলে যাচ্ছিল পৃথা, যেন কোনও অবাধ্য বাচ্চা মেয়ের প্রসঙ্গে বলছে। 'সিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট' কথাটা উচ্চারণের সময় কোনও সমীহ দেখায়নি। গলাটা নামিয়ে নেওয়ার কারণ, দিদি যাতে শুনতে না পায়। রোগটা যেন বাড়াবাড়ি সর্দি-জ্বরের মতো। অনিমেষের যথেষ্ট ধারণা আছে সিজোফ্রেনিয়া কী মারাত্মক রোগ! গোটা পরিবারকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বাড়িতে এরকম পেশেন্ট থাকা সত্ত্বেও কী করে এত স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে পৃথা! রোগটা নিশ্চয়ই ওর দিদির অনেক দিনের সঙ্গী।

লোকাল ট্রেনে ওঠার আগে অনিমেষ বলেছিল, তোমরা তো শ্রীরামপুর থেকে রিটার্ন টিকিট কেটে নিতে পারতে, এখানে লাইনে দাঁড়াতে হত না।

পৃথা বলে, আমরা গিয়েছিলাম তিন নম্বর বাসে। স্ট্যান্ড থেকে

BanglaBook.org

উঠেছিলাম, ফাঁকা ছিল। ফেরার সময় ভিড় হবে, তাই ভাবলাম ট্রেনেই চলে যাই।

ট্রেন ফাঁকাই ছিল। শ্রীরামপুর লোকাল। সিটে বসে পৃথার হঠাৎ মনে পড়ল, ও মা, দেখেছেন, আপনার সঙ্গে দিদির আলাপটাই করানো হয়নি।—দিদির দিকে হাত দেখিয়ে বলেছিল, এই হচ্ছে আমার দিদি, তিথি কুশারী।—অনিমেষকে দেখিয়ে দিদিকে বলেছিল, উনি হচ্ছেন আমার কলেজের দাদা, অনিমেষ চ্যাটার্জি।

তিথি এমনভাবে নমস্কার করেছিল, যেন প্রথম আলাপ হল। একলা থাকার সময় যে- সব কথোপকথন হয়েছে, তার কোনও ছাপ ছিল না ওর চোখেমুখে। এটা কি ইচ্ছাকৃত, নাকি রোগের উপসর্গ একটা? বড় ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল অনিমেষ। পরে অবশ্য জেনেছে, এটা ওর রোগেরই প্রকাশ।

সেদিন নিজের স্টেশন কোন্নগরে নামার আগে অনিমেষ পৃথাকে বলেছিল, এরপর যেদিন দিদিকে নিয়ে চেক-আপে যাবে, আমাকে বোলো, আমি সঙ্গে থাকব।

ট্রেন হুইস্‌ল দিয়ে দিয়েছিল বলেই বোধহয় তাড়াতাড়িতে ঘাড় নেড়েছিল পৃথা। পরের দু'মাস কোনও ফোন করেনি। ট্রেনে সেদিন পৃথা বলেছিল, দিদিকে এক মাস অন্তর চেক-আপ করাতে হয়। ঠিকানা আদানপ্রদান হয়েছিল ট্রেনপথে। ঠিকানার সঙ্গে বাড়ির ফোন নাম্বার দিয়েছিল অনিমেষ। কোনও যোগাযোগ করল না পৃথা। ওদের বাড়িতে ফোন নেই। অনিমেষ রবিবার দেখে ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে গেল পৃথাদের বাড়িতে। পৃথা তো অবাক, এ কী আপনি।

এতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই। আমি বলেছিলাম দিদিকে চেক-আপে নিয়ে গেলে আমাকে ডাকবে। কোনও যোগাযোগই করছ না। বলেছিল অনিমেষ।

সিচুয়েশন দেখে অনেকেই ওরকম বলে। আপনি যে এতটা সিরিয়াসলি ব্যাপারটা বলেছিলেন বুঝতে পারিনি।

এখন বুঝতে পারলে তো? এবার বলো, দিদি কেমন আছে? কবে যাচ্ছ ডাক্তারের কাছে।

BanglaBook.org

দিদি মোটামুটি ভালই আছে। তবে আপনি কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করে আমাদের সঙ্গে যাবেন। আপনি যে কী রকম ব্যস্ত থাকেন ভাল করেই জানি।

চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিমেষ বলেছিল, এখন আর অত ব্যস্ত থাকি না পৃথা। পার্টি আমায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয় না।

আমি বিশ্বাস করি না। আপনার মতো কর্মীকে বসিয়ে রাখবে না পার্টি। হতে পারে কাজটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না। কী ধরনের কাজ করেন এখন আপনি?

পাটিকেন্দ্রিক আলোচনা ভাল লাগছিল না অনিমেষের, প্রসঙ্গ ঘোরায়, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করালে না তো?

ওঃ হো, কথা বলতে বলতে ভুলেই গেছি। মা রান্নাঘরে আছে। দাঁড়ান ডেকে আনছি।

পৃথা চলে যেতে বসার ঘরটায় চোখ বুলিয়েছিল অনিমেষ, তেমন চাকচিক্য না থাকলেও, পরিচ্ছন্নতা আছে। পৃথার বাবা কী চাকরি করতেন, তখনও জানত না অনিমেষ। পরে জেনেছে, মাধ্যমিক স্কুলের মাস্টারি। চাকুরিরত অবস্থাতেই ক্যান্সারে মারা যান। যে-বাড়িতে ক্যান্সার সিজোফ্রেনিয়ার মতো ভয়ংকর রোগ ছোবল মেরেছে সেখানে এতটুকু দাগ নেই কোথাও। সুনিপুণভাবে মুছে ফেলেছে পৃথা, পৃথার মা। দেওয়ালে টাঙানো পৃথার বাবার বাস্ট ছবি। হাসিটা বাবার মতোই পেয়েছে পৃথা। ভদ্রলোক যথেষ্ট সুদর্শন ছিলেন।

একেবারে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এলেন পৃথার মা। সঙ্গে পৃথা। মায়ের পরনে কাচা শাড়ি। সম্ভবত তক্ষুনি বদলেছেন। সময়টা লেগেছে চা তৈরি আর শাড়ি বদলের জন্য। পৃথার দিদির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

টেবিলে চা রেখে মা বললেন, তোমার কথা মেয়ের মুখে অনেক শুনেছি। সেদিন হাওড়া স্টেশনে দেখা হয়েছিল, সে কথাও বলেছে। তোমার মতো একজন লিডার মানুষ আমাদের বাড়িতে এসেছ, ভাবতেই কেমন যেন...

কথা কেটে অনিমেষ বলেছিল, আমি মোটেই লিডার ফিডার তেমন

BanglaBook.org

কিছু নেই, বরং আমিই এসেছি একজন প্রয়াত নেতার বাড়িতে।

পৃথার মা বলেছিলেন, তোমার কাকাবাবু কেমন নেতা ছিলেন, সে আর আমাকে বোলো না। নাইট স্কুলের জন্য চাঁদা তুলতে বেরোতেন, সঙ্গে কোনও ছেলে পেতেন না। অতদিন বিছানায় পড়ে ছিলেন, পার্টির কোনও বড় নেতা দেখতে আসেননি...বলতে বলতে কী যেন মনে পড়ল, থেমে গিয়ে বললেন, কংগ্রেসের এক নেতা অবশ্য এসেছিল, খরচাংশ দিতে চেয়েছিল চিকিৎসার। উনি নেননি।

ফাঁক পেয়ে পৃথা বলে উঠেছিল, জানেন অনিমেষদা, বাবা না এমন একটা কথা বলেছিল সেই লিডারকে, উনি আর আমাদের বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকেননি।

কী কথা? জানতে চেয়েছিল অনিমেষ।

বাবা বলেছিল, এমনিতেই তো আপনাদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছে আমাদের। আয়ুর প্রান্তে এসে এখন যদি আপনাদের পার্টির অনুগ্রহ নিই, মৃত্যুর পর আমার একমাত্র প্রাপ্য লাল চাদরটা কলকাতা থেকে এসে পৌঁছোবে না।

কথাগুলো শুনে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল অনিমেষ। ব্যক্তি অনিমেষ নয়, কমরেড অনিমেষ চ্যাটার্জি। পৃথার মা অন্য কথায় চলে যান, অনিমেষের বাড়ির খবরাখবর নেন। পৃথার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা করেন। সংসারের প্রয়োজনে পৃথার চাকরির খুব দরকার। কথায় কথায় অনিমেষ জানতে পারে পৃথারা একসময় যৌথ পরিবার ছিল, জ্যাঠা-কাকার অবস্থা ক্রমশ ভাল হতে থাকে, বড় জ্যাঠার এক ছেলে আমেরিকায় চলে গেছে, নিয়মিত টাকা পাঠায়। মূলত আর্থিক বৈষম্যের কারণেই, সংসার, বাড়ির অংশ, ভাগ হয়ে যায়।

মায়ের কথার মাঝে উসখুস করছিল পৃথা, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সে চাইছে সংসারের দুরাবস্থার বিবরণ বন্ধ করুক মা। পাশের ঘর থেকে ভেসে এসেছিল পৃথার দিদির ডাক, মা, মাগো কোথায় গেলে?

একদম বাচ্চা মেয়ের মতো ডাকছিল তিথি। উঠে গিয়েছিলেন পৃথার মা।

আরও কিছুক্ষণ ওদের বাড়িতে থেকে অনিমেষ যখন ফিরবে,

BanglaBook.org

পৃথাকে বলেছিল, তা হলে ওই কথা রইল। এরপর যেদিন ডাক্তারের কাছে যাবে, বলবে আমায়।

পৃথা বলেছিল, যাওয়ার সময় তো কোনও অসুবিধে হয় না, ফেরার সময় আপনি না হয় হাওড়া স্টেশনে থাকবেন।

সেইমতো কয়েক মাস চলল, অনিমেষ কোন্নগরে না নেমে সোজা পৃথাদের বাড়িতেই চলে যেত। পৃথার মা আন্তরিক আতিথেয়তা করতেন। তিথিও অনিমেষের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল। পৃথা এমন কথাও বলত, আপনি সঙ্গে থাকলে, দিদি অনেক শান্ত থাকে।

একটা সময় ডাক্তারের উপলক্ষ ছাড়াও পৃথার সঙ্গে আলাদা দেখা করতে লাগল অনিমেষ। কখনও কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, কোনও একটা ভাল সিনেমা অথবা শুধুই হেঁটে যাওয়া।

রূপসির পাশে থাকার সময় অনিমেষের কেন জানি মনে হত, আশপাশের লোকজনের দৃষ্টিতে একটাই কথা লেগে আছে, ছেলেটা বড্ড বেমানান।

অনিমেষ তখন চুল-দাড়ি সমৃদ্ধ, ইস্ত্রি-উদাসীন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটি ছেলে। পৃথার পাশে মানানোর জন্য মাঝেমধ্যে প্যান্ট-শার্ট পরা শুরু করল অনিমেষ। দাড়িটা দুম করে কেটে ফেলার সাহস হয়নি।

হঠাৎ ভোল বদল দেখে বন্ধু-বান্ধব, বাড়ির লোকেরা টুকটাক মন্তব্য করতে লাগল। এমনকী বয়েসে পাঁচ বছরের ছোট ভাই সুমিত, যে দাদাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে, সে পর্যন্ত বলে বসল, দাদা, তোমার চেহারা থেকে কমরেড কমরেড ভাবটা কমে যাচ্ছে। তবে আমার ভালই হল, জামা-প্যান্টের স্টক বাড়ল। তোমারগুলো মাঝেসাঝে পরতে পারব।

যার জন্য এত কিছু, তার কোনও বিকার নেই। শুধু বলল, প্যান্ট-শার্টেও আপনাকে বেশ ভালই লাগে। কলেজে কখনও দেখিনি, না?

আর একটা ব্যাপারেও খুব সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিল অনিমেষ, এত জায়গায় ঘুরছে, কত কথা বলছে পৃথার সঙ্গে, প্রেমের কোনও আভাস-ইঙ্গিত নেই কথাবার্তায়। পড়াশোনা, রাজনীতি, কেরিয়ার,

BanglaBook.org

দেশের অবস্থা, সঙ্গে কিছু মজা, হাসিঠাট্টা, যেমনটা দু'জন বন্ধুর মধ্যে হয়।

মানুষের একটা সাধারণ ধারণা আছে দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হলে বুঝি 'প্রেম' জন্ম নেয়। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কনসেপ্ট, প্রেমের সব থেকে বড় শত্রু বন্ধুত্ব, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল অনিমেষ। হঠাৎ গলা ভারী করে, কথার সূক্ষ্ম জাল বিস্তারের পর প্রেম নিবেদনের কৌশল অনিমেষের আয়ত্তে ছিল না, চেষ্টা করতে গেলে হয়তো হাস্যাস্পদ হত পৃথার কাছে। একটা সময় যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল, এক রবিবার পৃথাদের বাড়ি গিয়ে শুনল, সে নেই। কোনও এক বন্ধুর বিয়ে, সকাল থেকে তাদের বাড়িতে গেছে।

পৃথার মায়ের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলে উঠে আসছিল অনিমেষ। একটু বসতে বললেন উনি, কী যেন কথা আছে। সেকেন্ড রাউন্ড চা নিয়ে এসে পৃথার মা বলেন, তোমাকে আমি এখন কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব। কোনও দ্বিধা-সংকোচ না করে উত্তর দেবে। আমাদের আজকের কথাবার্তা কখনও কেউ যেন না জানতে পারে। বিশেষ করে পৃথা।

বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল অনিমেষ, তার সঙ্গে ভদ্রমহিলার কী এমন গোপন কথা, যার জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করছেন। বোঝা গেল পরের প্রশ্নটা থেকেই। উনি জানতে চাইলেন, তুমি কি আমার মেয়েকে ভালবাসো?

এরকম সরাসরি প্রশ্নে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল অনিমেষ, পৃথার মা ফের বলেন, দ্বিধা কোরো না, যা সত্যি তাই বলো।

হ্যাঁ, মাথা নামিয়ে বলেছিল অনিমেষ।

পৃথাকে বিয়ে করবে তুমি?

দ্বিতীয় প্রশ্নটাতে অনিমেষ বুঝে যায়, ভদ্রমহিলাকে সব কিছু খোলাখুলি বলা যাবে। বলেও ফেলে অনিমেষ, পৃথাকে আজ অবধি আমি ভালবাসার কথা বলতেই পারিনি। পৃথাও বলেনি আমায়।

বলবেও না। আমাদের কিছু কুটিল আত্মীয় পৃথার কানে বিষ ঢেলেছে ওর স্কুলবেলা থেকে। বলেছে, দেখিস তোকে প্রেম করেই বিয়ে করতে হবে। বাড়িতে পাগলি দিদি থাকার কারণে দেখাশোনা করে তোর বিয়ে

BanglaBook.org

হবে না। আমার মেয়ে ভীষণ সেন্টিমেন্টাল, তারপর থেকেই সে জিদ ধরে বসে আছে, প্রেম-ভালবাসা করে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না।

প্রতিজ্ঞা শুনে অনিমেষ তো রীতিমতো হতাশ, এতদিন যে পৃথা তাকে সময় দিল, তার মধ্যে কি একটুও ভালবাসা ছিল না!

পৃথার মায়ের পরের কথায় আশ্বস্ত হয় অনিমেষ। উনি বলেছিলেন, মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছি, ও তোমাকে বেশ পছন্দই করে। বিয়ের ব্যবস্থা করলে আপত্তি করবে না।

ব্যবস্থা! সবিস্ময়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছিল অনিমেষ।

পৃথার মা বলেন, তুমি একদিন পৃথাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ি যাও। মা-বাবাকে বলে রেখো পৃথাকে তোমার পছন্দ। তারপর ওঁদেরও যদি ভাল লাগে পৃথাকে, চেষ্টা করবে প্রস্তাবটা তোমাদের বাড়ি থেকেই যেন আমার কাছে আসে। তা হলে আর আমার মেয়ে বিয়েতে না করতে পারবে না।

পৃথার মায়ের নিখুঁত প্ল্যানিং শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ! ভদ্রমহিলা এত বুদ্ধি ধরেন, বোকা সেজে থাকেন মেয়েদের কাছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে নেমে পড়ে অনিমেষ, পৃথাকে দেখে এক চান্সে পছন্দ হয়ে যায় বাবা-মা, ভাইয়ের। মায়ের অনুরোধে মাসি-মেসো বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় পৃথাদের বাড়ি।

পৃথা আজও জানে না তার বিয়ের পিছনে কতটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। পৃথার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ার পর থেকে উলটো সন্দেহ হয় অনিমেষের, সে নিজেই ষড়যন্ত্রের শিকার নয় তো? কোনও আত্মীয় নয়, পৃথার মা নিজেই হয়তো আশঙ্কিত ছিলেন মেয়ের বিয়ে নিয়ে। বিয়েটা ত্বরান্বিত করতেই ছকে ছিলেন ফুলপ্রুফ প্ল্যান। হবেও বা।

তবে ভদ্রমহিলা একটা তথ্য খুব সঠিক দিয়েছিলেন। মেয়ে ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, যাকে মিঠে করে সেন্টিমেন্টাল বলেছিলেন। পৃথার মর্যাদাবোধ যে কতটা প্রবল, শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই প্রমাণ দিতে লাগল। বাবা-মা পুরনো আমলের মানুষ, পৃথার অনেক আচার-আচরণ তাদের পছন্দ হত না। লেগে যেত খটাখটি। এক এক

BanglaBook.org

সময় অতিষ্ঠ হয়ে অনিমেষ পৃথাকে বলেছে, চলো, আমরা আলাদা থাকি। পৃথা তাতেও রাজি নয়। বলেছে, কেন যাব, আমার কী দোষ?

এইভাবেই চলল চার চারটে বছর। এই অশান্তির মধ্যে সন্তান ধারণে আগ্রহী নয় পৃথা। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সে নিজেই করে। এখন তো যৌন সংস্রব নেই বললেই চলে।

অনিমেষ না পারে বাবা-মা'র পক্ষ নিতে, না মানছে বউয়ের সব কথা। বিচ্ছিরি এক পরিস্থিতি। অবস্থা চরমে উঠল পৃথার ডায়েরিটা হারিয়ে যাওয়ার পর। পৃথার ধারণা বাবা নিয়েছে ডায়েরিটা। এই মুহূর্তে বাবার বিরোধিতা করা উচিত অনিমেষের। সাতপাঁচ না ভেবে অনিমেষ সোজা বাবাকে গিয়ে ধরল, তুমি দেখেছ বউমার ডায়েরি? হয়তো গুছিয়ে তুলে রেখেছ কোথাও, এখন মনে পড়ছে না। তুমি আমাকে দাও, আমি তোমার বউমাকে বলব, ডায়েরিটা আমিই খুঁজে পেয়েছি।

বাবা অনেকক্ষণ চেয়ে ছিল জ্যেষ্ঠ সন্তানের দিকে। হয়তো মনে পড়ছিল, অসুস্থ ছেলের পাশে রাত জাগা, হায়ার সেকেন্ডারি অবদি পরীক্ষার সময় টিফিন দিতে যাওয়া। ছেলের খেলা দেখতে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা। এমনকী পথসভা করতে গিয়ে অনিমেষ দু'-চারবার দেখেছে, বাবা দূরে ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে ছেলের স্পিচ শুনছে। তখন নিশ্চয়ই গর্বিত হত বাবা। চোখ হত উজ্জ্বল।

ছেলের কুশলী অভিযোগ শুনে সেদিন বাবার সেই চোখ দিয়েই অবিরল ধারায় নেমে আসছিল জল। অনেক কষ্টে বলেছিল, বউমার মতো তুইও আমায় সন্দেহ করিস!

বাবার সামনে আর দাঁড়ায়নি অনিমেষ। পৃথার কাছে এসে বলেছিল, বাবা তোমার ডায়েরি নেয়নি।

উনিই নিয়েছেন। তিরিক্ষি মেজাজে বলেছিল পৃথা।

ডায়েরিটা নিয়ে বাবার কী লাভ?

বিয়ের পর থেকে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন, এখন কৌতূহলী হয়েছেন বিয়ের আগের জীবনের প্রতি। আমার পুরো অস্তিত্বটা উনি গ্রাস করতে চান।

'গ্রাস' শব্দের অভিঘাত সহ্য করতে পারেনি অনিমেষ, বিশেষ করে

BanglaBook.org

সেটা যখন তার বাবার উদ্দেশে বলা হচ্ছে, উত্তেজনার মুহূর্তে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে অনিমেষ। স্থায়ীভাবে বড় একটা ফাটল তৈরি হয়ে যায় দাম্পত্যে।

তিন

বাপ্পা বলল, সুগত, ক্যামেরা বার কর।

কেন?

ছবি তুলবি।

ধুস শালা, ছবির নিকুচি করেছে। জল না পেয়ে ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমার। কতক্ষণ বাঁচব তার ঠিক নেই...

সেই জন্যেই তো বলছি ছবি তুলে রাখতে। তিনজনের একসঙ্গে। সেল্ফ শার্টারে রেখে তুলব। হাসিমুখে কাঁধে হাত রেখে তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছি। সেটাই হবে আমাদের শেষ ছবি। আর মাইল খানেকের মধ্যেই আমরা বডি রাখব। ডেডবডি ক্যামেরা উদ্ধার করবে পুলিশ। ক্যামেরাবন্দি ফিল্ম থেকে প্রিন্ট করা হবে। তিনজনের হাসিমুখের ছবিটাই কাগজে বড় করে বের হবে।

বাপ্পার কথা শুনে এই কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলে সুগত। জল নেই জানার পর থেকে রাস্তা ক্রমশ খাড়াই হচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে দম। সুগত বলে, রায়নকে দেখ, ওরই তো প্রথমে তেষ্টা পেয়েছিল। ও কি আর ক্যামেরার সামনে হাসতে পারবে?

পিছন ফিরে দেখাটাও এখন বেশ পরিশ্রমের কাজ মালুম হচ্ছে, দায়িত্বটা তাই বাপ্পার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল সুগত। একটু পরেই পেল বাপ্পার ভয় পাওয়া গলা, কোথায় গেল রায়ন, দেখতে পাচ্ছি না!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকায় সুগত, বুক ধক করে ওঠে। বাঁকহীন রাস্তা অনেকটা দেখা যাচ্ছে, রায়ন নেই।

দ্রুত খাড়াই বেয়ে নামতে থাকে সুগত, অনুসরণ করে বাপ্পা। একটু আগের পথক্লান্তি উধাও। রায়ন ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল ছেলে। কতটা

BanglaBook.org

তেষ্টা পাওয়ার পর জল খেতে চেয়েছিল, কে জানে! অসুস্থ হয়ে খাদে পড়ে গেল না তো?

বেশি দূর যেতে হল না। রাস্তার ধারে মাথা নিচু করে বসে আছে রায়ন। ছোট একটা ঝোপের আড়ালে ছিল বলে দেখা যায়নি।

কী রে, কী হল, বসে পড়লি কেন? জানতে চেয়ে রায়নের সামনে বসে বাপ্পা।

সুগত একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, শরীর খারাপ লাগছে?

মাথা তোলে রায়ন। উজ্জ্বল মুখখানা বিবর্ণ, ফ্যাকাশে মেরে গেছে। চশমার তলায় দীঘল চোখ দুটোর অবস্থা আরও করুণ। বলে, আমি আর পারছি না রে, ভয়ংকর তেষ্টা পেয়েছে।

সুগত বোঝায়, তেষ্টা তো আমাদেরও পেয়েছে। কী করা যাবে। জল পেতে গেলে হাঁটতে তো হবেই।

আমি আর এক পা-ও হাঁটতে পারব না।

জল নেই শুনে, তুই আসলে নার্ভাস হয়ে গেছিস। সাইকোলজিক্যাল প্রেশার পড়ছে। এই তো আমরা হেঁটে যাচ্ছি, জানি ঝরনা টরনা কিছু একটা পাবই।

সুগতর কথার পর মাথা নাড়তে থাকে রায়ন। দম ছেড়ে বলে, পাব না। চার কিলোমিটার মতো এসেছি, একটাও ঝরনা দেখেছিস? ফের শ্বাস নেয়। বলে, এ পাহাড়ে কোনও ঝরনা নেই। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এই রাস্তাতেই আমার মৃত্যু লেখা আছে। আমি হেঁটে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকেই।

এই রে, জল না পেয়ে শালার মাথাটাই গেছে। বলে, উঠে দাঁড়ায় বাপ্পা। তারপর বেশ জোর দিয়ে বলে, ওঠ তো তুই, আধঘণ্টার মধ্যে যদি জলের ব্যবস্থা না করতে পারি তো আমার নাম নেই।

সুগত মাঝখান থেকে হঠাৎ খেপে গেল। বাপ্পার উদ্দেশে বলে ওঠে, তোর জন্যেই তো এই অবস্থা। সবসময় মাসিমাসি ভাব, 'তোরা ছেড়ে দে, আমি সব গুছিয়ে রাখছি, তোদের কিছু চিন্তা করতে হবে না' এখন হল তো, ছ'লিটার জল গুছিয়ে রেখে এসেছ লজে।

আহা, ওকে বকিস না। ভুল সবারই হয়। তোর-আমারও হতে পারত।

BanglaBook.org

রায়নের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদে বিস্মিত হয় দু'জনেই। সুগত বলে, ওরে শালা, তোর মধ্যে দেখছি এখনও মানবিকতা কাজ করছে। তার মানে আরও অনেকক্ষণ বাঁচবি তুই। চ-চ, উঠে পড়।

রায়নের বগলে হাত ঢুকিয়ে টেনে দাঁড় করায় সুগত। বাপ্পা সাহায্য করে। ওদের তিনজনের কাছে এখন লাঠি। বাপ্পা খানিক আগে রাস্তার পাশে ঝোপঝাড় থেকে কেটে এনেছে। রায়নের লাঠি মাটিতে পড়ে ছিল, বাপ্পা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে, ধীরে ধীরে হাঁট, কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। কোনওরকমে যদি তিন কিলোমিটার মেরে দিতে পারিস, তা হলেই আমাদের ফার্স্ট হল্ট, চিত্রে গ্রাম। ওখানে চা-জল খেয়ে ফের হাঁটা।

তিন কিলোমিটার! বলে, ফের দাঁড়িয়ে যায় রায়ন। দম নিয়ে বলে, পাহাড়ে তিন কিলোমিটার মানে প্লেন ল্যান্ডের তিরিশের সমান। আমি আর দশ মিনিট হাঁটতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।

সুগত বলে, ছাড় না বাপ্পার কথা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা ঝরনা নিশ্চয়ই পাব।

কী করে জানলি পাবি? জিজ্ঞেস করে বাপ্পা।

রাস্তার দু'পাশের জঙ্গলে চোখ বুলিয়ে সুগত বলে, গাছপালার রং দেখেছিস কী সবুজ। তা ছাড়া কত ফার্ন গাছ, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও জলের সোর্স আছে।

কথাটা শুনে চট করে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় বাপ্পার। এই সময় মেয়ের কথা তোলা ঠিক হবে না। ঝাড় দিতে পারে সুগত। বদলে বাপ্পা বলে, ঝরনার জল খাওয়া কিন্তু সেফ নয়। হিল ডায়রিয়া হতে পারে। আমাদের মতো সমতলের লোকেদের সহ্য হবে না।

ছাড় তো ডায়রিয়া, জল না পেয়ে এখনই মরে যাচ্ছি। বলে সুগত।

তবু ডায়রিয়ায় মরাটা খুব অশ্লীল, অগৌরবের। তেষ্টায় মরে যাওয়ার মধ্যে একটা রোমান্টিক ব্যাপার আছে।

বাপ্পার কথায় এত কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলল রায়ন। হাসতেও খুব অসুবিধে হচ্ছে। চড়া পড়ে গেছে গলায়। জিভটাকে মনে হচ্ছে শুকনো শুকতলা। চোখের সামনে গাছ ফুঁড়ে আসা আলো, রাস্তা, জঙ্গল, সব

BanglaBook.org

যেন ঘষা কাচের এপার থেকে দেখছে। কানে তালা লাগা ভাব। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে রায়ন। তার এখন আর কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। কত দূর হাঁটতে পারবে তাও জানে না। এইটুকুই যে পারছে, তার কারণ সুগত-বাপ্পার মতো প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ আত্মিক বন্ধু দু'জনের সান্নিধ্য।

একটু আগে সে যখন বসে পড়েছিল মাটিতে, মৃত্যুকে অনুভব করতে শুরু করেছিল। মা এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। পরনে সেই খয়েরি ডুরে শাড়ি, হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে আসার পর যে তাঁতের শাড়িটা বার করে দিয়েছিল কাকিমা। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, দিদিকে এই শাড়িটা দিয়ে সাজাও, শখ করে কিনেছিল, পরতে পারেনি।

এর আগে যে ক'বার মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছে রায়ন, মা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। পরনে সেই ডুরে শাড়ি। মরে যাওয়ার পর মায়ের হাসিটা আরও সুন্দর হয়েছে।

রায়নের একটু মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়ার ঝোঁক আছে। রাস্তাঘাটে প্রায়ই গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। কারখানাতে দু'বার বড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচেছে। একবার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে গণ্ডগোল হচ্ছিল, প্রোডাকশন বন্ধ। মিস্ত্রি ডাকা হয়েছে, আসেনি। পাকামি মেরে হাই ভোল্টেজ লাইনে কাজ করতে গিয়েছিল রায়ন। একটা তার পাঞ্চ হয়েছিল, যেই হাত দিয়েছে, বেদম শক। আধ ঘণ্টা অজ্ঞান। জ্ঞান হারানোর আগে মাথার কাছে দেখেছিল মাকে।

আর একবার অসাবধানতায় লোহার বিম ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে একজন লেবার হাত ধরে টেনে নেয়। এসব অ্যাক্সিডেন্টের কথা মামা অবশ্য জানে না। লেবারদের বলতে বারণ করে দিয়েছে রায়ন।

রিটায়ারমেন্টের দিন বাবাকে অফিস থেকে আনতে গিয়ে চোদ্দো তলার থেকে পড়েই যেত রায়ন, কীভাবে যেন বেঁচে যায়। সেদিনও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল মা। হাসছিল একই রকম ভাবে। হাসিটার ঠিক মানে করতে পারে না রায়ন, কী যেন বলতে চায় মা! মৃত্যুর জগৎ সম্বন্ধে কি অভয় দেয় মা। ডাকে?

চোদ্দোতলার বারান্দা থেকে নীচের দিকে তাকাতেই রায়ন দেখেছিল,

BanglaBook.org

নীচের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাবা। বাবার আশেপাশে ফুলের তোড়া, অফিস বিদায়ের উপহার। দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা অমোঘ আকর্ষণ ছিল, আর একটু হলে ঝাঁপ দিয়ে ফেলত রায়ন। রেলিং ধরে সামলে নেয়। তারপর বসে পড়ে মেঝেতে।

মৃত্যু-অনুভব সবসময় খুব কাছে কাছে থাকে রায়নের। ষোলো বছরে মাকে হারানোর পর থেকেই। যে-কল্পিত দৃশ্য বাবার অফিসের রাস্তায় সে দেখেছিল, তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বাবার মৃত্যুর আশঙ্কা।

রায়নদের বাগবাজারের বাড়িতে মা ছিল সবার খুব প্রিয়। প্রতিমার মতো দেখতে ছিল মাকে। সর্বদা হাসি লেগে থাকত মুখে, প্রাণ ঢেলে সংসার করত। নিজেদের থাকা-শোওয়ার ঘর অন্যদের থেকে অনেক বেশি পরিপাটি। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা মা, ফাঁকতালে এসে আদর করে যেত রায়নকে, ক্লাস এইট-নাইনে উঠে যাওয়ার পরও। তখনই মায়ের হাসির মধ্যে লাগত বিষাদের ছোঁওয়া, সব দিক সামলাতে গিয়ে ছেলেটার হয়তো যত্ন হচ্ছে না ঠিকমতো। ভীষণভাবে বেঁচে থাকতে চাইত মা। হঠাৎই হার্টের মারাত্মক গণ্ডগোল ধরা পড়ল। অপারেশনের ধাক্কা সহ্য করতে পারল না।

মায়ের মৃতদেহ কী ভীষণ জীবন্ত লাগছিল। ম্যাটাডোরে শ্মশানে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল এই বুঝি চোখ খুলে বলবে, কী রে রায়ন, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলি? আমি তো পরখ করছিলাম তোরা কতটা দুঃখ পাস।

মায়ের চলে যাওয়ার পর থেকে আজ অবধি বুক উজাড় করে কাঁদেনি রায়ন, মনের গভীরে মায়ের মৃত্যু নিয়ে কোথাও একটা অবিশ্বাস রয়ে গেছে। ওই জ্বলজ্বলে জীয়ন্ত মূর্তির বুঝি বিনাশ নেই। ছাপ রয়ে গেছে সংসারজগতে। তাই তো মৃত্যুর কাছাকাছি গেলেই মা এসে দাঁড়ায় পাশে, একটু অস্পষ্ট, আবছা মতন। মায়ের অস্তিত্ব অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে, বাবা আর রায়নের জন্য। ফের গুছিয়ে সংসার করবে। সংসার করতে বড় ভালবাসত মা... কষ্ট হলেও টুকটাক করে হেঁটে চলেছে রায়ন। কত দূর যেতে পারবে জানে না। ঝরনা কি পাওয়া যাবে রাস্তায়? বাতাসে কান পাতে রায়ন, যদি শোনা যায় ঝরনার শব্দ।

একটু এগিয়ে থাকা দুই বন্ধুর মধ্যে বাপ্পার গলা ভেসে আসে। বুঝলি

BanglaBook.org

সুগত, তুই যেমন গাছের সবুজ দেখে বললি কাছাকাছি জল আছে, এরকম একটা আইডিয়া করতে গিয়ে আমি কিছুদিন আগে বড্ড ঠকেছি।

ঝেড়ে কাশ। বলল, সুগত।

বাপ্পা বলে যায়, মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল আমার এক আত্মীয়র বিয়েতে। দারুণ দেখতে। সাজগোজ করা কনের পাশে বসে আছে। কনেকেই ম্লান লাগছে। আমার চোখ চিপকে গেছে মেয়েটার ওপর। কেউ একজন মেয়েটাকে ডাকল, দু'পা হাঁটতেই বুঝলাম খুঁত আছে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। এক দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলাম, মেয়েটাকে আশা করাই যায়, খুঁতের কারণে আমার ক্লাসে চলে এসেছে, মায় শ্বশুরবাড়ির সাপোর্ট আজীবন পাওয়া যাবে। দেখে তো মনে হয় বেশ পয়সাওলা ঘরের মেয়ে।

আমার পছন্দের কথা বললাম পিসতুতো বোনকে। খোঁড়া বান্ধবীর বিয়ের সুযোগ এসেছে দেখে সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল, দিন ঠিক করে বসল দেখাশোনার।

গেলাম মেয়ের বাড়ি, মানিকতলায়। বিধান রায়ের আমলে গরিবদের জন্য করে দেওয়া সরকারি আবাসন। মেন্টেনান্স নেই। সামনে আরও ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে যাওয়ার দরুন আলোবাতাস ঢোকে না। মেয়ের বাবার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, দরজা-জানলায় শাড়ি কাটা পরদা। মেয়েটা যে-শাড়ি পরে সামনে এসে বসল, এতই পুরনো, ক'দিন পর দরজা-জানলায় চলে যাবে।

চুপ করে গেল বাপ্পা। একটু অপেক্ষা করে সুগত বলে, তারপর তুই কী করলি?

বাপ্পা হেঁটেই যায়। কোনও কথা বলে না। সুগত ফের বলে, কী রে, বল!

বাপ্পা উদাস কণ্ঠে বলে, টাকাপয়সা নেই অথচ মেয়েটা কী সুন্দর দেখতে। এখানকার গাছগুলোর মতন বিনা জলে সবুজ।

একটু পিছিয়ে থাকা রায়ন কৌতূহল দমন করতে না পেরে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, তারপর কী করলি, গরিব বলে ক্যানসেল করে দিলি মেয়েটাকে?

BanglaBook.org

না। খোঁড়া মেয়েটার বাড়ি থেকে আমাকেই ক্যানসেল করে দিল।

সুগত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন?

আমার মানসিক প্রতিবন্ধী বোন আছে বলে।

তিনজনেই চুপ। পায়ের আওয়াজ ছাড়া, জঙ্গলের পোকামাকড়ের শব্দ। রাস্তা ক্রমশ খাড়াই হচ্ছে। জলতেষ্টা এমনই পেয়েছে রায়নের, জঙ্গলের শোভা, বাপ্পার দুঃখ, কোনওটাই ঠিকমতো স্পর্শ করছে না। কিছুক্ষণ অন্তর মনে হচ্ছে 'আর পারব না'। আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকছে। সেই সময়টুকু চোখ বুজে হাঁটছে রায়ন। মরীচিকার মতো কানে ভেসে আসছে ঝরনার কুলুকুলু শব্দ। অনেক অজস্র ছোট ছোট ঝরনা, আর একটু পরেই... এই সময়টুকু চোখ বন্ধ করে আছে রায়ন। হঠাৎ শোনে সুগতর গলা, ওঃ, মাই গড, জল তো আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা মিছিমিছি এতক্ষণ কষ্ট করছি।

নিমেষে বুক হালকা হয়ে যায় রায়নের, ভীষণ আশায় চোখ খোলে। রুকস্যাক মাটিতে নামিয়ে ফেলেছে সুগত, চেন খুলে ব্যাগ হাঁটকাচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাপ্পা চোখ কুঁচকে সুগতকে দেখছে।

ব্যাগ থেকে সুগত যেটা বার করল, তরল বটে, পান করা যায় কিন্তু জল নয়, সেভেন ফিফটির হুইস্কির বোতল।

হাঁ হাঁ করে উঠল বাপ্পা, তোর মাথা খারাপ সুগত! জল ছাড়া ওটা খেলে, ভেতরে আগুন জ্বলে যাবে। ভস্ম হয়ে যাব আমরা।

কিছুই হবে না। বলে, বোতলের ছিপিতে মোচড় দিতে যাচ্ছিল সুগত।

বাপ্পা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেয়। বলে, তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। যদি বা কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছি, এরপর তো তাও পারব না। বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হবে।

সুগত আর কোনও জোরাজুরিতে গেল না। বলল, দাঁড়া, ব্যাগে অন্য একটা জিনিসে হাত ঠেকেছে, মনেই ছিল না ওটার কথা।

আবার কী বার করে সুগত সেটা দেখার জন্য আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে দুই বন্ধু। এই গহন, নির্জন, দুর্লঙ্ঘ পথে সুগত যেন ম্যাজিশিয়ান। ব্যাগ থেকে বেরোল একমুঠো লজেন্স। সুগত বলল, এটা দিয়ে তেষ্টা খানিকটা ঠেকানো যাবে।

BanglaBook.org

বাপ্পা, রায়ন মেনে নিল সে কথা। তিন বন্ধু লজেন্স মুখে পুরে ফের হাঁটতে লাগল। কষ্ট অনেকটাই কম লাগছে এখন, দু'পাশের প্রকৃতি সজল হয়ে উঠছে।

কিছু দূর হাঁটার পর রাস্তা ঢুকে পড়ল পুরোপুরি গভীর জঙ্গলে। চারপাশে আবছা অন্ধকার। সময়টা যে ভরদুপুর বোঝার উপায় নেই। নির্জনতা চাপ হয়ে বসছে তিনজনের ওপর। বনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত একটা শব্দ, অনেকটা ঘণ্টাধ্বনির মতো। জঙ্গলের মধ্যে যেন কোনও মন্দির আছে। তবে আওয়াজটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। এক জায়গায় থামছে তো অন্য কোথাও শুরু হচ্ছে। সুগত জানতে চায়, কীসের আওয়াজ বল তো?

পোকার। বলে, বাপ্পা।

কত বড় পোকা রে? গলায় এত জোর!

খুবই ছোট।

তুই কখনও দেখেছিস? এমনভাবে কথা বলছিস যেন আগে এ অঞ্চলে এসেছিস।

এসেছিলাম তো, এখানে নয় দার্জিলিংয়ে। পাড়া থেকে বাস ছাড়ে না, চলুন বেড়িয়ে আসি, মাত্র পাঁচশো পঞ্চাশ টাকায় দার্জিলিং। ক্লাস নাইনে উঠতে ফার্স্ট হয়েছিলাম, বাবা বলেছিল, কী চাই। ঘড়ি না দার্জিলিং? একটু থেমে বাপ্পা ফের বলে, ম্যালের পিছন দিকটায় গাছপালার মধ্যে থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছিল। প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এখানে এরকম টানা ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে? লোকাল লোককে জিজ্ঞেস করে আসল ব্যাপারটা জানলাম।

তিনজনে আবার চুপচাপ। ওদের ঘিরে ঘণ্টাধ্বনি। রাস্তা চড়াই কিছুটা কমেছে। একটু পরে রায়ন বলে ওঠে, লজেন্সটা খেয়ে ভুলই হল রে, মিষ্টি খাওয়ার পর আরও তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছে।

কথাটা শুনেও শুনল না সুগত। অন্য প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এল। আচ্ছা ধর, এখন যদি কোনও দেবদূত, না দেবদূত নয়, উর্বশী এক গ্লাস জল নিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়, গ্লাসটা অবশ্যই মণিমুক্তোখচিত হতে হবে। বলে, তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন জলটা

BanglaBook.org

খেতে পারবে। তোমরাই ঠিক করো, কে খাবে? আমরা তখন কী করব, সত্যি কথাটা বলব এখন। কী করবি রে রায়ন?

মাথা ধরে গেছে রায়নের, তেষ্টা বাড়ছে ধাপে ধাপে। কষ্ট চেপে বলে, আমার মাথায় এখন কিছুই ঢুকছে না, তোরা বল।

সুগত এবার বাপ্পাকে বলে, তুই বল, কী করতিস?

জলটা রায়নকে দিয়ে দিতাম। রায়ন মরে গেলে ওর বাবা খুবই কষ্ট পাবে। আমি মরলে বেঁচে যাব। এই অভাবের জীবন আর ভাল লাগে না।

ঢপ মারিস না। আমি প্রথমেই বলেছিলাম সত্যি কথাটা বলতে। মরতে কোনও মানুষই চায় না। আধমরা হয়ে কত মানুষ বেঁচে থাকে আমাদের দেশে।

তা হলে তুই বল কী করতিস জল পেয়ে? জিজ্ঞেস করে বাপ্পা।

সুগত বলে, আমি উর্বশীর কাছে একটা অপশন রাখতাম, জলটা আমি দুই বন্ধুর যে-কাউকে দান করে দিতে পারি, যদি জল-তেষ্টায় আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তুমি সঙ্গে থাকো।

বাপ্পা দুর্বল লাথি চালায় সুগতর উদ্দেশে, যথারীতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে বাপ্পা। সুগত মজা পেয়ে হাসছে। রায়ন অবাক হয় দুই বন্ধুর প্রাণশক্তি দেখে, মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র সমীহ করে না এরা। এদের জন্যই এত দূর বিনা জলে হেঁটে আসতে পেরেছে রায়ন।

বাপ্পা পাকাপাকিভাবে মাটিতে থেবড়ে বসে রইল। সুগত বলে, কী রে ওঠ!

দম ছেড়ে বাপ্পা বলে, এখানে একটু রেস্ট নিয়ে নিই।

বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষে খারাপ নয় জায়গাটা। রাস্তা বাঁক নিয়েছে, কিছুটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। তিন বন্ধু রাস্তার ধার ঘেঁষে বসে পড়ে। ওদের পিছনে খাদ। খোলামেলা আকাশ। রায়ন ইশারায় সুগতর কাছে কী যেন চায়। তার আর কথা বলার শক্তি নেই। সুগত প্রথমটায় ধরতে পারে না, কী চাইছে! জিজ্ঞেস করে, সিগারেট?

রায়ন অস্ফুটে বলে, লজেন্স, লজেন্স।

তিন বন্ধু ফের একটা করে লজেন্স মুখে পোরে। বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়ে তারা। আকাশের দিকে চেয়ে সুগত বলতে থাকে, আচ্ছা,

BanglaBook.org

আমরা তো মোটামুটি পারছি। এরকম লজেন্স টজেন্স খেয়ে যদি সান্দাকফু পৌঁছে যেতে পারি, রেকর্ড সৃষ্টি হয়ে যাবে। মাঝপথে জল পেলেও খাব না আমরা। অক্সিজেন সিলিন্ডার না নিয়ে যদি এভারেস্টে ওঠা যায়, আমরাও পারব জল ছাড়া সান্দাকফু ট্রেক করতে। খবরটার মধ্যে অভিনবত্ব আছে, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সবাই লুফে নেবে।

রায়ন বাপ্পা দু'জনেই বুঝতে পারছে মনের জোর বাড়ানোর জন্যই অবাস্তব কল্পনায় মেতেছে সুগত। গল্পটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাপ্পা বলে, রেকর্ড সৃষ্টি করতে গেলে একজন-দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। আমরা সত্যি বলছি কিনা কে প্রমাণ দেবে সেটা?

সুগত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। একটু পরে বলে, সত্যি মাইরি, কোনও সাক্ষী নেই। সেই মহাভারতের আমল থেকে দুর্গম পথে একটা কুকুর অন্তত সঙ্গী হয়। আমাদের সঙ্গে তাও নেই।

খানিক নীরবতার পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রায়ন বলে, কুকুররা জানে এ পথে জলের ব্যবস্থা নেই। খামোকা কেন মরতে আসবে!

সুগত এবার একটু রেগে যায়। বলে, তুই সবসময় নেগেটিভ কথা বলিস কেন রে, এস্টুটা চলে যায়।

সুগতর সমর্থনে বাপ্পাও কিছু একটা বলে ওঠে। রায়ন নিজের মতো উত্তর দেয়। আধবোজা চোখে, এক বুক তেষ্টা নিয়ে তিন বন্ধু টুকটাক কথা বলে যায়, ওরা খেয়াল করে না উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘের পাহাড় ক্রমশ আকাশ দখল নিচ্ছে।

BanglaBook.org

চার

রায়নদের থেকে দুশো অথবা আড়াইশো ফুট ওপরে বসে পৃথা দেখছে কালো মেঘের আগ্রাসন। মনে পড়ছে দিদির কথা। শ্রীরামপুরের বাড়ি থেকে গঙ্গা দেখা যেত ছোটবেলায়। এখন ফ্ল্যাটবাড়ি আড়াল করেছে। ছুটির দিন আকাশে মেঘ করলেই দিদির ছটফটানি শুরু হয়ে যেত। বারবার দৌড়ে যাচ্ছে ছাদে, ঠিক সময়মতো ডেকে নিত বোনকে। ঘন

কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, নদীর বুক ফুলে ফুলে উঠছে, অজানা কোনও উৎস থেকে অদ্ভুত নরম লাজুক আলো মেঘ আর নদীর মাঝখানে। হঠাৎই হাত তুলে দিদি বলত, ওই দ্যাখ বোন বৃষ্টি আসছে। বৃষ্টির জন্ম দেখলাম আমি।

হাজার হাজার অশ্বারোহীর মতো গঙ্গার ওপর দিয়ে ধেয়ে আসত বৃষ্টি, পৃথাদের বাড়ির ছাদে পৌঁছোতে পাঁচ-দশ মিনিট লাগিয়ে দিত। বৃষ্টি ছুটে আসার সে কী আশ্চর্য দৃশ্য! বুঁদ হয়ে যেত দুই বোন। একটু পরেই ধারাস্নান। কত রকম স্টাইলে যে ভিজত দিদি, কখনও ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ফেলে পিঠ পেতে দিত বৃষ্টিতে, জামা ফাঁক করে বৃষ্টির জল ঢুকিয়ে নিত শরীরে। হাততালি দিয়ে কখনও লাফাচ্ছে, নাচের স্কুল থেকে শেখা কিছু মুদ্রা মিশিয়ে দিত ওই আনন্দে। শ্যামলা, মিষ্টি, ঝাঁকড়া চুলের দিদিটাকে কী অপরূপ যে লাগত তখন!.... সেই দিদি আর আকাশের দিকে তাকায় না। ওর সমস্ত মনঃসংযোগ এখন ওষুধের নীল প্লাস্টিক কৌটোতে। সারাদিনে আটখানা ট্যাবলেট খায়। মা খায় চারখানা। যক্ষের ধনের মতো কৌটোটা প্রায় কোলে করে ঘোরে দিদি, নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক করে না ওষুধ খেতে। মাকেও খাওয়ায়। ওষুধ খেলে দিদি নাকি ভাল থাকে। কিন্তু এ কী ধরনের ভাল থাকা, আকাশ দেখার জন্য মুখ তোলার ইচ্ছে হয় না একবার।

এখনও শ্রীরামপুরের বাড়ির ছাদে গেলে ফ্ল্যাটবাড়ির ফাঁক দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। দিদির মতোই নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। হয়তো আর আগের মতো মেঘ ঘনায় না গঙ্গার ওপর। বৃষ্টির জন্ম হয় পৃথাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, অলক্ষ্যে।

এখানকার ফুলেফেঁপে ওঠা ঘন কালো মেঘ দেখে আপশোস হয় পৃথার, ইস্, দিদিকে যদি আনা যেত, এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে, পৃথা নিশ্চিত। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড়ে আসবে হাজার অশ্বারোহী। এই দৃশ্য দেখে দিদির মাথাটা হঠাৎ ভালও হয়ে যেতে পারত। যেমন একটা দৃশ্য দেখে খারাপ হয়ে গিয়েছিল একদিন।

ডাক্তারবাবু অবশ্য সে কথা মানতে চান না। বলেন, দিদির মাথাটা

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, পৃথারা খেয়াল করেনি। যে-দৃশ্য দিদি দেখেছে, সেটা নিশ্চয়ই ইলিউশন।

বাবাও তাই মনে করত। দিদিকে সে কথা বলার উপায় নেই, মারাত্মক ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে।

দৃশ্যটার এত নিখুঁত বর্ণনা দিত দিদি, পৃথার পক্ষে অবিশ্বাস করা কঠিন হয়ে উঠত। এখনও কেন জানি পৃথার মনে হয় দিদি যা দেখেছে, কিছু সত্যি ছিল তার মধ্যে।

ক্লাস নাইনে দিদি পাগল হয়ে যায়, ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিন বাড়ি ফেরে ভীষণ গম্ভীর হয়ে। কপাল কুঁচকে আছে, মুখে কোনও কথা নেই। মা খেতে দিল, ছুঁয়েও দেখল না। মা, পৃথা, দু'জনেই বারবার জিজ্ঞেস করল, কী রে, এত চুপচাপ কেন, পরীক্ষা ভাল হয়নি?

কোনও উত্তর নেই, গোঁজ হয়ে বসে আছে পড়ার টেবিলে। ওয়ান থেকে দিদি ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। পড়াশোনায় ভীষণ সিরিয়াস। পৃথারা ধরেই নিয়েছিল পরীক্ষা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে, তাই এত মনখারাপ। এখন ঘাঁটিয়ে লাভ নেই দিদিকে, বাবা ফিরুক, বাবাকে অবশ্যই সবকিছু বলবে দিদি।

বাবা ফিরল। দিদির কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বলল, কী হয়েছে মা, তোমার নাকি মন ভাল নেই?

বাবার বুকে ভেঙে পড়ল দিদি। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি খামচে ধরে ভীষণ আক্রোশে বলতে লাগল, আমি আর কোনওদিন স্কুলে যাব না, পড়াশোনা ছেড়ে দেব আমি।

বাবার ধৈর্য অসীম। স্কুল করে, ছোটখাটো সভা-সমিতি সেরে, নাইট স্কুল সামলে বাড়ি ফিরেছে। তবু এতটুকু বিরক্তি নেই। মা এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার পাশে। জলটুকু খেয়ে বাবা গুছিয়ে বসল বিছানায়, দিদিকে সামনে এনে বসাল। বলল, এবার খুলে বলো দিকিনি কী হয়েছে স্কুলে?

রাগ, কান্না, অভিমান মিশিয়ে দিদি যা বলল তা হচ্ছে, সেদিন পরীক্ষার পর দিদির মনে হয়েছিল যাই একবার তনিমা আন্টির সঙ্গে দেখা করে আসি। তনিমা আন্টি ক্লাস টিচার, দিদিকে খুল ভালবাসে। আজ পরীক্ষা

BanglaBook.org

শেষ হল, অনেকদিন বাদে আবার দেখা হবে।

টিচার্স রুমে আন্টিকে পাওয়া গেল না। লতিকামাসি বলল, মনে হল যেন দিদিকে নাইনের এ সেকশনের ঘরে ঢুকতে দেখলাম, সঙ্গে কাগজপত্তর ছিল, হয়তো ফাঁকায় বসে কাজ করছেন।

সেই শুনে দিদি নির্দিষ্ট ঘরে যায়। দরজা অবধি যায়নি, আধ-ভেজানো জানলা দিয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব অন্যায় দৃশ্য, সুপর্ণার মা এক বান্ডিল টাকা নিয়ে এগিয়ে ধরেছেন তনিমা আন্টির দিকে। বলছেন, ম্যাডাম, এবার আমার মেয়েটাকে দেখুন। প্রত্যেকবার তিথিই কেন ফার্স্ট হবে?

ব্যাপার দেখে দিদি হাঁ, মুখ দিয়ে কথা সরছে না, পা বসে গেছে মেঝেতে। সুপর্ণা সেকেন্ড, অথবা থার্ড হয় প্রতিবার। ওরা প্রচণ্ড বড়লোক। তা বলে এত নীচে নামতে পারে মানুষ! তবে তনিমা আন্টি কিন্তু টাকা নেননি। বলছিলেন, এ কী বলছেন আপনি! এসব হয় না এখানে। তুলে রাখুন টাকা।

সুপর্ণার মা অনুরোধ করেই যাচ্ছিল। তনিমা আন্টি গলা তোলেন, লতিকা! লতিকা একবার শুনে যাও তো।

তখনই জানলা থেকে সরে যায় দিদি। স্কুলের কাউকে কিছু বলে না। হতাশ ক্রোধে বেসামাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

বর্ণনা শেষ হতে, পৃথা, মা, বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল দিদির দিকে। মিথ্যে কথা দিদি বলে না। সব ব্যাপারেই ভীষণ সৎ। সেই কারণেই ঘটনাটা ওকে মারাত্মকভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। বাবার অনুরোধে দিদি সেদিন অল্প কিছু মুখে দেয়। ঘুরে-ফিরে একটাই কথা ক'দিন ধরে বলে যাচ্ছিল দিদি, আচ্ছা, কাকিমা তো আমাকেও বলতে পারত কথাটা। আমি না হয় পরীক্ষাটা খারাপ করে দিতাম। সুপর্ণা ফার্স্ট হলে একটুও খারাপ লাগত না আমার। উনি মেয়েকে ফার্স্ট করানোর জন্য ঘুষ দিতে গেলেন! এত নীচে নামতে পারে মানুষ!

ক্রমশ অস্থির হচ্ছিল দিদি। বাবার কেমন জানি সন্দেহ হয়, ঠিক করে তনিমা আন্টির সঙ্গে দেখা করে আসল ঘটনাটা জানবে। এমনই কাকতালীয় ব্যাপার, তনিমা আন্টির খোঁজ করতে জানা গেল, স্কুলের

BanglaBook.org

চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে গেছেন। দিদি বলতে শুরু করল, ঘুষ দিতে আসার অপমান সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আন্টি।

ঘুম খাওয়া কমে গেল দিদির। পড়ার বই তো নয়ই, গল্পের বইও ছুঁয়ে দেখছিল না। পৃথা জোর করে বই পড়াতে গেলে দিদি বলত, অক্ষরগুলোকে আমার কালো পিঁপড়ে মনে হয়, উঠে আসে গায়ে। বাবা আর দেরি করেনি, দিদিকে নিয়ে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যায়। ডাক্তারবাবু প্রথম বলেন, দিদি যা দেখেছে পুরোটাই স্বকল্পিত। দিদির রোগটাও গুরুতর, সিজোফ্রেনিয়া।

মা ভীষণ ভেঙে পড়ে। অযৌক্তিকভাবে বাবাকে দায়ী করতে থাকে, তুমি কোনওদিন বাড়িতে ঠাকুর-দেবতা ঢোকাতে দাওনি। পুজো করতে মানা করেছ আমাকে। ওপরওলা শাস্তি দিলেন।

বাবা চুপচাপ শুনে গেছে, কোনও তর্কবিতর্কে যায়নি। কিন্তু মা যখনই দিদির হাতে তাগা-তাবিজ বেঁধেছে, খুলে ফেলে দিয়েছে বাবা। বলেছে, বাইরে কুসংস্কারের সঙ্গে লড়ব আর বাড়িতে আবর্জনা জড়ো করার মতো মানুষ আমি নই। স্বীকার করছি, মেয়ে পাগল হওয়ার পিছনে আমার কিছুটা দোষ আছে।

ছোটবেলায় বাবার কথাটা ঠিক বুঝত না পৃথা। পরস্পরবিরোধী লাগত। একটু বড় হওয়ার পর বুঝতে পারে। বাবা চিরকাল সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। এলাকার মানুষ যথেষ্ট সমীহ করত। বিরোধী, এমনকী স্বগোত্রের ভিন্ন পার্টির কিছু স্বার্থান্বেষী লোক বাবাকে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। সংগঠনের সমস্ত খরচ-পত্তরের হিসাব কণ্ঠস্থ থাকত বাবার। বামফ্রন্ট সরকারের কিছু মন্ত্রীর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে কোনওদিন অন্যায্য সুবিধা পাইয়ে দেয়নি। বাবার এই সমাজ-বেমানান সততা দিদির মধ্যে গোঁড়ামি হয়ে দেখা দেয়। বাবার দোষ হয়তো সেখানেই।

কিন্তু পৃথা তো এরকম হয়নি। টুকটাক মিথ্যে, প্রয়োজনমতো সামান্য ছলনার আশ্রয় সে ছোট থেকেই নিয়েছে, তার জন্য কোনও অপরাধ বোধ হয়নি। দিদিটা যে কেন এমন হয়ে গেল!

BanglaBook.org

ডাক্তারবাবু বলেন, দিদির 'জিন'-এ এই রোগের সংকেত অনিবার্যভাবে ছিল। বাবা এবং মায়ের বংশের কারও এই রোগ ছিল কিনা জানতে চেয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। বাবা, মা দু'জনেই এক-দু'জন পূর্বপুরুষকে খুঁজে পায়, যাঁরা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাঁরা যে সিজোফ্রেনিক ছিলেন, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা তখনকার দিনে এ রোগটার নাম কেউ শোনেনি।

দিদির পড়াশোনা আর তেমন হল না। ক্লাস নাইনে দিদির শেষবার ফার্স্ট হওয়া। স্কুল যেত অনিয়মিত। খুব খারাপ রেজাল্ট করে পাশ করল মাধ্যমিক। তারপর ইতি টেনে দিল পড়াশোনায়।

দিদির এহেন পরিণতি দেখে পড়াশোনায় সিরিয়াস হয়েছিল পৃথা। মন দিয়েছিল কেরিয়ার তৈরি করার জন্য। জানত, দিদিকে আজীবন তাকেই দেখতে হবে।

বেঁচে থাকতে বাবা দিদির ওষুধের এবং মাঝেমধ্যে অ্যাসাইলামের থাকার খরচা চালিয়েছে। মারা গেল নিজের স্বল্প সঞ্চয়টুকু শেষ করে। তারপর থেকে মা দিদির ওষুধ ও পথ্যের খরচা পৃথার। সংসারের অন্যান্য খরচা চলে বাবার পেনশনের টাকায়। ওষুধের জন্য মাসে লাগে সাড়ে তিন হাজার। টোটাল চার হাজার মাইনে থেকে আলাদা করে মায়ের হাতে তুলে দেয় পৃথা। অ্যামাউন্ট না জানলেও শ্বশুর-শাশুড়ি আন্দাজ করেন বাপের বাড়িতে অনেকটা টাকাই দিয়ে দেয় পৃথা। ব্যাপারটা তাঁদের আদৌ পছন্দ নয়, হাবেভাবে সেটা বুঝিয়ে দেন। অনিমেষ অবশ্য এ বিষয়ে কোনওদিন কোনও মন্তব্য করেনি।

মুশকিল হয় দিদিকে নিয়ে। ওর আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। প্রায়ই আক্ষেপ করে, আমার জন্য তোর কতটা টাকা প্রতি মাসে চলে যাচ্ছে! শ্বশুরবাড়িতে নিশ্চয়ই রাগ করে।

পৃথাকে মিথ্যে বলতে হয়, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওরকম নন। তাঁরা খোঁজই করেন না আমার টাকা আমি কীভাবে খরচ করি। তা ছাড়া ধর, আমি যদি এ বাড়ির ছেলে হতাম, টাকা আমায় দিতেই হত। মুখে বলব ছেলে-মেয়ে সমান সমান, আর ছেলেদের ঘাড়েই শুধু চাপিয়ে দেব বাবা-মা, সংসারের দায়িত্ব, তা তো হয় না।

BanglaBook.org

দিদি বলে, সব ছেলেই কি আর পরিবারকে দেখে? তারপর বউ যদি খাওারনি হয় তো কথাই নেই। ভাগ্যিস আমার কোনও ভাই নেই। বউ এসে হয়তো আমাকে রাস্তায় বার করে দিত।— এত দূর অবধি ঠিক ছিল। তারপরই শুরু হয়ে গেল দিদির এলোমেলো কথাবার্তা, আমার আর একটা চিন্তা হয় জানিস বোন।

কী চিন্তা আবার?

আমি যেসব ওষুধ খাই, হঠাৎ যদি কোম্পানি বানানো বন্ধ করে দেয় অথবা সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়, তা হলে তো ঝামেলায় পড়ে যাব।

কোম্পানি খামোকা প্রোডাকশন বন্ধ করতে যাবে কেন?

না, আসলে চারিদিকে যা শ্রমিক অসন্তোষ, হয়তো তালা ঝুলিয়ে দিল কোম্পানির গেটে। মালিকদের কোনও বিশ্বাস আছে! দেখিসনি বাবা প্রায়ই জুট মিলে দৌড়োত

দিদির অলীক আশঙ্কা শুনে হেসে ফেলে পৃথা। বলে, সত্যি দিদি, তুই পারিস বটে আবোলতাবোল চিন্তা করতে।

দিদি হাসে না। চাপা গলায় বলে, আমি একটা বুদ্ধি বার করেছি, শুনবি?

শুনি।

আমার তো কোনওদিনই বিয়ে হবে না, মানে আমি করবও না। মা ওদিকে আমার বিয়ের জন্য কিছু গয়না তুলে রেখেছে। সেগুলো বিক্রি করে আমরা যদি বছর দুয়েকের ওষুধ কিনে রাখি, কেমন হয়। এক্সপেয়ারি ডেট অবশ্য ভাল করে দেখে নেব।

এরপর আর কথা চালানো সমীচীন মনে করে না পৃথা, প্রসঙ্গ ঘোরাতে চায়। দিদি অন্য কথায় যাবে না, ওষুধ তার প্রিয় বিষয়। টাইম ধরে ধরে নিজে খাবে, মা সময়মতো ওষুধ খাচ্ছে কিনা খোঁজ নেবে। সময় পেরিয়ে গেলে বারংবার জিজ্ঞেস করবে মাকে, ওষুধ খেয়েছ তো, খেয়েছ ওষুধ?

মা বিরক্ত হয়। পাগল পাগল লাগে। অনেকবার অনুযোগ করেছে পৃথাকে। শ্বশুরবাড়িতে থেকে পৃথা আর কতটুকু লক্ষ রাখতে পারে এ বাড়ির! এক এক সময় পৃথারও অসহ্য লাগে দিদির অসুস্থতা।

BanglaBook.org

ডাক্তারবাবুকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে পৃথা, দিদি কি কোনওদিনই সারবে না? এত ওষুধ, কাউনসিলিং ...

হতাশ্বাস নিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, আমি তো তোমার বাবাকেও বলেছি, এ রোগ সারার নয়। আজীবন চিকিৎসা করে যেতে হবে। তবে যত বয়স বাড়বে, রোগের তীব্রতা কমবে।

ডাক্তারবাবুর কথা অনুযায়ী দিদি সত্যিই অনেক শান্ত হয়ে গেছে, বাইরে থেকে খুব বড়সড় ধাক্কা এলে তবেই অস্থির হয়। দিদির আরোগ্যের জন্য পৃথা ইদানীং নিজস্ব একটা পদ্ধতি চালায়। শান্ত হয়ে দিদি যখন সামনে বসে, আশেপাশে মা থাকে না, পৃথা কড়া নাড়ে সেই ভুলে ভরা ঘরের দরজায়। যার মধ্যে ঢুকে পড়ে খিল তুলে দিয়েছে দিদি। পৃথা বলে, জানিস দিদিভাই, মারা যাওয়ার ক'দিন আগে বাবা চুপিচুপি আমায় একটা কথা বলেছিল।

কী কথা?

তনিমা আন্টির সঙ্গে অনেকদিন বাদে বাবার দেখা হয়েছিল ডালহৌসিতে। তোর দেখা সমস্ত ঘটনা বাবা তাঁকে বলে। তনিমা আন্টি তো আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কই, এমন কোনও ব্যাপার তো কখনও ঘটেনি। ভুল দেখেছে আপনার মেয়ে।

দিদি গুম মেরে যায়। খানিক পরে বলতে থাকে, সেদিন আন্টি, সুপর্ণার মা কী রঙের শাড়ি পরে ছিল আমি বলে দিতে পারি। ফাঁকা ঘরে শুধু আন্টির মাথার ওপর ফ্যানটা চলছিল। ফ্যানটা চললে কিট কিট আওয়াজ হয়। শব্দটা পর্যন্ত আমার মনে আছে। কী করে নিজেকে অবিশ্বাস করব!

তা হলে কি তুই বলতে চাস তনিমা আন্টি মিথ্যে কথা বলেছে বাবাকে?

না। বাবা হয়তো চিনতে ভুল করেছে আন্টিকে। সেটাই স্বাভাবিক। তনিমা আন্টিকে তো বাবা কোনওদিন দেখেনি। যে-মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, খুবই ভদ্র ...

ফের অন্যমনস্ক হয়ে যায় দিদি, খিল তুলে দেয় ভুল ঘরটার দরজায়।— এসব কত কথাই তো লেখা ছিল ডায়েরিটাতে। অনিমেষের

BanglaBook.org

বাবা ওগুলো পড়ে কী যে আনন্দ পাচ্ছেন, কে জানে! ডায়েরির অক্ষরগুলো উঠে এসেছে এই নির্জনতায়। ফিসফিস করে কত কথা বলছে পৃথার কানে।

ফিসফিসানি বাড়ে। গায়ে দু'-চার ফোঁটা জল পড়তেই সচকিত হয়ে পৃথা। চোখ তুলে দেখে বৃষ্টি এসে গেছে। প্রচ্ছন্ন সংগীতের মতো শব্দ চারপাশে, গাছ ও বৃষ্টির মধ্যে শুরু হয়েছে গোপন কথাবার্তা।

নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে পৃথা। অনিমেষের দিকে চোখ যায়, সে আগেই উঠে পড়েছে। হেঁটে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। পৃথাও সেই লক্ষ্যে এগোয়, ঢাকা জায়গা বলতে এখন ওটাই।

জিপের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ। মদের বোতল টোতলগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এল। নিচু হয়ে কী যেন দেখল, সম্ভবত চাকার নীচে পাথরটা ঠিকঠাক আছে কিনা বুঝে নিল। তারপর উঠল জিপের পিছনের সিটে। নেশা তার মানে তেমন হয়নি, জ্ঞান টনটনে।

বৃষ্টির সেরকম জোর নেই। অনেকটা বরফ পড়ার মতন ঝিরঝির করে পড়ছে। পৃথা পৌঁছে গেছে ড্রাইভারের সিটের কাছে। গাড়িতে উঠতে যাবে, পা থেমে যায়। দু'-তিনজন মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শব্দের উৎসসন্ধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে পৃথা বেছে নেয় সেই পাথরখণ্ডটা, যার পাশে সে বসে ছিল। ওটার আড়ালে চলে গেছে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার পথ। শব্দটা আসছে ওখান থেকেই।

একটু অপেক্ষা করতেই পৃথা দেখে, আশ্চর্য এক দৃশ্য। তিনজন চব্বিশ-পঁচিশের যুবক আকাশের দিকে হাঁ-মুখ করে হেঁটে আসছে! চাতকপাখির কথাই মনে আসে প্রথমে। ছেলেগুলো যথেষ্ট ভিজেছে, জল থেকে বাঁচার কোনও চেষ্টা নেই। বরং বৃষ্টির জল খানিকটা খেয়েও নিচ্ছে। ব্যাডলি রোমান্টিক। হয়তো অল্প বয়স বলেই।

জিপে উঠে পড়ে পৃথা। ছেলেগুলোর ব্যাপারে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, দৃশ্যটাও ছিল খুব আকর্ষণীয়। ওরা তিনজন নিশ্চয়ই হেঁটে উঠছে পাহাড়ে। পৃথা যদি ওদের বয়সে এখানে আসত, ওইভাবেই বৃষ্টি খেতে খেতে উঠত পাহাড়ে।

BanglaBook.org

ছেলেগুলোকে আর একবার দেখার জন্য পিছন দিকে তাকায় পৃথা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে তিনজন। মুখ নামিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে গাড়ির দিকে। ছেলেগুলোকে দেখে ভদ্র-সভ্যই মনে হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক, চ্যাংড়া ছেলেরা ট্রেকিংয়ের ধকল নেবে না, আমোদের উপাদানও পাবে না এই নির্জন পাহাড়ি পথে। সৌন্দর্যবোধ আর অভিযানলিপ্সা না থাকলে কেউ এত কষ্ট করে না।

ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করে নিল। তারপর এগিয়ে এল পৃথাদের জিপের দিকে।

অনিমেষ ওদের দেখে নড়েচড়ে বসেছে। ছেলেগুলোর মধ্যে একজন অনিমেষকে বলে, কী ব্যাপার দাদা, এখানে হল্ট নিলেন! আর এক কিলোমিটার এগোলেই তো চিত্রে গ্রাম।

অনিমেষ আলাপি সুরে বলে, আর বলবেন না, গাড়ি খারাপ।

একটি ছেলে পৃথার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, এই রে, কী হবে তা হলে। আপনাদের ড্রাইভার কোথায়?

মহিলা দেখে ছেলেটা উদ্বিগ্ন হয়েছে বোঝা গেল। অনিমেষ উত্তর দেয়, ড্রাইভার গেছে মানেভঞ্জনে, গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলেছে। সেই গাড়ি আবার কত দূর যাবে, কে জানে! এই রাস্তায় তো ল্যান্ডরোভার ছাড়া কিছুই চলে না। কোম্পানি প্রোডাকশন বন্ধ করে দিয়েছে সম্ভবত উনিশশো বাহান্ন সালে। আয়ারল্যান্ডের কোম্পানি। বলতে গেলে এই গাড়ি এখন মিউজিয়াম পিস।

পৃথা অবাক হয়, অনিমেষ কখন এত সব তথ্য জোগাড় করল! কথা শেষ হওয়ার পর, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে এই ভঙ্গিতে অনিমেষ ফের বলে, এ কী, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন! উঠে আসুন গাড়িতে।

এই কথাটার অপেক্ষাতেই যেন ছিল তিনজন। একে একে উঠে এল গাড়িতে।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পৃথা এখন তাকিয়ে রয়েছে সামনে। বৃষ্টিতে চারপাশ ঝাপসা। রাস্তাটা ফুট কুড়ির বেশি দেখা যাচ্ছে না। পৃথার কান রয়েছে পিছনের সিটে। অনিমেষ বলছে, ট্রেকিংয়ের পক্ষে

BanglaBook.org

সময়টা আপনারা ভাল বাছেননি। এই সময় পাহাড়ের ওয়েদার খুব খারাপ থাকে।

ওদের মধ্যে কেউ একজন বলল, তা অবশ্য ঠিক। আসলে এখন গরমের ছুটি চলছে তো, আমাদের মধ্যে এ হচ্ছে মাস্টারমশাই। আমরাও ছুটির অ্যাপলিকেশন করে পেয়ে গেলাম। একসঙ্গে ছুটি অ্যারেঞ্জ করাই তো সব থেকে ঝামেলার ব্যাপার।

আপনারা কি আগেও ট্রেকিং করেছেন? জানতে চায় অনিমেষ।

না, প্রথমবার, হয়তো এটাই শেষবার। যা কষ্ট হচ্ছে!

ছেলেগুলোর অকপট কথাবার্তা শুনে ভাল লাগে পৃথার। এতটুকু চাল মারার চেষ্টা নেই। যা ওদের বয়সে খুব একটা বেশি দেখা যায় না।

অনিমেষ বলে, ট্রেকিং এক্সপেরিয়েন্স নেই, এই ঝড়বাদলের রাস্তায় হাঁটবেন কী করে! আমাদের গাড়িটা ভাল থাকলে না হয় বলতে পারতাম, এটাতেই চলুন।

না না, গাড়িতে যাওয়া মানে আমাদের মিশন ব্রেক হওয়া। গাড়িতে আমরা কিছুতেই উঠব না। ফিরে যেতে হয় তাও ভাল।

এই কণ্ঠস্বরটি নতুন। এতক্ষণ এর গলা শোনা যায়নি। সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেটাকে দেখে পৃথা, তিনজনের মধ্যে এই ছেলেটা নজর কাড়ে আগে। ফরসা, ঝাঁকড়া চুল নেমে এসেছে কপালে, চোখে চশমা, কাটাকাটা মুখ চোখ চিবুক, অথচ সব মিলিয়ে আশ্চর্য কমনীয় ভাব।

ছেলেটি ফের বলে, বরং আমাদের একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যদি আপনি রাখেন, বড় উপকার হয়।

আরে, এত হেজিটেড করার কী আছে, বলুন না কী ব্যাপার? জানতে চায় অনিমেষ।

ছেলেটি বলে, আপনাদের স্টকে নিশ্চয়ই খাবার জল আছে, আমাদের যদি দু'ঢোঁক করে খেতে দেন বড় ভাল হয়।

ও মা, এই কথা, এ আর এমন কী মূল্যবান জিনিস। বলে, ব্যাগ খুলতে থাকে অনিমেষ।

অন্য একটি ছেলে বলে, আসলে কী হয়েছে জানেন, ছ'লিটার মিনারেল ওয়াটার আমরা ভুলে ফেলে এসেছি মানেভঞ্জনের টুরিস্ট

BanglaBook.org

লজে। এতটা রাস্তা বিনা জলে উঠে এলাম। ভাগ্যিস বৃষ্টিটা নামল, তাতেই যা একটু গলা ভিজিয়েছি।

পৃথার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, স্ট্রেঞ্জ!

সেই শুনে তিনটে ছেলেই তাকাল পৃথার দিকে। ওদের সবার মুখেই লাজুক হাসি। একটি ছেলে বলে, আর বলবেন না বউদি, এর যা অবস্থা হয়েছিল, আমরা তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

নজরকাড়া ছেলেটির উদ্দেশে কথাটি বলা হল। বিব্রত হয়ে পড়ল বেচারি।

অনিমেষ জলের বোতল বার করে ওদের দিয়েছে। বলছে, দুই নয়, চার ঢোঁক করেই খান। আমাদের স্টকে যথেষ্ট জল আছে।

তিনজনের জল খাওয়া দেখে আন্দাজ করা যায়, সত্যিই কতটা তৃষ্ণার্ত ছিল। মুখে নানা রকম তৃপ্তির আওয়াজ করছে ওরা। একজন বলল, জল এমনিতে টেস্টলেস, তেষ্টার পর খেলে মালুম পাওয়া যায় কী অসাধারণ স্বাদ!

অনিমেষ ওদের পেয়ে এখন অনেক সহজ। জিজ্ঞেস করে, আপনারা সব কোথায় থাকেন? দেখে তো এক পাড়ার ছেলে মনে হচ্ছে।

পাড়ার নয়, আমরা কলেজবেলার বন্ধু। থাকি আলাদা আলাদা জায়গায়।

কে কোথায় থাকেন?

অনিমেষের কথার পর একটি ছেলে বলে ওঠে, আপনি আমাদের 'তুমি' করে বলুন। কেমন যেন শোনাচ্ছে।

অনিমেষ হেসে ফেলে বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

ওদের মধ্যে একজন বলতে থাকে নাম, ঠিকানা। রায়ন, সুগত, বাপ্পা। তিনজনের নাম জানার পর অন্যমনস্ক হয়ে যায় পৃথা। কী হবে পরিচয় জেনে, একটু পরেই তো ছেলেগুলো হাঁটা দেবে গন্তব্যে। বুধিলাল গাড়ি না পাঠালে যাওয়াই হবে না পৃথাদের।

জিপের মাথায় ক্যানভাসের ছাদ। বৃষ্টির মৃদু শব্দ। মাটি গাছপালা ভেজা অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। এখানকার মাটির গ অন্য রকম। নিথর গাড়িটা এমনিই ভিজছে, পেট্রল গন্ধের স্মৃতি

BanglaBook.org

নেই। হয়তো এই জিপটা কোনওদিনই ফেরত নিতে আসবে না বুধিলাল। উনিশশো বাহান্নর আগে তৈরি আয়ারল্যান্ডের জিপটা প্রকৃতির নির্জনতায় দাঁড়িয়ে ফসিল হয়ে যাবে।

বউদি, আপনি যদি পারমিশন দেন আমরা সিগারেট খেতে পারি, বড্ড ঠান্ডা লাগছে। ছেলেগুলোর মধ্যে একজন বলে।

মুখ না ঘুরিয়ে পৃথা অনুমতি দেয়, খান। কোনও অসুবিধে হবে না।

অনিমেষ একধাপ এগিয়ে বলে, তোমরা যদি ঠান্ডা কাটাতে হার্ড ড্রিঙ্ক চাও, দিতে পারি।

না না, ওসব খেলে এখন হাঁটতে পারব না। বলে ওঠে ওদের মধ্যে কেউ একজন। বাকিরা নীরব থেকে সমর্থন জানায়। মনে মনে আশ্বস্ত হয় পৃথা, ছেলেগুলো সম্বন্ধে তার ধারণা সঠিক। এরা ওঁচা টাইপের নয়।

চারজনেই বোধহয় সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে জিপ। পৃথার বেশ অসুবিধে হচ্ছে, বৃষ্টির গন্ধটাও আর পাচ্ছে না। একটু আগেই সে সিগারেট খাওয়ার পারমিশন দিয়েছে, এখন কিছু বললে খারাপ দেখাবে।

জিপের উইন্ড স্ক্রিন পুরোপুরি ঝাপসা হয়ে গেছে। বাঁদিকে তাকায় পৃথা, বৃষ্টির ঘনত্ব কমেছে, আর একটু ধরলেই সে নেমে যাবে। তার মন পড়ে রয়েছে নীল ফুলগুলোর ওপর। একটু আগে যে ফুলগুলোর পাশে বসে ছিল সে। বৃষ্টির ভারে এগুলো নুয়ে যায়নি তো?

আপনাদের গাড়ির আওয়াজ আমি পেয়েছি, এদের বললাম বিশ্বাস করল না। পিছনের একটি ছেলে অনিমেষকে কথাটা বলল।

উত্তরে অনিমেষ বলতে লাগল জিপটা কতবার কীভাবে তাদের ভুগিয়েছে। ছেলেগুলোকে পেয়ে প্রচুর কথা বলছে অনিমেষ, এই দু'দিনে অনেক কথা জমা হয়ে গিয়েছিল। পৃথা ওদের গল্পে যোগ দিতে পারছে না, ছেলেগুলো নির্ঘাত তাকে- অনিমেষকে অহংকারী ভাবছে। ওরা জানবেই না প্রবলেমটা ওদের নিয়ে নয়, খোদ অনিমেষকে নিয়ে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। চারপাশে আলো ঝলমল করে উঠেছে। গাড়ি থেকে নেমে আসে পৃথা। সোজা চলে যায় পাথরখণ্ডের কাছে। ও মা, এ কী! বৃষ্টিতে ভিজে ফুলগুলো আরও উজ্জ্বল হয়েছে,

BanglaBook.org

ছোট্ট শরীরে কী করে সয়েছে এত বৃষ্টির ধকল? ফুলগুলোর নাম জানতে পারলে ভাল হত।

পিছন না ফিরে পৃথা টের পায় অনিমেষরা নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। একটা ছেলে বলছে, চলুন দাদা, আমাদের সঙ্গে চিত্রে অবধি যাবেন। ওখানে চা-টা পাওয়া যাবে, খেতে খেতে আপনাদের গাড়ি চলে আসবে।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অনিমেষ কী সিদ্ধান্ত নেয় জানার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় পৃথা। অনিমেষ বলছে, সেটা একটু ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। গাড়ি এসে যদি এখানে আমাদের না পায়, ভাবতে পারে, ঘুর পথে আমরা নীচে নেমে গেছি অথবা অন্য কোনও ট্যুরিস্ট বুকিং গাড়িতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছি।

একবার নিশ্চয়ই সামনের গ্রামে গিয়ে দেখবে। এটা বলে আর একটি ছেলে।

অনিমেষ বলে, ইট ডিপেন্ডস, ড্রাইভারটির বুদ্ধি কেমন। তার থেকে যেমন আছি তেমনই ভাল।

কিন্তু এরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে থাকবেন, আশপাশে দোকানপাট কিচ্ছু নেই। গাড়ি ধরুন যদি না আসে।

আসবে। এখানকার মানুষের কথার দাম আছে। বলে অনিমেষ।

ছেলে তিনটে কথা খুঁজছে। শরীরী ভাষা দেখে বোঝা যাচ্ছে, পৃথাদের এভাবে ফেলে রেখে যেতে ওদের খারাপ লাগছে। সত্যি, এই নিরালা প্রকৃতির কী আশ্চর্য ক্ষমতা, ঘণ্টাখানেক আগে পৃথাদের চিনতই না ছেলেগুলো, এখন কেমন উদ্বিগ্ন হচ্ছে।

অনিমেষ বলে ওঠে, তোমরা একটা কাজ করতে পারো, পৃথার হাঁটার ইচ্ছে ছিলই, ওকে নিয়ে চিত্রে অবধি যাও। ওখানে রেস্ট নিক, আমি গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাব।

কথা শেষ করে পৃথার দিকে ফিরে অনিমেষ বলে, তোমার কী মত?

প্ল্যান শুনে খুশিই হয়েছে পৃথা। অনিমেষদের দিকে হেঁটে আসতে আসতে বলে, আমার কোনও আপত্তি নেই।

চশমা পরা ছেলেটি বেঁকে বসে। বলে, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না দাদা। আপনি এখানে বসে থাকবেন গাড়ির অপেক্ষায়, বউদি সামনের

BanglaBook.org

হল্টে ওয়েট করবেন আপনার জন্য, আমাদেরও অস্বস্তি হবে বউদিকে একা ফেলে যেতে।

সবাই চুপ। ছেলেটির যুক্তি অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। ওদের দলটা কেন পৃথাদের ঝামেলা ঘাড়ে করে বেড়াবে? অনিমেষ বলে, তা হলে আর কী। তোমরা এগোও, রাস্তায় দেখা হবে নিশ্চয়ই।

ওরা তিনজন পৃথাদের হাত নেড়ে এগিয়ে যায়। চশমা পরা ছেলেটার ওপর ভীষণ রাগ হয়ে যায় পৃথার, কী অনায়াস-উপেক্ষা করে চলে গেল। পৃথা ওদের থেকে বছর পাঁচ-ছয়েকের বড় বলে? অন্য প্রজন্মের ... খুবই সূক্ষ্মভাবে হলেও, এই ঘটনায় জিতে গেল অনিমেষ। বিষণ্ন অভিমানে রাস্তা ক্রস করে পৃথা। এদিকটায় গভীর খাদ, পুরোটাই জঙ্গলে ভরতি। অচেনা পাখির ডাক ভেসে আসে ওপরে। হঠাৎ হঠাৎ একটা-দুটো পাখি বর্ণিল ডানা মেলে এ ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে উড়ে যায়। পাখির পিঠ দেখে পৃথা। বৃষ্টি ধোওয়া গাছপালা কী মনোরম সবুজ! পৃথার অভিমান ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হতে থাকে।

পাঁচ

তিন বন্ধু চিত্রে গ্রামে এসে পৌঁছেছে। গ্রাম বললে বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। চোখে পড়ছে সাকুল্যে পাঁচটা চালার বাড়ি, একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে তিনজন। বিশাল সেরামিক মগে অনেকটা চা, টেস্ট দারুণ। সুগত অবশ্য একটু টেনশনে আছে। বেড়াতে গেলে খরচাপাতির ব্যাপারটা সে দ্যাখে। এই দোকানে এসে প্রথমেই তিন বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনেছে, গ্রাম প্লেন ল্যান্ডের তুলনায় জাস্ট ডবল। এতটা চায়ের জন্য কতটা গলা কাটবে বোঝা যাচ্ছে না।

চায়ের মগ হাতে বাপ্পা মাঝেমধ্যেই ফেলে আসা রাস্তা দেখছে। সুগত বিরক্ত হয়ে বলে, কী দেখছিস বল তো, তখন থেকে!

রায়ন শিরদাঁড়া সোজা করে পাহাড় দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিল। বলে ওঠে, দেখছে, অনিমেষবাবুরা আসছে কিনা।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, দেখছিই তো। বলে ঝাঁঝিয়ে ওঠে বাপ্পা। হিসেব কষা ভুলে সুগত খিকখিক করে হাসে, রাগ ধরে রেখে বাপ্পা রায়নকে বলে, আমি তো তোর মতো বেরসিক নই। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত, বউদি যদি আমাদের সঙ্গে এইটুকু হেঁটে আসত।

অসুবিধেটা বোঝার ক্ষমতা তুই হারিয়েছিস। বেশ কয়েক ঘণ্টা কোনও মেয়ে দেখিসনি তো। সামনের ক'টা দিন দেখতে পাবি কিনা তারও কোনও ঠিক নেই। তাই একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিস।

জ্যাঠামি করিস না তো, অসুবিধেটা কী, বুঝিয়ে বল আমাকে। তখন যে যুক্তিটা তুই দিয়েছিলি, খুবই পলকা। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতই। অনিমেষদা ঠিকই বলেছিল, এখানকার লোক খুবই বিশ্বস্ত। সেটা তুইও জানিস। গাড়ি নিয়ে এসে ড্রাইভার সামনের দু'-তিন কিলোমিটার খুঁজে দেখতই তার ট্যুরিস্ট পার্টিকে।

রায়ন কোনও উত্তর দেয় না। চুপচাপ চা খেতে থাকে। সুগত এবার কৌতূহলী হয়। রায়নকে বলে, বাপ্পা কিন্তু ভুল কিছু বলছে না। তুই তখন এত জোর দিয়ে ভুল যুক্তি দিলি, আমিও কেমন কনভিন্স হয়ে গেলাম! আসল ব্যাপারটা বল তো, কেন অ্যাভয়েড করলি বউদিকে?

চায়ের মগ রেখে সিগারেট ধরায় রায়ন। আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে নেই। বাপ্পার ক্ষোভ এখনও কমেনি। বলে ওঠে, মেয়েদের ব্যাপারে ওর নানা রকম কমপ্লেক্স আছে। কিন্তু সেটা তো পার্সোনাল ম্যাটার, আমরা কেন...

কথা শেষ হওয়ার আগে রায়ন বলে ওঠে, আর ইউ শিয়োর, ওই মহিলা অনিমেষদার স্ত্রী?

তার মানে, কী বলছিস তুই! ভীষণ অবাক হয়ে বলে ওঠে সুগত। ভাঁজ পড়েছে বাপ্পার কপালেও।

মাথা নিচু করে সিগারেট টানতে টানতে রায়ন বলে, ভদ্রমহিলার সিঁথিতে ছিটেফোঁটা সিঁদুর ছিল না।

তাতে কী হয়েছে, সিঁদুর আজকাল অনেক মেয়েই পরে না। বলে বাপ্পা।

রায়ন বলে, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোথাও একটা

BanglaBook.org

মিলমিশের অভাব টের পাচ্ছিলি না? অনিমেষদা মহিলার সঙ্গে প্রায় কথাই বলছিলেন না। মহিলাও আমাদের আড্ডা থেকে দূরে থাকছিলেন। কেবল যখন কথা হল আমাদের সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার, তখনই একটু ইন্টারেস্ট দেখালেন।

সবই তো বুঝলাম, গোটা বিষয়টা তা হলে কী দাঁড়াল? অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চায় সুগত।

রায়ন বলে, যেটা বোঝা যাচ্ছে, অনিমেষদার উপস্থিতিতে মহিলা আমাদের সামনে ফ্রি হতে পারছেন না। অনিমেষদাকে ছাড়া আমাদের সঙ্গে হেঁটে যেতে রাজি। অর্থাৎ কোথাও কোনও গণ্ডগোল আছে। আমি সেই কারণে ওঁকে এড়িয়ে গেছি।

তোর কী মনে হয়, অনিমেষদার সঙ্গে মহিলার কোনও অবৈধ সম্পর্ক আছে? লুকিয়ে বেড়াতে এসেছে ওরা? প্রশ্ন করে বাপ্পা।

রায়ন বলে, সম্পর্কের অবৈধ কিছু হয় বলে আমি মনে করি না। তবে ওঁদের দু'জনের রিলেশন যে ভাল নয় সেটা বুঝে গেছি।

বাপ্পা সুগতর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে রায়নের বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট হয়েছে তারা। নামিয়ে রাখা রুকস্যাক কাঁধে নিতে নিতে বাপ্পা বলে, চ, তা হলে এগোনো যাক। খামোকা মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

সুগত বলে, দাঁড়া, চায়ের দামটা মেটাই।

চিত্রে ছেড়ে মিনিট দশেক হাঁটা হয়ে গেল। এখন আবহাওয়া বেশ ভাল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ঘন নীল আকাশ। রাস্তার ডানপাশে পাহাড়, বাঁপাশে জঙ্গল। বেশ লম্বা লম্বা গাছ। ডালপালার ছায়া নিয়ে রোদ এসে পড়েছে পথে। দারুণ ডিজাইন হয়েছে। টানা তাকিয়ে থাকলে, মাথা যেন একটু টাল খায়। দৃষ্টি সরিয়ে রায়ন গাছপালার দিকে তাকায়, গাছগুলো বেশ পুরনো। রাশভারী অভিভাবকের মতো কত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এত নির্জন সুন্দর রাস্তায় কখনও হাঁটেনি রায়ন। এমনকী স্বপ্নেও নয়। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন মাথায় আসে, তক্ষুনি উত্তর না খুঁজে দুই বন্ধুর উদ্দেশে প্রশ্নটা রাখে, আচ্ছা, তোরা স্বপ্নে এমন কোনও জায়গা দেখেছিস, যা বাস্তবে কখনও দেখিসনি?

BanglaBook.org

বহুবার দেখেছি। বলে সুগত।

যেমন? জানতে চায় রায়ন।

সুগত বলে, ম্যাকানাস গোল্ডের পাহাড়ে গেছি অনেকবার।

সে তো তুই সিনেমাটা দেখেছিস বলে। মাথায় রয়ে গেছে ছবিটা। এমন কিছু বল, যা তোর অভিজ্ঞতায় ছিল না।

চুপ করে যায় সুগত। ভাবতে থাকে। বাপ্পা বলে, কল্পনা চলবে?

কী রকম? আগ্রহী হয় রায়ন।

বাপ্পা বলতে থাকে, আমি পলাশির মাঠ, মানে যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, কোনওদিন যাইনি, স্বপ্নে প্রায়ই দেখি।

সুগত খোঁচা মারে, তুই আর জায়গা পেলি না, মেবার, কলিঙ্গ, চিতোর ছেড়ে পলাশি! স্বপ্নেও কিপটেমি।

না রে, তা নয়। আমাদের বাংলার নরমসরম প্রাকৃতিক পরিবেশে যুদ্ধুটুদ্ধু ঠিক মানায় না। যতবারই কল্পনা করি বিশাল সবুজ আমবাগানে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছিল, কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। বেশ কয়েকবার স্বপ্নে আমি চলে গেছি মুর্শিদাবাদে, সিরাজ, মিরজাফর, আমিরচন্দ, জগৎ শেঠদের বোঝাচ্ছি, ক্লাইভ কী সাংঘাতিক চতুর লোক। তোমরা মরবে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মিটিয়ে নাও

বাপ্পার কথা শুনে হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়েছে সুগত। রায়নও হাসছে। বাপ্পা বলে যায়, দ্যাখ, আমি তো ওইসব মানুষদের দেখিনি, মুর্শিদাবাদে যাইনি কখনও, স্বপ্ন দেখি পুরো সিনেমার মতো।

রায়ন বলে, ওটা আসলে তোর ইতিহাসপ্রীতির ফল। বই পড়ে কল্পনা করে নিয়েছিস সময়টাকে। যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। স্বপ্নের মতো কল্পনাও অভিজ্ঞতানির্ভর। যার যত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বেশি, স্বপ্ন এবং কল্পনা সমৃদ্ধ। এখন যে রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, চেতনায় ছাপ রয়ে যাচ্ছে। পরে কখনও সুইজারল্যান্ডের স্বপ্ন দেখলে এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাব। আর সুইজারল্যান্ড ধার করব কোনও সিনেমা অথবা ছবির বই থেকে।

গুরু, আলোচনাটা একটু ভারী হয়ে যাচ্ছে না, এসব ঠান্ডা ঘরে বসে

BanglaBook.org

ভাল লাগে, পাথর ফেলা রাস্তায় ট্রেক করতে করতে নয়। ব্যাজার মুখে বলে সুগত।

রাস্তার কষ্টটা হালকা করতেই তোদের ভারী আলোচনায় ব্যস্ত রাখছি। চটজলদি উত্তর দেয় রায়ন।

বাপ্পা বলে, না না, তুই চালিয়ে যা। ভালই লাগছে। পদ্ধতিটা মন্দ নয়।

নতুন উদ্যমে শুরু করে রায়ন, আচ্ছা দ্যাখ, আমরা তো রডোডেনড্রন সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি, অপরূপ বর্ণনা! ছবিও দেখেছি গাছটার, লাল থোকা থোকা ফুল। এখন ফুলের সময় নয়। গাছটা এই জঙ্গলেই মিশে আছে, চিনিয়ে দিতে পারবি?

সুগত বাপ্পার পা থেমে যায়। জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে খুঁজতে থাকে রডোডেনড্রন। পায় না।

সুগত রায়নের উদ্দেশে বলে, তুই হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা তুললি কেন?

এমনি। একবার যাচাই করে নিলাম আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনার দৌড় কতটা।

কী বুঝলি? প্রশ্ন করে বাপ্পা।

অবাধ স্বপ্নচারী হওয়ার ক্ষমতা কোনও মানুষেরই নেই, অভিজ্ঞতা থেকে ধার নিতে হবে। যারা মনে করে আমি খুব কল্পনাপ্রবণ, স্বপ্নের জগতে থাকতে ভালবাসি, আখেরে অভিজ্ঞতার বেড়াজালে আটকে থাকে তারা।

সুগত বাপ্পা দু'জনেই গুম মেরে যায়। কিছুক্ষণ বাদে বাপ্পা বলে ওঠে, আচ্ছা রায়ন, তোকে একটা কথা বলি?

বল।

তোর এইসব ইন্টেলেকচুয়াল কথাবার্তা আমাদের কি না বললেই নয়? ভাল করেই জানিস আমরা কীরকম সাধারণ ঘরের মাঝারি মানের বুদ্ধির ছেলে। তোর ওই আঁতেল মার্কা ভাবনাচিন্তা নিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেশ না। আমাদের ওপর ওস্তাদি মারতে আসিস কেন?

বাপ্পার কথা যেন শোনেইনি এমনভাবে হেঁটে যাচ্ছে রায়ন। সুগত চলে যায় ওর পাশে। হাঁটায় তাল মিলিয়ে জিজ্ঞেস করে, বল না রে রায়ন, হঠাৎ এরকম দার্শনিক প্রসঙ্গ কেন তুললি?

BanglaBook.org

মাথা নিচু রেখে হাঁটতে হাঁটতে রায়ন বলে, অনিমেষদার সঙ্গে সিঁদুরবিহীন ভদ্রমহিলা অনেকটা অফ সিজিনের রডোডেনড্রনের মতোই। আমরা ওঁকে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি না। সিঁদুর হচ্ছে গাছটার লাল ফুল। ওটা থাকলেই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারতাম।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে সুগত, প্রসঙ্গটা এভাবে সমে এসে মিলবে ভাবতেও পারেনি। হতচকিত ভাব কাটিয়ে সুগত বলে ওঠে, গুরু, তোর পায়ের ধুলো দিয়ে রাখ মাইরি। শালা, বিখ্যাত তুই হবিই, নাগাল পাব না।

কী হয়েছে রে, কী হল? আমাকে বল। বলে এগিয়ে আসে বাপ্পা। সুগত ওকে রায়নের বিস্ময়কর বিশ্লেষণের কথা বলে।

বাপ্পা ততটা প্রভাবিত হয় না। তাচ্ছিল্যের স্বরে রায়নকে বলে, তোর দেখছি আমার থেকেও অবস্থা খারাপ। বউদিকে ভুলতেই পারছিস না।

কথা গায়ে মাখে না রায়ন। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলে, আমাদের এর পরের হল্ট কোথায় রে?

মেঘমা। বলে সুগত।

দারুণ নাম! জায়গাটাও নিশ্চয়ই সুন্দর হবে।

রায়নের কথার পিঠে সুগত বলে, সুন্দর হলেও উপভোগ করার মতো পরিস্থিতি থাকবে কি আমাদের? একটু আগে মাইলস্টোন দেখলি? এখনও আট কিলোমিটার হাঁটলে মেঘমা।

বাপ রে, ততক্ষণে তো আমাদের অবস্থা ঝরঝরে হয়ে যাবে। যা রাস্তা দেখছি, খাড়াই হয়েই যাচ্ছে, উতরাইয়ের কোনও সিন নেই। বলে রায়ন।

বাপ্পা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, ঠোঁটে আঙুল রেখে বলে, চুপ চুপ।

বাতাসে কান পেতেছে বাপ্পা, দেখাদেখি রায়ন সুগত বাতাস থেকে কিছু শোনার চেষ্টা করে। পাখির ডাক এখানে অনর্গল শোনা যায়। জঙ্গলে ঘণ্টার আওয়াজ এখন নেই। বাপ্পা কী শুনতে চাইছে বোঝা যাচ্ছে না। সুগত ঠাট্টা মিশিয়ে বলে, কী রে, ফের আলতাপরির ডাক শুনলি নাকি?

আলতাপরি নয়, জিপগাড়ি।

BanglaBook.org

বাপ্পার কথার পরই রায়ন সুগতর কানে ধরা দেয় গাড়ির শব্দ। অনেকটা গোঙানির মতো। ১৯৫২-র আগের গাড়ি, বয়স হয়েছে, এতটা চড়াই উঠতে কষ্ট তো হবেই।

সুগত বলে, মনে হচ্ছে বউদিরা আসছে।

রায়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তোরা বউদি বলাটা একটু ছাড় তো! মহিলার বিয়ে হয়েছে কিনা, এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সিঁদুর থাকলে তুই শিয়োর হয়ে যেতিস? জিজ্ঞেস করে বাপ্পা। একটু থেমে বলে, এই যে ডায়মন্ড হারবার দিঘাটিঘায় একদিনের জন্য সিঁদুর পরিয়ে মেয়েদের হোটেলে তোলে ছেলেরা, সবাই তা হলে বিবাহিত?

রায়ন অন্য কথায় নিয়ে যায় বাপ্পাকে। বলে, আমরা তো হাঁটছি গাড়ির রাস্তা ধরে। তুই যে বলেছিলি ট্রেকার্সদের শর্টকাটের জন্য সাইন দিয়ে আলাদা রাস্তা করে দেওয়া আছে। সেসব কোথায় গেল?

ছিল তো রাস্তা, দেখিসনি? মেন রাস্তা বাইফার্কেট হয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে, ফের ঘুরে এসে মিশেছে।

রায়নের মনে পড়ে এরকম দু'-তিনটে শাখা রাস্তা বনের ভেতর ঢুকে যেতে দেখেছে সে। ভেবেছিল লোকাল লোকের পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া রাস্তা। বাপ্পাকে বলে, ওই রাস্তা ধরলি না কেন?

বিনা গাইডে যাওয়া ঠিক হত না। রাস্তা গুলিয়ে গেলে মুশকিলে পড়তাম। তার থেকে গাড়ির রাস্তাই সেফ।

সামনে কোনও ট্রেকার্স রুট এলে বলবি, এবার ওই রাস্তা দিয়েই যাব, বলে রায়ন।

কেন? জানতে চায় সুগত।

প্রথমত, কষ্ট কম হবে, সেকেন্ডলি এড়ানো যাবে অনিমেষদাদের।

এড়াতে চাইছিস কেন? পরের প্রশ্ন বাপ্পার।

ওরা ফালতু আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। মহিলা অনিমেষদার কে হয় না হয়, যত সব বাজে ভাবনা...

মাঝপথে কথা থামিয়ে দেয় রায়ন। তিনজনেই চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। খাড়াই রাস্তা বাঁক নিচ্ছে বড্ড তাড়াতাড়ি। ভ্রমরগুঞ্জনের মতো গাড়ির আওয়াজ উঠে আসছে ওপরে।

BanglaBook.org

একটা সময় রাস্তা খানিকটা সমতল হল। তিনজনের মুখচোখের অবস্থা বেশ খারাপ। চড়াইটা উঠতে কষ্ট হয়েছে বেশ। সুগত ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে গলায় ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে বোতলটা ছিনিয়ে নেয় রায়ন, তারপর বাপ্পা। তিনজনের জল খাওয়ার পর সুগত বলে, ভালই কষ্ট হচ্ছে রে। আমি শালা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাজ করি, আমারই দম বেরিয়ে যাচ্ছে। তোরা কী করে পারছিস, কে জানে!

বাপ্পা বলে, এখানে একটু রেস্ট নেওয়া যাক। একটানা অনেকটা হেঁটেছি।

রায়নের সম্মতি নেই। বলে, চল না, আর কিছুটা হেঁটে টেকার্সদের আলাদা রাস্তা পাই কিনা দেখি। আমরা বোধহয় বোকার মতো বেশি পরিশ্রম করে মরছি।

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে কথা বলছে, এর ফাঁকে দূর থেকে ধেয়ে এল নরম, তাজা, দমকা বাতাস। অজান্তেই চাঙ্গা হয়ে উঠল তিনজন। বসার কথা না ভেবে ফের হাঁটতে লাগল।

ছয়

পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছে পৃথাদের জিপ। গতি খুবই কম। ঘণ্টায় কত কিলোমিটার, আন্দাজ করতে পারছে না পৃথা। এই জিপটার স্পিডমিটারের কাঁটা শুয়ে আছে জিরোর ঘরে।

বোল্ডার ফেলা রাস্তাটা এখন যেন বড্ড বেশি এবড়োখেবড়ো। গাড়িটা কখনওই স্মুদ্‌লি গড়াতে পারছে না। ছোট্ট ছোট্ট লাফ আর হ্যাঁচকা টানে এগিয়ে চলেছে। যা ঝাঁকুনি হচ্ছে, এর থেকে হেঁটে যাওয়া অনেক ভাল ছিল।— হাঁটার প্রসঙ্গ মাথায় আসতেই মনে পড়ে গেল ছেলে তিনটের কথা। কীরকম দিব্যি গল্প করতে করতে নির্জন পথ মাড়িয়ে চলেছে, কেন নিল না ওরা আমাকে! ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে পায়ে পায়ে পৌঁছে যেতাম এই পাহাড়ের সব থেকে ওপরে, যেখান থেকে দেখা যায় গম্ভীর, অচঞ্চল অনেক তুষারশৃঙ্গ। রোজ সকাল বিকেল ওদের শরীরে রং

BanglaBook.org

ছেটান সূর্য, অনাবিষ্কৃত অদ্ভুত সব রং। অলৌকিক হোলিখেলা চলে প্রকৃতিতে। তুষারশৃঙ্গের নিমগ্নতা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। ভীষণ মন খারাপের সময় পৃথার এক ধরনের রোমান্টিক মৃত্যুভাবনা জাগে। তার খুব ইচ্ছে, অনন্যসুন্দর কোনও নিসর্গ শোভা অবলোকনের পর সে আত্মহত্যা করবে। সোনাদার সান্দাকফু বর্ণনা আজও স্বপ্নের মতো লেগে আছে চোখে, তার পাশে দাঁড়িয়েছে বিষাদকবলিত আত্মহনন ইচ্ছা। তার যাবতীয় প্রস্তুতি পৃথার সঙ্গে সবসময় থাকে। এতদিন পর স্বপ্ন-নিসর্গের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে পৃথা, অনিমেষ তার বাধ্যত সঙ্গী। নিজের আনন্দ ওর সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না। তার থেকে ওই তিন যুবক অনেক ভাল। ছেলেগুলো ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত। ওইটুকু সময়ের মধ্যে পৃথা দেখে নিয়েছে ওদের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে লোভ উঁকি মারে না। পৃথা ছেলেদের চোখ খুব ভাল পড়তে পারে। প্রফেসারি করতে গিয়ে ক্ষমতাটা আরও বেড়েছে। দিদি ছিল ছোট থেকেই ভোলাভালা। একবার হয়েছিল কী দোলের সময়, দিদি বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ক্লাস সেভেন তখন দিদির। একদল ছেলে হাওয়ায় আবির ওড়াতে ওড়াতে হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। পৃথা ভীষণ ভিতু, দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে, দিদি রে, পালিয়ে আয়, ছেলেগুলো এক্ষুনি তোকে রং মাখাবে।

কে শোনে কার কথা! দিদি তখন ছেলেগুলোর আবির ওড়ানো দেখতে মশগুল। পৃথা যা ভেবেছিল তাই, দলটা থেকে একটা ছেলে এগিয়ে এল দিদির সামনে। এখনকার সময় হলে অবশ্য পুরো দলটাই এগিয়ে আসত। সেই সময় মফস্‌সলের বাতাসে লালসার বিষ এতটা ছড়ায়নি। তো যাই হোক সাহসী ছেলেটি এসে দিদিকে কী যেন বলল, সঙ্গেসঙ্গে ছেলেটার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল দিদি, 'ঠিক আছে আবির দাও' ভঙ্গি।

BanglaBook.org

ছেলেটা ভদ্রভাবেই দিদির মাথায় আবির মাখিয়ে দিল। দোতলার জানলায় সিঁটিয়ে আছে পৃথা, সবে যখন পৃথা মনে মনে নিশ্চিন্ত হচ্ছে ছেলেটা ভাল, কোনও দুরভিসন্ধি নেই, আচমকাই দিদিকে জড়িয়ে ধরল ছেলেটা। ঝটাপটির মধ্যে কী যে হল বোঝা গেল না। একটু পরেই পৃথা

দেখে, দিদি খামচে ধরেছে ছেলেটার পাঞ্জাবির কলার। পালানোর চেষ্টা করছে ছেলেটা, পেরে উঠছে না দিদির সঙ্গে। বাকি ছেলেগুলো বন্ধুকে বাঁচাতে এল, দিদির রণচণ্ডী মূর্তি দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে হিঁচড়ে টেনে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসতে চাইছে দিদি, ঘাবড়ে গিয়ে মন ও শরীরের জোর দুটোই হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটা। পাকাপোক্ত অপরাধী তো নয়।

বাবা এসে যাওয়ায় ছেলেটা রেহাই পেল। বাবা দিদিকে বোঝাল, তুই ওকে ছাড় সব শুনছি।

যেই না দিদি কলারটা ছেড়েছে, ছেলেটা চোঁ-চাঁ দৌড়। বাবা দিদিকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করল না, আন্দাজ করেছিল কী ঘটেছে। সেটা নিয়ে দিদির সঙ্গে আলোচনা করতে সংকোচ হয়েছিল বাবার।

দিদি পরে সমস্ত ঘটনাই খুলে বলে পৃথাকে, ছেলেটা এসে দিদিকে প্রথমে ভদ্রভাবে বলেছিল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে শুধু মাথায় একটু আবির দেব।

বিশ্বাস করে মাথা পেতে দিয়েছিল দিদি, বিশ্বাস ভঙ্গ করে ছেলেটা। সহ্য হয়নি দিদির। দিদির বিশ্বাসের মধ্যে কখনও সংশয় থাকত না। পৃথা ঠিক উলটো। সহজে কাউকে বিশ্বাস করত না। বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে মেলামেশাটা ছিল ওপর ওপর, যদিও তারা টের পেত না। বাড়ির বাইরে একজনকেই খানিকটা বিশ্বস্ত মনে হয়েছিল তার, সেখানেও ঠকে গেল। অনিমেষকে কখনওই প্রেম নিবেদন করেনি পৃথা, সত্যি বলতে কী, প্রেম ব্যাপারটা আজও তার কাছে ধোঁয়াশার মতন। অনিমেষকে তার ভাল লাগত, কারণ ওর খোলামেলা সংস্কারহীন মন, সহজ জীবনযাপন, আর্ত মানুষের প্রতি সর্বদা সহানুভূতিশীল— কোথায় যেন বাচ্চার সঙ্গে মিল পেত পৃথা। দ্বিতীয় পর্যায়ের যোগাযোগের তিন বছর পর অনিমেষ যেদিন বলল, আমার বাবা-মা তোমায় দেখতে চেয়েছেন, পৃথা মুখের ওপর 'যাব না' বলে দেয়নি। হাসিতে বিস্ময় মিশিয়ে জানতে চেয়েছিল, হঠাৎ আমাকে দেখতে চাইলেন কেন?

এমনি। আমি প্রায়ই তোমার কথা বাড়িতে বলি, তোমাদের বাড়িতে

BanglaBook.org

যাতায়াত আছে আমার, বাবা-মা জানে। বলছিল, মেয়েটাকে একদিন নিয়ে আয় না দেখব।

এটা যে পাত্রী দেখারই নামান্তর বোঝার মতো বুদ্ধি পৃথার আছে। অনিমেষের বাড়িতে যেতে রাজি হয়েছিল দুটো কারণে, এক, পাত্রীকে পছন্দ না-ও হতে পারে অনিমেষের বাবা-মার। দুই, অনিমেষের সঙ্গে এতদিন ধরে মিশছে, ওর পারিবারিক পরিবেশটা কেমন, জানার কৌতূহল হয়েছিল। অনিমেষের বাড়িটা নিশ্চয়ই পৃথাদের মতোই কমিউনিস্ট বাড়ি। প্রচুর বইপত্তর, দেশ-বিদেশের নানা মনীষীদের মতাবলী, দর্শন। ঠাকুর-দেবতা, পুজো-আচ্চার কোনও বাহুল্য নেই। হয়তো অনিমেষের মা লুকিয়েচুরিয়ে ব্রত পুজো করেন। পৃথার বাবার মতোই অনিমেষের বাবার তাতে ঘোর আপত্তি। এরকম একটা পরিবেশ ছাড়া অনিমেষ কী করে এমন পাক্কা লেফটিস্ট হল!

অনিমেষের বাড়ি গিয়ে ড্রয়িংরুমে বসেছিল পৃথা, অন্য ঘরদোরগুলো দেখার সুযোগ হয়নি। এখন আপশোস হয়, সেদিন বাড়ির ভেতরটা যদি দেখত, বিয়ের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত হত ঠিকই। বসার ঘরটুকু বাদ দিলে অনিমেষদের পুরো বাড়িটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাচীন ধ্যানধারণা, অন্ধ বিশ্বাসের ছাপ। এমন নয় যে পৃথা কোনওদিন এ ধরনের বাড়িতে ঢোকেনি। পরিচিত জনের মধ্যে বেশির ভাগই এরকম, পৃথা সেসব বাড়িতে গিয়ে মোটেই অস্বচ্ছন্দ বোধ করে না। তা বলে অনিমেষের বাড়ি কেন এমন হবে? দেওয়াল জুড়ে নানান ঠাকুরদেবতা, গুরুদেবের বাঁধানো ফটো, ক্যালেন্ডার। আলাদা ঘর ঠাকুরের, পাথরের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, পদ অনুযায়ী ধাপে ধাপে অন্যান্য ঈশ্বর ও অবতারের ছবি এবং মূর্তি। শাশুড়িমা ঠাকুরঘরে সকাল-বিকেল মিলিয়ে তিন ঘণ্টা কাটান। মাসান্তে অনিমেষদের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসে, মূল গায়ক মোটামুটি সুরো। আপ্রাণ ভক্তিরস ঢেলে গানগুলো গেয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ধুয়ো দিতে দিতে গুরুভাইরা বেসুরে গেয়ে যান। একবার হয়েছিল কী, কীর্তনের আসর শেষ হওয়ার পর ঘুগনি দানাদার খেয়ে ভক্তরা যে যার বাড়ি চলে গেছে, এ বাড়ির বাতাসে তখন শব্দের অবয়ব ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুর। পৃথা নিজের ঘরেই ছিল। সে আসরে বসে না।

BanglaBook.org

কলেজের দরকারি কাজ করে। আসলে ভান। বিয়ের পর প্রথম মাস-বৈঠকে ডাকতে এসেছিলেন শাশুড়ি, মুখের ওপর না বলে দেয় পৃথা। দেখুন মা, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। ওখানে বসে থাকলে আমার সময়টা মিছিমিছি নষ্ট হবে। তা ছাড়া কলেজের খাতা দেখার আছে আমার। তবে কীর্তনের শেষে প্রসাদ আমি সার্ভ করে দেব।

ছেলের কাছে একগাদা কমপ্লেন করে শাশুড়ি কোনও সুবিধে করতে পারেননি। তাই খাবার সার্ভ করার সময় ডাকেন না।

তো সেদিন কীর্তনীয়ারা চলে যাওয়ার পর পৃথা নিজের পড়ার টেবিল গোছাতে গোছাতে বেখেয়ালে বাতাসে রয়ে যাওয়া কীর্তনের সুর গুনগুন করে ওঠে, চাই আনন্দ চাই প্রেম/ চাই হরির নাম নিবি কে/ হরিনামের ফেরিওলা/ নে তুই, নে তুই, যায় ডেকে...

পৃথা খেয়াল করেনি কখন যেন শাশুড়িমা ঘরে ঢুকে এসেছেন। গান শেষ হতেই সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, ওমা, বউমা, তুমি এত সুন্দর গাও! তাই তো বলি, ভগবান কিছু না বুঝেশুনে কি তোমাকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন! কী সুন্দর গলা গো তোমার! দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার শ্বশুরকে ডেকে নিয়ে আসি।

পৃথা তো অপ্রস্তুতের একশেষ। ভগবান মানে না অথচ কীর্তন গাইছে। শ্বশুর-শাশুড়ির কোর্টে বল। কোনও একটা কাজে অনিমেষ তখন বাড়ির বাইরে। শ্বশুর-শাশুড়িকে ঠেকাবে কে?

শ্বশুরমশাই ঘরে এলেন। সচরাচর ছেলের শোওয়ার ঘরে আসেন না। শাশুড়িমা বললেন, বউমা, তোমার শ্বশুরকে গান একটু গেয়ে শোনাও।

পৃথা গাইবে না। নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। অনিমেষের বাবা বললেন, কীর্তন নয়, গান ভেবেই গাও।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে গানটা যতটুকু মুখস্থ আছে গেয়েই দেয় পৃথা। সোফায় চোখ বুজে বসেছিলেন অনিমেষের বাবা, গান শেষ হওয়ার পর চোখ খুললেন, জলে ভেসে গেল গাল। আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, সুখী হও মা, আনন্দে থাকো। ঈশ্বরকে খোঁজার দরকার নেই তোমার, উনি তোমাতেই বিরাজ করছেন।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অনিমেষের বাবা। পৃথা

BanglaBook.org

তখন ভাবতেও পারেনি, ওই মানুষটাই পরে এমন কাজ করবেন, লুকিয়ে রাখবেন পৃথার ডায়েরি।

পৃথার গান গাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত অনিমেষ সেদিন রাতে বলেছিল, মা-বাবা বলাবলি করছে, সামনের মাসে কীর্তনের আসরে তোমাকে যে করে হোক বসাবে। গুরুভাই-বোনদের শোনাবে বউমার গান।

উত্তরে কোনও কথাই বলেনি পৃথা। পরের মাসে আসরের আগের দিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল।

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁক ঘোরে জিপ। পৃথা ফিরে আসে বর্তমানে। রাস্তা এখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি খাড়াই। পাশেই গভীর খাদ। জিপ যেরকম লাফাচ্ছে, ড্রাইভারের সামান্য অসতর্কতায় পৃথারা গাড়িসুদ্ধু তলিয়ে যেতে পারে নীচে। অথচ তেমন ভয় করছে না পৃথার। ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এই বিপজ্জনক রাস্তায়। গাড়ি যত এগোচ্ছে উদ্ভাসিত হচ্ছে অবাধ নির্মল প্রকৃতি। মানুষ এখানে কম আসে, চারপাশে তাই এত বিশুদ্ধ নির্জনতা।

কিছুদিন যাবৎ বেঁচে থাকাটা গ্লানিময় হয়ে উঠছিল, কথায় কথায় ঝগড়া হয়ে যাচ্ছিল অনিমেষ আর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে। নিজের মায়ের সামনেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না পৃথা। খালি মনে হচ্ছিল এ সংসারে কেউ আমার দলে নয়, শুধুমাত্র দিদি ছাড়া। কিন্তু পাগলের সমর্থনে কী বা যায় আসে!

এরকম একটা নির্মল প্রাকৃতিক সান্নিধ্য ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছিল। অনিমেষের কতটা কাজে লাগছে এই ট্যুরটা কে জানে!

এই সূত্রে খেয়াল পড়ে অনেকক্ষণ অনিমেষের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি, ঝাঁকুনির চোটে ছিটকে বাইরে পড়ে গেল না তো? জানে অবান্তর চিন্তা, তবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছেটা দমন করে রাখে পৃথা।

BanglaBook.org

বুধিলাল গাড়িটা ভাল পাঠালেও ড্রাইভারটা সেরকম পাঠায়নি। বড্ড গম্ভীর। গাড়িতে তুলে নেওয়ার সময় যা একটা-দুটো কথা বলেছিল, তারপর থেকে গোটা রাস্তা চুপ। সঙ্গে কোনও হেল্‌পার নেয়নি, যার সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে বলতে যাবে। বুধিলাল আর

সুমন যেমন বলছিল। ভাষা না বুঝলেও, শব্দগুলোকে মনে হচ্ছিল নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

জিপটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। না খারাপ হয়নি। ড্রাইভার বন্ধ করে দিল স্টার্ট। কপাল কুঁচকে পৃথা জানতে চায়, কী হল?

গাড়ির দরজা খুলে নামতে নামতে ড্রাইভার বলে, ইঞ্জিন গরম হো গ্যায়া মেমসাব। পানি ডালনা পড়ে গা।

প্রমাদ গোনে পৃথা, বুধিলালও ওইটুকু রাস্তায় আসতে দু'বার জল ঢেলেছিল গাড়িতে।

ড্রাইভার চলে গেছে গাড়ির পিছনের দিকে, জ্যারিকেন ভরা জল বার করছে। ড্রাইভারকে লক্ষ করতে গিয়ে চোখ পড়ল অনিমেষের ওপর, চেহারা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। পিছনের সিটে থাকার দরুন ঝাঁকুনিটা ওকেই বেশি সহ্য করতে হচ্ছে।

বনেট তুলে ইঞ্জিনে জল ঢালছে ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে আসে পৃথা। আগের দু'বারে অভিজ্ঞতায় দেখেছে, জল ঢালার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে বুধিলাল।

গাড়ির আওয়াজ থেমে যেতে চারপাশ আরও নির্জন হয়ে গেল। ছিটকে-ছাটকে একটা-দুটো পাখির ডাক কানে আসছে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। এখন বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে পৃথারা। খাদের ওপারে বেশ ক'টা পাহাড়ের মাথা। গাঢ় সবুজ তাদের রং। অনেক নীচ অবধি দেখা যাচ্ছে।

পৃথা এবার যায় ইঞ্জিনের কাছে, জল ঢালা গাড়ি খারাপের পূর্বাভাস কিনা দেখতে হবে। অনিমেষ তো কিছুই দেখবে না।

ইঞ্জিনের সামনের কন্টেনারে জল ঢেলেই যাচ্ছে ড্রাইভার। কন্টেনার থেকে ধোঁয়া উঠছে, টগবগ করে ফুটছে জল। পৃথা জিজ্ঞেস করে, এত জল ঢালতে হয় কেন তোমাদের গাড়িতে?

ঘাড় ফিরিয়ে নিকটজনের মতো হাসে ড্রাইভার। বলে, খাড়াই হ্যায় তো, টপ গিয়ার মে চলনা পড়তা হ্যায়। ইঞ্জিন জলদি গরম হো যাতা হ্যায়। একটু থেমে বলে, পুরানা মডেল কা গাড়ি তো, পিয়াস লাগতা হ্যায় জলদি।

BanglaBook.org

ল্যান্ডরোভার ছাড়া অন্য কোনও মডেলের জিপ তোমরা চালাও না কেন? এই প্রশ্নটা অনিমেষের, কখন যেন পৃথার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ড্রাইভার বলে, ই সব গাড়ি কা বহুত জান আছে বাবু। ইংরেজ জমানে কা চিজ হ্যায়।

জান কেমন আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি, একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গেল, তোমারটাও এক ঘণ্টা অন্তর জল খাচ্ছে। বলে অনিমেষ।

জল ঢালা সাঙ্গ করে ড্রাইভার হাসে। বলে, ক্যায়া করে বাবু, নয়া জিপ কা বহুত দাম। ক্যায়াসে খরিদুঙ্গা। অওর এক বাত হ্যায়, ইয়ে গাড়ি আভি তো জিন্দা হ্যায়। ক্যায়সে ফেক দুঁ। কই আপনা বুড্ডা নানা-নানি কো ফেক দেতা হ্যায়?

অনিমেষ দমে যায়। পৃথা ভাবে, আয়ারল্যান্ডে তৈরি হওয়া এই জিপগুলো এখনও যে ভারতের গভীর প্রত্যন্তে পাহাড় ওঠা-নামা করছে, কারখানার মালিক-শ্রমিক কল্পনাও করতে পারবে না।

গাড়িগুলোর ওপর কেমন যেন মায়া হয় পৃথার। স্বজাতি ওদের ভুলে গেছে।

ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনিমেষ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পৃথা হাঁটা দিল বিপরীত দিকে। খুব দূরে গেল না। বাঁকের মুখে মাইল স্টোনের ওপর বসল। অনিমেষের দৃষ্টিপথের মধ্যেই থাকতে চায় সে। তাকে দেখতে না পেয়ে অনিমেষ উদ্বিগ্ন হবে, এই অধিকারটুকু দিতে ইচ্ছে করে না।

সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ ম্লান হাসে পৃথা। বিশ্বজিৎদা বলেছিল, একসঙ্গে কোথাও বেড়িয়ে আয়, দেখবি তোদের মধ্যে গ্যাপ অনেকটা কমে গেছে। আসলে তোরা দু'জনেই চাকরি করিস, কাজে ফাঁকি মারা তোদের স্বভাব নয়। থাকিস বড় একটা সংসারের মধ্যে। বাড়ির লোকেদের সময় দিতে হয়। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিগুলো রিপেয়ার হবে কখন? বাইরে গেলে অনেকটা সময় নিজেদের কাছে পাবি। ঝালিয়ে নিতে পারবি সম্পর্কটা।

এতটা পথ, সময় যাওয়ার পর গ্যাপটা যেন আরও বেড়ে গেছে। পৃথা নিশ্চিত, ড্রাইভার পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব

BanglaBook.org

নেই। ওই তিনটে ছেলে কী বুঝেছিল কে জানে! ওদের সঙ্গে আর দেখা না হওয়া ভাল। অনিমেষ পৃথার আচরণ দেখে কপালে ভাঁজ পড়বেই ওদের।

এমনও হতে পারত, ওরা থাকলে লোকলজ্জার খাতিরে নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা চালাত পৃথারা। তা হলে কি ভুল করল দার্জিলিংয়ে না থেকে, সেখানে অনেক মানুষ, অনেক জোড়া চোখ, পৃথারা বাধ্য হত নিজেদের গ্যাপটাকে ঢাকতে। বিশ্বজিৎদাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, পরামর্শ ঠিকই দিয়েছিল। পৃথাই বেছে নিয়েছে নির্জনতা, তৈরি হচ্ছে এখানকার খাদের থেকেও গভীর ফাটল!

চিড় কবে ধরেছিল এখন আর ঠিক খেয়াল পড়ে না। হয়তো বিয়ের আগে থেকেই... অনিমেষের অনুরোধে প্রথমবার পৃথা যখন গিয়েছিল ওদের বাড়ি, তার ক'দিন পরেই অনিমেষের মাসি-মেসো এসে হাজির পৃথার মায়ের কাছে, সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব।

পৃথা তখন বাড়ি ছিল না। সামনে এম এ-র ফাইনাল। প্রিপারেশন করতে গিয়েছিল সুদত্তার বাড়ি। মাথায় তখন একটাই চিন্তা যে-করে হোক রেজাল্ট ভাল করতে হবে। ভদ্রস্থ চাকরি একটা চাই। বাবার পেনশনের টাকায় সংসার চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পৃথা অবশ্য চারটে টিউশন পড়ায়, তবু পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে। এক বাড়িতে তিনটে সংসার, টাকার অভাবে কাকা-জ্যাঠার তুলনায় ক্রমশ মলিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে পৃথাদের পোরশন।

বাড়ি ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে চা নিয়ে বসেছে মায়ের সামনে, তখনই খবরটা দিল মা, অনিমেষের বাবা-মা'র পৃথাকে নাকি ভীষণ পছন্দ হয়েছে, এ বছরের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।

এরকম একটা কথা যে উঠতে পারে, অনিমেষের বাড়ি গিয়ে সেটা টের পেয়েছিল পৃথা। ওদের বাড়ির লোকের মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছিল পৃথাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কল্পনা। কিন্তু প্রস্তাবটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে ভাবতে পারেনি। তাই পৃথা মাকে বলে উঠেছিল, এরকম তো কথা ছিল না।

মানে? বুঝতে না পেরে বলেছিল মা।

BanglaBook.org

পৃথা বলে, অনিমেষদা তো কোনওদিন আমায় বিয়ের কথা বলেনি।

লাজুক ছেলে, তাই হয়তো বলে উঠতে পারেনি। কেন, তোর কি অনিমেষকে পছন্দ নয়?

পৃথা চুপ করে গিয়েছিল। অনিমেষের বাড়িতে যাওয়াটাই তার ভুল হয়েছে। একটু ভেবে মাকে বলেছিল, আমার তো বিয়ে করার আপাতত কোনও ইচ্ছে নেই মা। সত্যি বলতে কী, এখন অবধি কিছু ভাবিইনি।

অভিমানে ফুঁসে উঠেছিল মা, তা ভাববে কেন, বাড়িতে দুই ধিঙ্গি মেয়ে বসে থাকবে, আত্মীয়স্বজনরা খোঁটা দেবে আমায়। সব সহ্য করতে হবে। তোমার বাবা আগেভাগে চলে গিয়ে খালাস পেয়েছেন।

কী খোঁটা দেবে?

কেন, বলবে, এক মেয়ে পাগল, অন্যটা যদি বা সুস্থ, বিয়ে দিল না ওর পয়সায় খাবে বলে।

মেজাজটা তেতো হয়ে গিয়েছিল পৃথার। পরের দিন দেখা করে অনিমেষের সঙ্গে। বলে, আপনি এই সিচুয়েশনে ফেলার জন্যেই আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন?

তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নেয় অনিমেষ। একই সঙ্গে বলে, আসলে আমি নিজে থেকে কথাটা তোমাকে বলার সাহস পাচ্ছিলাম না।

কেন?

যদি না করে দাও। একজনকে 'না' করা খুব সহজ। সেক্ষেত্রে অপমানিত হয়ে আমি কোনওদিনই আর প্রপোজালটা তোমার সামনে রাখতে পারতাম না। গুরুজনদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ঠিক মনে হল।

আপনি দেখছি এখানেও রাজনীতির বুদ্ধি খাটাচ্ছেন! খোঁচা মেরে বলেছিল পৃথা।

অনিমেষ বলে, কী করব বলো, স্বভাবটাই খারাপ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই তো এতদিন তোমার সঙ্গে মেলামেশার পরও প্রকৃত প্রেমিকের মতো 'ভালবাসি' কথাটা উচ্চারণ করতে পারিনি। ভাষণ দেওয়া কর্কশ গলা, বিরোধী পার্টিকে গালাগাল করা অশিষ্ট জিভ, কী জানি শব্দটা ঠোঁটে মানাবে কিনা!

BanglaBook.org

হেসে ফেলেও, নিজেকে সামলে নিয়েছিল পৃথা। তারপর বলেছিল, আমি কিন্তু এখন বিয়ে করতে পারব না।

কবে পারবে?

চাকরি পাওয়ার পর। আমাদের সংসারের জন্য চাকরিটা আমার খুব দরকার।

কোনও অসুবিধে নেই। বাবা-মাকে অপেক্ষা করতে বলব আমি।।

কেন, অপেক্ষা কীসের? ওঁরা আমার থেকেও ভাল পাত্রীর সন্ধান করতে পারেন।

করবে না।

কারণ?

কারণ দুটো। এক হচ্ছে, বুঝে গেছে, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করব না। দুই, মা-বাবা, ভাই বলাবলি করছিল, তোমার মতো সুন্দরী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ওরা নাকি আগে দেখেইনি। ভাইটা এমন বদমাইশ, মাকে বলেছে, পৃথাদি এ বাড়ির বউ হয়ে এলে ইলেকট্রিক বিল কম আসবে।

ওমা, কেন? না বুঝে সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল পৃথা।

অনিমেষ বলে, তোমার গায়ের রঙের জন্য।

কমপ্লিমেন্টটা পেয়ে খুশিই হয়েছিল পৃথা। কপট রাগে বলেছিল, দাঁড়াও, সুমিতের সঙ্গে এরপর দেখা হোক, গাঁট্টা খাবে।

পৃথার বিয়ের দু'বছরের মধ্যে এই সুমিতই একদিন ছাদে রাগ ভাঙাতে এসে বলেছিল, তোমার যুক্তিগুলো আমি মানি। তবে যতই চেঁচামেচি করো, এ বাড়ির আদব-কায়দা পালটানোর নয়। আমি একটা ভাল কথা বলছি শোনো, দাদাকে নিয়ে তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।

অবাক হয়ে দেওরের দিকে তাকিয়েছিল পৃথা। সুমিতই একদিন বলেছিল, পৃথা ওদের বাড়ি আলোকিত করবে।

সেদিন ছাদে পৃথার অবাক দৃষ্টির ভুল মানে করল সুমিত। বিব্রত হয়ে বলল, তুমি আবার ভেবে বোসো না, তোমাদের পোরশন ভোগ করার জন্য আমি এ কথা বলছি। আমি কথা দিচ্ছি, তোমরা চলে যাওয়ার পর, তোমাদের ঘরে পা রাখব না আমি।

BanglaBook.org

পৃথা কোথাও যায়নি। বাবা-মা'র সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না দেখে অনিমেষও একবার বলেছিল, রোজ রোজ ঝামেলা ভাল লাগে না। হয় তুমি মা-বাবার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলো, নয়তো অন্য কোথাও ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি।

ওঁরা কেন আমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছেন না? পালটা প্রশ্ন তুলেছিল পৃথা।

বাবা-মা'র বয়স হয়েছে, এই বয়সে মানুষ কি আর নিজেকে শোধরাতে পারে!

বয়সের দোহাই দিয়ো না অনিমেষ। ওঁরা যথেষ্ট শক্তসমর্থ। বাসে ট্রেনে যাতায়াত, দোকান-বাজার সবই করতে পারেন। পাঁচজনের সঙ্গে ইন্টার অ্যাকশনে কোনও অসুবিধে হয় না ওঁদের। তুমি যাকে বলছ অ্যাডজাস্টমেন্ট, প্রতিনিয়ত তাই করে চলেন ওঁরা, আমার বেলায় করবেন না কেন?

ওঁরা তোমার গুরুজন পৃথা। অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠেছিল অনিমেষ।

একটুও দেরি না করে পৃথা বলে ওঠে, তোমার মতো প্রগতিশীল মানুষের মুখে 'গুরুজন' শব্দের এই ভুল ব্যাখ্যা মানায় না। বয়সে সম্পর্কে বড় বলেই তাঁদের ভ্রান্ত ধ্যানধ্যারণা আমায় মেনে চলতে হবে? গুরু তো তাঁকেই বলব, যাঁর আদর্শ অনুসরণ করার মতো।

অনিমেষের মুখে আর কোনও কথা নেই। পৃথার বলা তখনও শেষ হয়নি। ফের বলে, একটা কাজ করা যাক না। আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনে বাবা-মাকে থাকতে বলি। আমার সঙ্গে যখন ওঁদের বনছে না, আশা করি আলাদা থাকলে ভালই থাকবেন।

পৃথার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল অনিমেষ, যেন ভিনগ্রহের কোনও জীব সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হতাশ বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, সত্যি পৃথা, ইউ আর ইমপসিবল!

হাসিতে শ্লেষ মিশিয়ে পৃথা বলে, ব্যবস্থাটা পছন্দ হল না, না? আমি যেহেতু বাইরে থেকে এসেছি, চিরকাল আউট সাইডার হয়ে থেকে যাব। এ-বাড়ির ওপর কোনও অধিকার নেই আমার।

চুল খামচে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল অনিমেষ। পৃথা থামেনি। একটু দম

BanglaBook.org

নিয়ে বলেছিল, একটা কথা স্পষ্ট শুনে রাখো, আমি যদি কোনওদিন এ বাড়ি ছেড়ে যাই, একলাই যাব। আর কোনওদিন আসব না।

শেষ কথাটায় বাস্তবিক ঘাবড়ে গিয়েছিল অনিমেষ। পরের দিনই পৃথাকে না জানিয়ে পৃথার মায়ের সঙ্গে দেখা করে। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পৃথার সমস্যার কথা সমস্তটাই বলে। মা তার আগে এত কিছু জানত না। পৃথার মুড দেখে কিছুটা আন্দাজ করত হয়তো।

প্রতি সপ্তাহে একদিন অন্তত শ্রীরামপুরের বাড়িতে যায় পৃথা। অনিমেষ ঘুরে যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে দেখা হতে, অনেক বোঝাল মা, সব বাড়িই কি নিজের বাড়ির মতো হয় রে, প্রত্যেক পরিবারে আলাদা রেওয়াজ রীতিনীতি আছে। বিয়ের পর মেয়েদের যখন অন্য বাড়ি যেতেই হবে, মানিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তার।

মায়ের সঙ্গে আর তর্কে যায়নি পৃথা। প্রত্যেক মা চায় তার মেয়ে যেন শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে গুছিয়ে থাকে। পৃথার যা-কিছু বলার বলেছিল দিদিকে, দ্যাখ দিদি, ওদের বাড়িতে সবকিছু আচার-বিচার আমায় কেন মানতে হবে? ছেলেদের তো বলে না, আজ সকাল সকাল চান করে নে, অমুক ব্রত আছে। এই তাগাটা বেঁধে নে। আজ তোর একবেলার উপোস, আজ তোর নিরামিষ... যত নিয়ম বাড়ির বউয়ের ওপর। আমার শাশুড়ি যে অন্ধকার জগতে পড়ে আছে, আমাকেও টানতে চাইছে সেখানে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি তো ঠিক করেছি, ওদের মুখ চেয়ে সিঁদুর-নোয়া যেটুকু পরে আছি, সেটাও আর পরব না।

শুনে দিদি বলেছিল, খবরদার ও কাজ করতে যাস না, রাস্তার লোক ভাববে এত বড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি। করুণার চোখে তাকাবে। যেমন আমার দিকে তাকায়। তাই তো রাস্তাঘাটে বেরোতে চাই না আমি।

দিদিকে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই পৃথা জানত, বস্তুত স্বগতোক্তি করছিল সে। অবশেষে নিজের সমস্যা নিয়ে একা একা ভাবতে বসেছিল পৃথা। কোনও সঙ্গী নেই, যার কাছে যাচাই করে নেওয়া যায়, নিজের ভাবনা-চিন্তা ঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। খুবই নিরপেক্ষ থেকে পৃথা ভাবতে চেষ্টা করেছে, তার বৈবাহিক অসুখী জীবনের জন্য মূল দায়ী কে? অনিমেষের বাবা, মা, অনিমেষ, নাকি নিজেই? একটু ভাবতেই আর

BanglaBook.org

একটা নামও তালিকায় যোগ হয়েছে, পৃথার বাবা। আদর্শনিষ্ঠ, সৎ বাবার প্ররোচনায় পৃথা এরকম একরোখা, আপোসহীন। কতবার, কত পার্টি বাবাকে নিজেদের দলে চেয়েছে, উঁচু পদে বসার প্রস্তাব দিয়েছে। বাবা নিজের দল ছেড়ে কোথাও যায়নি। পৃথার বাবা দেবনাথ কুশারী মারা যাওয়ার পর জানা গেল, তিনিই ছিলেন এলাকার একমাত্র অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। তবে শেষযাত্রায় দলমতনির্বিশেষে প্রচুর মানুষ হয়েছিল। কলকাতা থেকে বাবার পার্টির একজন মন্ত্রী এসেছিলেন। বেঁচে থাকতে বাবা চক্ষুদানের ইচ্ছাপত্র দিয়ে গিয়েছিল আই ব্যাঙ্কে, শোকের মুহূর্তে মায়ের সেটা মনে পড়েনি। খবর পাঠানো হয়নি আই ব্যাঙ্কে। শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এলে, মা বলেছিল, যাঃ, ওর চোখ দুটো যে পুড়ে গেল। বলেছিল...

কথাটা শোনার পরই অন্ধকারের পাতলা সর নেমে এসেছিল পৃথার চোখে। যেটা বোধহয় এখনও রয়ে গেছে, গভীর জটিল কোনও সমস্যায় পড়ে গেলে আলো কম পড়ে যায় চোখে, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে পৃথা। সে যাই হোক, পৃথার অসুখী দাম্পত্যের জন্য বাবাকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। বিয়ের ডিসিশন নেওয়ার অনেক আগেই বাবা মারা গিয়েছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো খানিকটা সঠিক দিশা দিতে পারত।

পৃথার মনে হয় তার অসুখী জীবনের জন্য মূলত অনিমেষই দায়ী। অনিমেষদের বসার ঘর মার্কসবাদীদের মতো, ভেতরের ঘর কট্টর হিন্দুত্ববাদী। বিয়ের আগে অনিমেষের সেটা বলে নেওয়া উচিত ছিল। অনিমেষদের পাড়ার লোকেরা ওদের বাড়িটাকে 'সি পি এম' বাড়ি বলেই চিহ্নিত করে। পৃথাও জানে শ্বশুর-শাশুড়ি ভোট সি পি এম-এর ফরে দেন। এলাকার সি পি এম-এর মিটিং-মিছিল, বড় কোনও কর্ম উদ্যোগে নির্দ্বিধায় যোগ দেন শ্বশুরমশাই। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে না, আপনি এখানে কেন? বাড়িতে বিশাল ঠাকুরঘর, মাসান্তে কীর্তন, গুরুভাইদের কাছে যান না।

প্রশ্নটা অনিমেষকেই করেছিল পৃথা। উত্তরে অনিমেষ বলেছিল, এ আর এমন কী, পার্টি তো চলছেই এখন এরকমভাবে। তা ছাড়া বাবা তো পার্টির মেম্বারও না, কোনও পদেও নেই। শুধু সমর্থন করে।

BanglaBook.org

তাঁর সমর্থন পার্টি গ্রহণ করে কেন?

বোকার মতো কথা বোলো না পৃথা, তুমি ভাল করেই জানো ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে গেলে কিছুটা উদার মনোভাব নিতেই হয়।

সেই মনোভাব একজন কমিটেড কমরেড নিজের বাড়িতেও দেখাবে? তুমি পারো না, অন্তত নিজেদের বাড়িতে এই দ্বিচারিতা যেন না হয়।

তক্ষুনি কোনও জবাব না দিয়ে গুম হয়ে বসেছিল অনিমেষ। একটু পরে বলে, পৃথা, তুমি আগে ঠিক করে নাও তোমার বিরোধিতা ঠিক কার সঙ্গে, আমার না পার্টির! যদি পার্টির কথা বলো, তা হলে বলব, তুমি কিন্তু একই সিস্টেমের মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছ, অথচ প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছ না।

ঠিক বুঝলাম না। বলেছিল পৃথা।

তোমাদের কলেজের ভেতরে এমন দু'-একজন লেকচারার আছেন, যাঁরা ক্লাস নেওয়ার থেকে বেশি মন দেন 'লবি' করায়। 'সেনেট'-এ ঢোকা যায় কীভাবে। কই, সেখানে তো কখনও প্রতিবাদী হতে দেখিনি তোমায়। নির্বিঘ্নে চাকরি করাটাকে গুরুত্ব দিয়েছ। আপোস করে নিয়েছ অন্যায়ের সঙ্গে। কেননা প্রতি মাসে মাইনেটা আসে কলেজ থেকে শ্বশুরবাড়ির যেহেতু কিছু দেওয়ার নেই তোমাকে, তাই এত বিশুদ্ধতা আশা করছ। তার থেকে পরিষ্কার করে বলো না, আমাদের বাড়ি কাউকেই তোমার পছন্দ নয়।

সেই প্রথমবার অনিমেষ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবা থেকে পৃথা আলাদা, একা। অনিমেষও তার সঙ্গে নেই।

কথা বলার আর ইচ্ছে হয়নি পৃথার। অনিমেষের সামনে থেকে স এসেছিল। একটা ব্যাপারে অনিমেষকে তখন শুধরে দিলে ভাল শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র সুমিতকেই ঠিকঠাক মানুষ বলে মনে হয়। মধ্যে ভণ্ডামি প্রায় নেই। অন্যায় স্বীকার করতে দ্বিধা করে না।

এক বছর হল সুমিতের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণ। পৃথাদের বিয়ে হয়েছিল রেজিস্ট্রি করে, সেই দু'বাড়ির আত্মীয়পরিজন নিয়ে খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। নিমন্ত্রি

BanglaBook.org

সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। শ্বশুর-শাশুড়ির ব্যাপারটা ঠিক মনঃপূত হয়নি। তাই ছোটছেলের বিয়েতে সাধ পূর্ণ করে নিলেন।

বিয়ের খরচা জোগাল অনিমেষ আর পৃথা। একবারের জন্যেও পৃথা অনিমেষকে বলেনি, জাঁকজমকের বিয়ে আমরা মানি না বলে নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর রাখলাম। কেন তা হলে সুমিতের বিয়েতে এত খরচা করব?

পৃথা হাসিমুখে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। বরং সুমিত একটা সময় পৃথাকে আলাদা ডেকে কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল, জানি, তোমার অনেক খরচা হল। যদি কোনওদিন আমার সামর্থ্য হয় নিশ্চয়ই অন্যভাবে শোধ করে দেব।

বিব্রত হয়েছিল পৃথা। সঙ্গে সঙ্গে বলে, এ কী কথা সুমিত! আমি খরচটা করেছি নিজের ইচ্ছেয়। কেউ আমাকে জোর করেনি। ধরে নাও না, তোমার বিয়েতে এটাই আমার গিফট্।

ম্লান মুখে সুমিত বলেছিল, দুঃখ একটাই, উপহারটা নিজের পছন্দমতো দিতে পারলে না। আমিও বলতে পারলাম না তুমি আমায় অন্য কিছু দাও। বাবা মনে করেন পাড়ায়, আত্মীয়পরিজনের কাছে তাঁর একটা বিশেষ মান-মর্যাদা আছে। সেটা রক্ষা করার জন্য যেমনটা জাঁকজমক বিয়েতে দরকার, আমার মতো প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করা ছেলের পক্ষে খরচ জোগানো সম্ভব নয়।

পৃথা সান্ত্বনা দিয়েছিল সুমিতকে, মন খারাপ কোরো না, বড়ছেলের বিয়ে নিয়ে ওঁদের অনেক আক্ষেপ ছিল, বহু চেনা-জানা মানুষকে নেমন্তন্ন করতে পারেননি অথচ কখনও-না-কখনও নিমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁদের বাড়িতে। এখন তো লজ্জা ঢাকা গেল...

সুমিতও বিয়ে করেছে নিজের পছন্দে। খুব ভাল তবলা বাজায় সুমিত। সঙ্গত করতে যেত ঝরনাদের বাড়িতে, ঝরনা ক্লাসিকাল নাচ শেখে। বউ হয়ে আসার পর থেকে নাচের ব্যাপারে আর কোনও আগ্রহ নেই। পৃথা ঠিক জানে না, শাশুড়ির অনুৎসাহ এর কারণ কিনা। মেয়েটা ডগডগে সিঁদুর পরে শাশুড়ির ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। পৃথা একবার মজা করে বলেছিল, কী গো ঝরনা, তুমি তো দেখছি মায়ের আঁচলে নিজেকে

BanglaBook.org

বেঁধে নিয়েছ। আমার কাছে তো আসোই না।

উত্তরে ঝরনা বলেছে, কী করব দিদিভাই, আমি যে তোমার মতো চাকরি করি না, ওরও ক্ষমতা নেই আমাকে নিয়ে আলাদা সংসার করার। তাই শাশুড়িমাকে একটু তেল মেরে চলতে হয়।

একদম কঠোর বাস্তব কথাই বলেছিল ঝরনা, পৃথার যাবতীয় প্রতিবাদের ভিত কিন্তু চাকরি। অনিমেষের কথামতো যে চাকরিটা পৃথা আপোস করে টিকিয়ে রেখেছে। কথাটা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। তা হলে পৃথার অসুখী জীবনের জন্য শুধুমাত্র অনিমেষই দায়ী নয়, অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে। আরও গভীর অনুসন্ধান দরকার। আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে পৃথার। অবসাদ কাটাতেই পাহাড়ের কাছে আসা। এই নির্জন নিসর্গ অবগাহন তাকে ঝরঝরে সতেজ করবে। হয়তো করছেও, তাই তো ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারছে এত কিছু। এই ট্যুরেই সে ঠিক করে নেবে, পরবর্তী জীবনটা কাটাবে কীভাবে।

বারবার হর্নের আওয়াজে চিন্তা ছিঁড়ে যায় পৃথার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, জিপ রেডি হয়ে গেছে, ডাকছে পৃথাকে।

সাত

একটা জিনিস লক্ষ করেছিস বাপ্পা, আমরা এখন আর তেমন হাঁপাচ্ছি না। কষ্ট আগের থেকে অনেক কম লাগছে। হাঁপ ধরা গলাতেই কথাটা বলল সুগত।

বাপ্পা বলে, আসলে অভ্যেস হয়ে গেছে। ট্রেকিংয়ের প্রথম তিন-চার ঘণ্টা বড্ড কষ্ট হয়। তারপর ধীরে ধীরে মানিয়ে নেয় শরীর।

রায়ন সমর্থন করে বাপ্পাকে। বলে, ঠিক বলেছিস, আমার তো মনে হয় এইভাবে হেঁটে যেতে পারলে আজকেই পৌঁছে যেতে পারব ওপরে।

অত সোজা নয়, সান্দাকফু এখনও অনেক দূর। টাইমে, দমে, কোনওটাতেই কুলোতে পারব না। সামনে কিছু জায়গা আছে হেভি খাড়াই। একটা রাত রেস্ট নিতেই হবে টংলুতে। বলে বাপ্পা।

BanglaBook.org

নীরব থেকে বাপ্পার কথা মেনে নেয় দুই বন্ধু। রাস্তার ম্যাপ, শিডিউল সব বাপ্পার জিম্মায়। খরচা-খরচ দেখছে সুগত। রায়নকে তেমন কোনও গুরুদায়িত্ব দেওয়া নেই। দেওয়া হলে নির্ঘাত ডোবাত। বাবার আদরের ছেলে। বাড়ির কোনও কাজ করতে হয় না।

মাটিতে লাঠি ঠুকে কী যেন ভাবতে ভাবতে হেঁটে যাচ্ছে রায়ন। বাপ্পা বলে, হ্যাঁরে রায়ন, তুই যে বাবাকে বলে এলি দার্জিলিং যাচ্ছি, ফোন করতে বলেনি ট্যুরের মাঝে?

করলাম তো নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে।

না, দার্জিলিং থেকে ফোন করার কথা বলছি। তুই তো এখান থেকে কোনওভাবেই ফোন করতে পারবি না।

বাপ্পার কথায় রায়ন একটু চিন্তায় পড়ে যায়। অস্ফুটে বলে, সত্যি, এই কথাটা তো ভাবিনি আগে। ফোন না পেলে বাবা তো অস্থির হয়ে উঠবে।

কোনও চিন্তা নেই, পারবি ফোন করতে। বলে সুগত।

কী ভাবে? সাগ্রহে জানতে চায় রায়ন।

সুগত বলে, সেল ফোন নিয়ে এসেছি আমি। টাওয়ার পেলেই তোকে বলব।

বাপ্পা একটু খেপে যায়। বলে, এটা কী হল! এরকম তো কথা ছিল না। আমি তোদের আগেই বলে দিয়েছিলাম মোবাইল ফোন নিবি না। চেনা পরিচিত জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমরা পাহাড়ে উঠব।

তুই বলেছিস বলেই আমাদের শুনতে হবে নাকি! একটা মোবাইল থাকলে কত সুবিধে হয় জানিস, বিপদে-আপদে চট করে লোকের সাহায্য নেওয়া যায়। বলে সুগত।

নিজেকে অত সুরক্ষিত করে বেড়ানোকে আর যাই হোক অ্যাডভেঞ্চার বলা যায় না। বেড়ানোর মজাটাই চলে যায়।

বাপ্পার কথার রেশ ধরে রায়ন বলে, তা অবশ্য ঠিক। এই দুর্গম রাস্তা, অচেনা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফোনে বিজনেসের খবর নেওয়া, হরিদা, কমলা ভ্যারাইটিতে চার পেটি অমুক বিস্কুট নামিয়ে দাও। সত্যনারায়ণে গিয়ে আগের বিলের টাকা চাইবে।... এটা এক ধরনের অসভ্যতা।

BanglaBook.org

ঠিক আছে, ঠিক আছে দেখব। সময়মতো যখন কাজে লাগবে ফোনটা, তখন তোরাই বলবি...

রায়ন বলে, মোবাইল ফোন যখন ছিল না, তখন কী করত মানুষ?

সে তো একসময় হাতঘড়িও ছিল না, তখন কি মানুষ পাহাড়ে হাঁটেনি? পালটা যুক্তি দেয় সুগত।

বাপ্পা বলে, ও দুটো জিনিস এক হল না। রিস্টওয়াচ দরকার ট্যুরের স্বার্থে। মোবাইল ফোন মানেই যেসব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি, সেটাকেই ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানো।

ঠিক আছে, ধর মোবাইল ফোন সঙ্গে নেই, কিন্তু তুই কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবি, বাড়ির কথা একদম ভাবছিস না? ভাবনাটা বয়ে নিয়ে চলাও তো এক ধরনের যোগাযোগ রাখা।

অকাট্য যুক্তি। চুপ করে যায় বাপ্পা। একথা ঠিক, এত সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলেও সে কিন্তু একবারের জন্য ভুলতে পারছে না বাড়ির কথা। বিশেষ করে বোনের কথা মনে পড়ছে। বোনের একটা মেজর ওষুধ থাকে বাপ্পার কাছে। খুব ভায়োলেন্ট হয়ে উঠলে দেওয়া হয় ওটা। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওষুধটা আপনার কাছে সযত্নে রাখবেন। অন্য ওষুধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে কেউ যদি খেয়ে নেয়, বিপদে পড়ে যাবে।

ওষুধটা বাপ্পার টেবিলের ড্রয়ারেই আছে, ভুল হয়েছে একটাই, বাড়ির কাউকে দেখিয়ে আসা হয়নি। বোন যদি হঠাৎ বিগড়ে যায়, বাড়ির লোক সামলাতে পারবে না। একটু আগে মোবাইল ফোনের বিপক্ষে কথা বলেছে বাপ্পা। এখন মনে হচ্ছে পাশের বাড়িতে ফোন করে ওষুধের ব্যাপারটা বলে দেওয়া উচিত। বাপ্পা এখনও বাড়িতে ফোনের কানেকশন নিতে পারেনি। তবে পাশের বাড়ির লোকেরা ভাল, বাপ্পাদের ফোনটোন এলে বিরক্ত হয় না।

BanglaBook.org

ফোনের প্রসঙ্গ এসেই যত ঝামেলা হল, অস্থির হচ্ছে বাপ্পার মন, বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে বোনের মুখ। মেন্টালি রিটার্ডেড হলে কী হবে, অসম্পূর্ণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারে বাড়ির আসল কর্তা হচ্ছে বড়দা। তাই যত আদর-আবদার সব বাপ্পার কাছেই।

সুগতর ফোনটা ঘুরপথে চায় বাপ্পা, ফোন সেটটা তুই বেকার এনেছিস। এখান থেকে টাওয়ার পাওয়া সম্ভব নয়।

না না, পেতেও পারে। টাওয়ার পাওয়াটা বেশ একটা খেলার মতো। কখন পাওয়া যাবে, কখন যাবে না কোনও ঠিক নেই। ট্রেনে আসতে আসতে দেখছিলি না, প্যাসেঞ্জাররা কেমন হুটোপাটি করছিল টাওয়ারের জন্য। কানেকশন পেলেই খবর নিচ্ছিল বাড়ির, বন্ধুদের। খবর নেওয়াটা আসলে ছুতো, খেলাটাই আসল। মডার্ন গেম।

রায়নের ভাষণে মন নেই বাপ্পার, সুগতকে বলে, সেটটা একবার বার কর, দেখি এখান থেকে কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে কিনা?

কী হবে দেখে? উৎসাহহীন গলায় বলে সুগত।

বাপ্পা বলে, দেখি না, প্রযুক্তির থেকে কতটা দূরে এলাম দেখতে হবে না!

তক্ষুনি প্রতিবাদ করে রায়ন, কোনও দরকার নেই। তার থেকে এক কাজ করা যাক, সুগতর সেটটা এখানেই কোথাও প্লাস্টিকে মুড়ে, পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিই, ভাল করে সাইন দিয়ে রাখব, ফেরার পথে তুলে নেব ফোনটা।

রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সুগত। বলে, কোনও দরকার নেই ভাই, তোরা ভুলে যা আমার কাছে ফোন আছে।

হতাশ হয় বাপ্পা, ফোন পাওয়ার আর কোনও চান্স নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রসঙ্গটা জিইয়ে রাখে, যদি সুযোগ আসে। বাপ্পা বলে, আচ্ছা রায়ন, তুই এই মোবাইল সভ্যতা, মানে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই বিপ্লবকে কী চোখে দেখিস?

ভালই তো, মানুষের অনেক সুবিধে হয়েছে, সময় অপচয় হচ্ছে না। সবকিছু নাগালের মধ্যে রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তো মোবাইল ফোন খুব রোমান্টিক ব্যাপার!

কীরকম? জানতে চায় বাপ্পা।

রায়ন বলে, ধর, আমাদের তিনজনের কোনও একজনের যদি প্রেমিকা থাকত, সুগতর ফোনটা নিয়ে এই রাস্তার বর্ণনা দিতে দিতে যেতাম। সে হয়তো তখন ধর্মতলার কোনও ভিড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে...

BanglaBook.org

কথা কেড়ে নিয়ে সুগত বলে, এমনও হতে পারে, ট্রেক করতে করতে আমরা যখন প্রচণ্ড ক্লান্ত, একটা ছোট্ট এস এম এস আমাদের চাঙ্গা করে দিল।

রায়ন বলে, দাঁড়া, এস এম এস কী হবে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। ভাবতে খানিকটা সময় নেয় রায়ন। তারপর বলে, জীবনানন্দকেই কোট করতে হচ্ছে বুঝলি, পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে/ আকাশ ছড়ায়ে আছে, শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

বিউটিফুল! অপূর্ব! সত্যি মাইরি, এই নির্জন পাহাড়ে যদি কোনও মেয়ে এরকম 'মেসেজ' পাঠায়, হোল লাইফ আমি তার কাছে মর্টগেজ থাকতে রাজি। বলল সুগত।

বাপ্পা বুঝতেই পারে দুই বন্ধুর যাবতীয় উচ্ছ্বাস আগ্রহ ফোন থেকে ঘুরে প্রেমে চলে গেছে। সেই-বা আলোচনার বাইরে থাকে কেন। বাপ্পা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, তোরা একটা কথা কখনও ভেবে দেখেছিস, আমাদের তিনজনেরই কেন কোনও প্রেম হল না?

আমার তো হয়েছে, হামেশাই হয়। চারদিন, এক সপ্তাহ, সব থেকে বেশি সতেরো দিনের প্রেম। বলে সুগত।

বাপ্পার মুখে বিরক্তি। বলে, দুর বাবা, আমি সে কথা বলছি না, স্টেডি প্রেম। আর তোর যেসব প্রেমের কথা বলছিস, খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেগুলো সবই ছিল একতরফা, তোর দিক থেকে।

তর্কে যায় না সুগত। নিজের প্রশ্নের উত্তর বাপ্পা নিজেই দিতে থাকে। আমার কী মনে হয় জানিস, আমাদের সময়ের মেয়েরা বড্ড বেশি ক্যালকুলেটিভ, নিজের কেরিয়ার তো আছেই, যার সঙ্গে প্রেম করবে তার ভবিষ্যৎটা নির্ভুলভাবে হিসেব কষে নেয়। সে ক্ষেত্রে প্রেমিক হিসেবে নাম্বার আমরা যথেষ্ট কম পাব। শেষবেলার বাজারে পড়ে থাকা আনাজের মতো কিছু মেয়ে থাকবে, যারা বহু চেষ্টা করেও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের চোখ টানতে পারেনি, তাদেরই বিয়ে করতে হবে আমাদের।

ভেরি স্যাড। কিন্তু তোর চাকরিটা তো সরকারি। মন্দের ভাল একটা মেয়ে পেয়ে যাবি ঠিক, আমাদের কপালে শালা তাও জুটবে না। হতাশার মধ্যে খানিকটা অভিনয় ঢুকিয়ে দেয় সুগত।

BanglaBook.org

রায়ন কিছুই বলছে না। সামান্য তফাতে নিজের মনে হেঁটে যাচ্ছে। বাপ্পা ফের বলে, বিয়ের জন্য মেয়ে পেতে আমাদের অসুবিধে হবে না। পশ্চিমবঙ্গে থিকথিক করছে মেয়ে। বাবারা তাদের পার করার জন্য পাগল। কিন্তু প্রাইমারি স্কুল-টিচারের সঙ্গে প্রেম তারা কিছুতেই করবে না। সে যতই সরকারি চাকরি হোক।

তা হলে তো ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের ওপর লোড পড়ে যাবে, একসঙ্গে ক'টা প্রেম করবে তারা? এই প্রশ্নটা রায়নের।

তার মানে এতক্ষণ ধরে দুই বন্ধুর আলোচনা সে মন দিয়ে শুনছিল। উত্তরে বাপ্পা বলে, শুধু স্টুডেন্ট হলেই হল না বাবার টাকায় প্রাইভেট কলেজে পড়ছে কিনা সেটাও দেখে মেয়েরা।

সুগত বলে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার স্টুডেন্ট এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে, কত ধরনের কোর্স হয়েছে ইদানীং। ম্যানেজমেন্ট, আই-টি, ফুড টেকনোলজিস্ট। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া... আমার তো মনে হয় কেমন প্রেমিক পছন্দ করবে এই বিষয়ে কোনও ক্র্যাশ কোর্স ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে কলকাতায়। স্পোকেন ইংলিশের সঙ্গে মেয়েরা এখন ওখানেও ভরতি হচ্ছে। নইলে দেখিস না, আজকাল সে-রকম কোনও কেস শোনা যায় না, বড়লোকের মেয়ে গরিব সৎ ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। আমাদের আগের জেনারেশনে এরকম কত ঘটনা পাড়ায় পাড়ায় আকছার ঘটত।

ছেলেরাও কম যায় না, একটা মেয়ে যেমনই দেখতে শুনতে হোক, একবার যদি দেখে মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল, এস এস সি, পি এস সি-তে চান্স পেয়ে যেতে পারে, চার-পাঁচজন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা বলে রায়ন।

আমরা কেন ঝাঁপালাম না? জানতে চায় সুগত।

রায়ন বলে, আমরা এখনও অপেক্ষায় আছি, মনের মতো একটি মেয়ের বা বলতে পারিস মনগড়া মেয়ের।

রায়নের কথার সুরে কী যেন আছে চোরা বিষাদ। কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যায় তিন বন্ধু। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, এভাবে বাপ্পা বলে ওঠে, রায়ন, তুই কিন্তু মাইরি কায়দা করে আমাদের দলে ঢুকে আসছিস।

BanglaBook.org

মানে? জানতে চায় রায়ন।

বাপ্পা বলে, মেয়েরা তোকে বরাবরই বেশ পছন্দ করে' কলেজে দেখেছি, বহু মেয়ে তোর পিছন পিছন কফি হাউসে গেছে, মেয়েদের মধ্যে তোকে নিয়ে ফিসফিসানি হত। তোর হোয়ার অ্যাবাউটস জানতে অনেক মেয়ে আমার কাছে এসেছে। তারপর ধর...

কথার মাঝে ঢুকে পড়ে সুগত, মনে আছে, মণিদীপার কেসটা? বেশ ক'দিন বাসে করে তোর সঙ্গে ফিরছিল। অথচ ওদিকে ওদের বাড়ি নয়। তুই জিজ্ঞেস করতে, বলেছিল, কলেজ ফেরত অসুস্থ মামাকে দেখতে যেতে হচ্ছে। পরে মণিদীপারই এক বন্ধু এসে আমাদের খবর দিল, মেয়েটা নাকি তোকে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, মামার অসুখ নির্জলা মিথ্যে।

এবার বাপ্পা বলে, এখনও তোর মার্কেট সতেজ। এই তো গত লক্ষ্মীপুজোয় তুই আমাদের বাড়ি ঘুরে গেলি, খুড়তুতো বোন, তারপর পাশের বাড়ির মিতালিকে জবাব দিতে দিতে আমি ক্লান্ত, তুই কোথায় থাকিস, কী করিস, প্রেম করিস কিনা। কোন একটা সিনেমা আর্টিস্টের সঙ্গে তোর মিল খুঁজে পেয়েছে ওরা।

রায়ন মিটিমিটি হাসছে। এই হাসিটাকে বাপ্পা সুগত বলে, বিষাক্ত হাসি। এর পরই এমন কোনও অপ্রত্যাশিত কথা বলবে রায়ন, পুরোপুরি বোল্ড আউট হয়ে যাবে দুই বন্ধু। তবু রায়নের কাছে হারতে মজা লাগে। ওর প্রত্যাঘাতে আন্তরিকতাই বেশি, আক্রোশ তো একদম নেই। সুগত খোঁচায়। কী হল হাসছিস যে বড়, উত্তর দে।

রায়ন বলে, কী বলি বল তো। আসলে মেয়েরা এত চাপা, প্রেম জানানোর আগে এত ভণিতা করে, আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

যাঃ শালা! হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে বাপ্পা।

সুগত বলে, তোর আজ পর্যন্ত কোনও মেয়েকে পছন্দ হয়নি? বলতে ইচ্ছে করেনি, তোমাকে আমি চাই।

হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়ে রায়ন। মনে মনে বলে, না রে, মেয়েদের ভালবাসতে আমি ভীষণ ভয় পাই। অনিশ্চয়তায় ভুগি। আমার খালি মনে হয় যাকে আমি ভালবাসব, সে বেশিদিন আমার কাছে থাকবে না।

BanglaBook.org

চলে যাবে দূরে, ধরাছোঁওয়ার বাইরে। জানি, অসময়ে মা চলে যাওয়াতে এই ভয়টা আমার মনে বাসা বেঁধেছে...

ভাবতে ভাবতে রায়ন শুনতে পায় সুগতর গলা, নারীবর্জিত এই যৌবন কাটাতে তোর লজ্জা করে না, অপমানিত হোস না? ফের হাসে রায়ন। সুগত আবার বলে, এই যে এতটা বড় হয়েছিস, তোর কোনও সেক্স এক্সপেরিয়েন্স নেই?

আছে, অল্পসল্প।

সে ক্ষেত্রে কে এগিয়ে এসেছিল প্রথমে, তুই না মেয়েটা?

সম্ভবত মেয়েটি, আমিও এগিয়ে থাকতে পারি, আসলে ওই ঘটনার মধ্যে কোনও ভালবাসাবাসি ছিল না। একান্তে দুটো শরীর ঘনিষ্ঠ হতেই, একে অপরকে টানছিল। হৃদয় বা মস্তিষ্কের এখানে তেমন কোনও পার্ট নেই।

ঘটনাটা ডিটেলে শোনা যাবে? তাত্ত্বিক অংশটা নয়, এগজ্যাক্ট কী ঘটেছিল?

এখন নয়। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে গল্পটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না। তার থেকে তুই তোর অভিজ্ঞতার কিছু বল।

সুগত বলে, আমার তো হিউজ এক্সপেরিয়েন্স, তোরা অনেকটাই জানিস, আগে বলেছি। এই ট্যুরে স্টক খালি করে দেব। রায়নকে ছেড়ে সুগত এবার বাপ্পাকে নিয়ে পড়ে, হ্যাঁরে বাপ্পা, তোর কিছু গল্প বল।

তক্ষুনি কোনও উত্তর দেয় না বাপ্পা। দু'-চার পা হাঁটার পর বলে, সেক্স নিয়ে আমার কেমন জানি একটা ঘেন্না আছে।

হায় কপাল, সে কী রে। তুই ইমিডিয়েট ডাক্তার দেখা। এসব জিনিস চেপে রাখা...

সুগতর কথা শেষ হতেই ধমক দেয় রায়ন। দাঁড়া না ওকে বলতে দে না আগে।

বাপ্পা বলে, ঘেন্নাটা আগে ছিল না জানিস, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেভেন-এইট থেকে মেয়েদের শরীর নিয়ে আমার ভীষণ কৌতূহল ছিল। ক্লাসের বয়স্ক ডেঁপো ছেলেরা সেক্সের দীক্ষা দিয়ে দিয়েছিল আমাকে। সুযোগ পেলেই মেয়েদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করেছি। দু'-চারটে

BanglaBook.org

চড়-থাপ্পড়, ভর্ৎসনাও জুটেছে। এইভাবে বেশ চলছিল। কলেজ বয়সে এসে এমন একটা ঘটনার সামনে পড়লাম, ঘটনা না বলে দৃশ্য বলাই ভাল। বীভৎস দৃশ্য। তারপর থেকে সেক্স নিয়ে আমার আগ্রহটাই চলে যায়।

শুনি দৃশ্যটা কী ছিল? সুগতর গলায় দ্বিধান্বিত আগ্রহ।

বাপ্পা বলে, ব্যাপারটা খুবই পার্সোনাল। তা ছাড়া তোদের মনেও প্রভাব পড়তে পারে।

পড়বে না। তুই বল। আমরা তো পরোক্ষদর্শী। বলে সুগত।

রায়ন আপত্তি জানায়, ছেড়ে দে না। তেমন সিচুয়েশন হলে ও নিজেই বলবে। জোর করিস না।

একটু দমে যায় সুগত। হাতের লাঠি দিয়ে গলফারের মতো ছোট একটা টুকরোকে হিট করে। পাথরটা ছিটকে ঢুকে যায় জঙ্গলে। এখানে খাদ নেই, রাস্তার দু'পাশেই জঙ্গল। গাছগুলোর হাইট বেশি নয়। রায়নদের মাথা থেকে দু'হাত হয়তো উঁচু।

সুগত বলে, তোরা যখন কিছু বলবিই না, আমি শুরু করি।

না থাক। তোর সেক্স এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে সৌন্দর্যের ভাগ ভীষণ কম। বড্ড ক্লেদাক্ত। এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ওসব আর টেনে আনিস না।

রায়নের কথার পিঠে সুগত বলে, তুই কি আমায় গালাগাল দিলি?

বাপ্পা বলে, এটাও তোর একটা মস্ত সুবিধে। গালাগালটা ঠিক বুঝতে পারিস না।

ধুস শালা, সামনের দু'ঘণ্টা আমি তোদের সঙ্গে কোনও কথাই... বলতে বলতে থেমে যায় সুগত, খুব কাছাকাছি কোনও গাড়ির শব্দ। বাপ্পা রায়নও শুনতে পেয়েছে। রাস্তার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকায় তিনজন। একটু পরেই জিপের মুখ দেখা যায়। রায়ন বলে, চ চ দাঁড়াস না, পা চালা।

কাদের গাড়ি বল তো? অনিমেষদাদের জিপটা তো সবজেটে ছিল।

বাপ্পার কথার ওপর দিয়ে জিপটা ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

অনিমেষ বেরিয়ে আসে পিছন থেকে। সুগতদের উদ্দেশে বলে, ঠিক আছ তো তোমরা, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?

বাপ্পা সুগত সহর্ষে বলে ওঠে, একদম ঠিক আছি। ফাইন!

অনিমেষ নেমে আসছে জিপ থেকে, ওর গলায় ক্যামেরা ঝুলতে দেখে বাপ্পা চাপা স্বরে সুগতকে বলে, তোর ক্যামেরাটা কি ব্যাগ ভারী করার জন্য নিয়ে এসেছিস, এখনও বার করলি না।

কথায় কথায় একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া, একটু পরে বার করছি।

অনিমেষ এসে দাঁড়ায় তিনজনের সামনে। বলে, গাড়িতে যাওয়া কিছু কম কষ্টের নয়, যা রাস্তা! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোনটা বেশি কোনটা কম। হেঁটে না গাড়িতে?

আমাদের সঙ্গে মাইলখানেক হেঁটে দেখতে পারেন। বলে সুগত।

না বাবা, দরকার নেই। বলে, অনিমেষ রায়নের দিকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মন্তব্য করে, তোমাদের এই বন্ধুটিকে তো বেশ ক্লান্তই লাগছে।

ওকে একটু ক্লান্ত টাইপের দেখতে।

বাপ্পার এই কথার কোনও মানে করতে পারে না রায়ন, তার চোখ বারেবারে চলে যাচ্ছে জিপের দিকে, অবশেষে ভদ্রমহিলা নেমে এলেন। চোখে সানগ্লাস পরেছেন এখন, কী ভীষণ অহংকারী লাগছে।

মহিলা এগিয়ে আসছেন রায়নদের দিকেই, দৃষ্টি সরিয়ে নেয় রায়ন। অনিমেষ বলছে, জিপে বসে থাকলে ক্লাইমেটটা ঠিক বোঝা যায় না। বাইরে এসেছি, কী ফার্স্টক্লাস লাগছে এখন।

পৃথা এসে দাড়িয়েছে সামনে। সুগতকে বেছে নিয়ে জানতে চায়, আচ্ছা, আপনারা বলতে পারবেন, আমরা এখন ঠিক কত হাজার ফুট ওপরে।

আমি পারব না। বাপ্পা জানে। বল পাস করে দেয় সুগত।

বাপ্পা ঠোঁট উলটে কপাল কুঁচকে ভাবতে থাকে। একটু পরে মাথা তুলে পৃথার বদলে অনিমেষকে বলে, আপনারা লাস্ট মাইল স্টোন কী দেখেছেন, মেঘমা কত দূর?

রায়ন আন্দাজ করতে পারে বাপ্পা কেন প্রশ্নটা মহিলাকে করে উঠতে পারল না, ঝাঁঝালো রূপটার সঙ্গে ঠিক চোখ সওয়াতে পারছে না।

BanglaBook.org

মহিলা উত্তর দেন, শেষ মাইল স্টোনে কী লেখা ছিল পড়া যায়নি। তবে আমাদের ড্রাইভার নিশ্চয়ই বলতে পারবে মেঘমা আসতে কতটা বাকি।

বাপ্পা এবার মহিলার দিকে তাকায়। বলে, মেঘমা এলে বুঝবেন সাড়ে ন'হাজার ফুট ওপরে উঠেছেন।

আর সান্দাকফু? জানতে চান মহিলা।

বারো হাজার ফুট।

বাপ্পার কথা শুনে ভদ্রমহিলার বদলে অনিমেষদা চমকায়, ও মাই গুডনেস, বারো হাজার ফুট।

অনিমেষদা মহিলার দিকে তাকিয়ে বলেন, এত হাইট তুমি তো আমায় বলোনি পৃথা। আমাদের বিয়ের আগে একবার রোটাংপাস গিয়েছিলাম। প্রায় দশ হাজার ফুট, সেখানে আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কষ্ট হলে বোলো, আর উঠব না আমরা। খুবই নির্বিকারভাবে কথাটা বললেন মহিলা। ওদের কথোপকথন থেকে দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তিন বন্ধু, এরা স্বামী-স্ত্রী। দুই, হঠাৎই ঠিক করেছে সান্দাকফু যাবে। কোনও হোমওয়ার্ক করেনি। আর একটা জিনিস পুনরুদ্ধার হয়, ভদ্রমহিলার নাম পৃথা। আগেরবার যখন দেখা হয়েছিল, ওই নামে ডেকেছিল অনিমেষদা, নামটা মাথায় স্থায়ী হয়নি।

বাপ্পা আশ্বস্ত করতে লেগেছে অনিমেষদাকে, শ্বাসকষ্ট হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে, এক হচ্ছে ক্লাইমেট, খুব ঠান্ডা আর ফগি ওয়েদার হলে কষ্টটা হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে, আপনি দুম করে হাই অলটিচিউটে উঠে পড়ছেন কিনা। রোটাংয়ে নিশ্চয়ই সেই ভুলটাই করেছিলেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা মানালি থেকে একদিনেই রোটাং গিয়েছিলাম। আমাদের গ্রুপের আমি আর একজন ছাড়া বাকিদের কোনও কষ্ট হয়নি।

হয়েছে, কম-বেশি। মুখ ফুটে বলেনি। পাহাড় বিশেষজ্ঞর মতো বলে বাপ্পা। অথচ জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে উঠছে। বাপ্পার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে পৃথা, অনিমেষ। সুগত রায়ন চোখাচোখি করে

BanglaBook.org

কৌতুক ভাগ করে। বাপ্পা ফের বলে, আজ রাতটা আপনারা স্টে করছেন কোথায়?

অনিমেষ বলে, তুমলিং বলে ট্রেকার্সহাট আছে নাকি সামনে? ড্রাইভার বলছিল আমরা ইচ্ছে করলে সেখানে থাকতে পারি। আর যদি মনে করি আজই সান্দাকফু চলে যাব, ড্রাইভার তাতেও রাজি।

খবরদার সে ভুলটা করবেন না। একটা রাত শরীরকে হাই অলটিচিউটে সইয়ে নিলে, বারো হাজারে আপনার কষ্ট হবে না।

বাধ্য ছাত্রর মতো বাপ্পার কথা মেনে নেয় অনিমেষ। বলে, সেই ভাল। আজ রাতটা তুমলিংয়ে কাটিয়ে কাল আবার বেরোব।

পৃথার মুখ ভাবলেশহীন। বাপ্পা টের পায় প্রস্তাবটা তেমন পছন্দ হয়নি মহিলার। শিয়োর হয়ে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাস করে, কী বউদি, সেটাই ভাল হবে না?

পৃথা বলে, আমার একটু অন্য রকম ইচ্ছে ছিল। হাতে মাত্র তিনটে দিন। যেরকম মেঘলা ওয়েদার, ড্রাইভার বলছিল, তুমলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না ধরে নেওয়া যায়। সান্দাকফুর হাইট যেহেতু বেশি, তিনদিনের একদিন নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ওখানে আরও অনেক পিক দেখতে পাওয়া যায়, নন্দাদেবী, থ্রি-সিস্টার, নরসিম, পাণ্ডিম...

কথার মাঝে রায়ন বলে ওঠে, দেখুন পৃথাদি, মেন তো কাঞ্চনজঙ্ঘা, সে যদি আপনার ভাগ্যে থাকে, তুমলিংয়ে বসেও দেখতে পাবেন। আর যদি কপালে না থাকে, সাতদিন সান্দাকফুতে বসে থাকলেও দেখতে পাবেন না।

সানগ্লাস চোখ থেকে খুলে রায়নের দিকে সরাসরি তাকায় পৃথা। বলে, ভাগ্য কপাল এসবে আমি বিশ্বাস করি না। গুরুত্ব দিই সম্ভবনার ওপর।

রায়ন পুরো ফিউজ। সুগত বাপ্পাও অস্বস্তিতে পড়েছে রায়নকে হেনস্তা হতে দেখে। পরিস্থিতি সহজ করতে উদ্যোগ নেয় অনিমেষ। বলে, তোমরা আজ রাতে কোথায় থাকছ?

উত্তর দেওয়ার আগে বাপ্পা দুই বন্ধুর মুখ দেখে নেয়, তার যেচে পরামর্শ দেওয়ার বদলে অপমানিত হল রায়ন। আর কি অনিমেষদাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে আলাপ চালানো ঠিক হবে? দায়সারাভাবে বাপ্পা বলে, আমরা থাকব টংলু।

সেটা কোথায়? জানতে চায় অনিমেষ।

তুমলিংয়ের একটু আগে, সাড়ে পাঁচশো ফুট ওপরে।

বাঃ কী সুন্দর নাম। টংলু, তুমলিং যেন রূপকথার ভাইবোন। টংলু জায়গাটা নিশ্চয়ই তুমলিংয়ের থেকে ভাল, হাইট বেশি, সিনিক বিউটি অবশ্যই বেটার হবে। সিনসিনারি দেখেই স্পট ঠিক হয় পাহাড়ে। একটু থেমে অনিমেষ বলে, আচ্ছা, টংলুতে থাকতে পারি না আমরা?

না, গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নেই। পুরোটাই ট্রেক করতে হবে। বলে বাপ্পা।

আপশোসের সুরে অনিমেষ বলে, ইস, যেতে পারলে কত ভাল হত, বেশ কিছু ছবি তুলতে পারতাম...

পৃথার একটা ব্যাপার ভাল লাগে, ছেলেগুলোর সঙ্গে বেশ জমে গেছে অনিমেষ, সারা রাস্তা যেরকম ব্যাজার মেরে ছিল, অসম বয়সি হলেও সঙ্গী তো পেয়েছে। ওরা এখন ক্যামেরা, ছবি এসব নিয়ে কথা বলছে। ইতিমধ্যে সানগ্লাস চোখে দিয়েছে পৃথা। কালো কাচের আড়াল থেকে লক্ষ করছে চশমা পরা ছেলেটাকে। একটু দমে আছে সে। পৃথার ওভাবে ফুঁসে ওঠা উচিত হয়নি। ছেলেটা সংস্কার থেকে নয়, অভ্যেসবশত ভাগ্য, কপালের কথা বলেছিল, পৃথা মিছিমিছি ওকে আঘাত করল। বেচারির মুডটাই হয়তো খারাপ হয়ে গেছে। উলটোদিক থেকে ছেলেটা পৃথার মেজাজ ভাল করে দিয়েছে ছোট্ট একটা সম্বোধনে, পৃথাদি! ডাকটা এখনও কানে লেগে আছে। বাকি দুটো ছেলে 'বউদি' বলছে, সেটাই স্বাভাবিক, পৃথার ভাল না লাগলেও। চশমা পরা ছেলেটা কেন ডেকে উঠল, 'পৃথাদি' বলে! সচেতনভাবেই কি সম্বোধনটা করল? অনিমেষের সঙ্গে পৃথার সম্পর্কটা যে বেশ খারাপ পর্যায়, ছেলেটা বোধহয় টের পেয়েছে, অথচ ছেলেটা হাবেভাবে খুবই উদাসীন।

বউদি, আপনি একটু দাদার পাশে দাঁড়ান, একটা ছবি তুলে দিই।

হুঁশ ফেরে পৃথার। কথাটা তাকেই বলা হয়েছে। যে-ছেলেটি বলেছে, তার হাতে অনিমেষের ক্যামেরা। অনিমেষ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে,

BanglaBook.org

সত্যিই পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে নাকি? অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে পৃথা বলে, আমাদের আবার ছবি তোলার কী দরকার! একসঙ্গে অনেক ফোটো আছে আমাদের।

তবু এই ল্যান্ডস্কেপে দাঁড়িয়ে, একটা স্মৃতি থেকে যাবে। আমরা তুলে না দিলে আর হয়তো চান্স পাবেন না পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তোলার।

পৃথা শেষ চেষ্টা করে সিচুয়েশনটা এড়াতে। বলে, কেন, আমাদের ড্রাইভার আছে।

অনিমেষ পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছেলেটা চোখে ক্যামেরা দিয়ে বলছে, ড্রাইভারের তোলা ছবির কোনও শিয়োরিটি নেই। ছবি প্রিন্ট করানোর পর দেখবেন নির্ঘাত কাঁপিয়েছে। বেশির ভাগ ট্যুরিস্টের এই এক্সপেরিয়েন্স হয়। আসলে স্টিয়ারিং ঘোরানো হাত তো। ক্যামেরাও... দাদা, বউদির কাঁধে হাতটা দিন।

ছেলেটার ডিরেকশন শুনে রীতিমতো শঙ্কিত হয় পৃথা। অনিমেষ নির্দ্বিধায় পৃথার কাঁধে হাত রাখে। শেষ কবে শরীর ছুঁয়েছিল মনে পড়ে না পৃথার।

বউদি, চশমাটা থাকবে, না খুলবেন?

না, থাক। বলে পৃথা।

আচ্ছা থাকুক। একটু হাসুন প্লিজ। বউদি আপনাকে বলছি।

পৃথা হাসার চেষ্টাও করে না। ছেলেটা আবার বলে, কী হল বউদি, অত গম্ভীর হয়ে থাকলে চলবে! দাদা কত রিল্যাক্সড...

অনিমেষ বলে ওঠে, তুলে নাও ভাই, পৃথার মুখে হাসি দেখতে পাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্যাখার মতোই অনিশ্চিত।

শার্টার পড়ে। ছেলেটি ক্যামেরা নামিয়ে নিলে, পৃথা সরে আসে অনিমেষের পাশ থেকে। একা একা হেঁটে যায় বেশ খানিকটা। এখান থেকে দূরের দৃশ্য ভাল দেখা যাচ্ছে না, জায়গাটা বোধহয় ঢালু। নীল আকাশটা ঝুড়ির মতো চাপা দিয়ে রেখেছে পৃথাদের। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলটা পাতলা, গাছের পাতা ততটা সবুজ নয়, ধূসর। জঙ্গল না বলে ঝোপঝাড় বলাই ভাল। কেমন একটা রুক্ষ ভাব আছে এই জায়গাটায়।

অনিমেষের শেষ কথাটায় মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে পৃথার,

BanglaBook.org

কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই বিরল নাকি পৃথার হাসি। ছেলেগুলোকে দলে টেনে ইচ্ছেমতো কটাক্ষ করে যাচ্ছে অনিমেষ। ছেলেগুলো তো জানে না, অনিমেষ পাশে থাকলেই হাসি আসে না পৃথার। বিশেষ করে ছবি তোলার সময়। মনে পড়ে যায় হনিমুন থেকে ঘুরে আসার পরের ঘটনা, অনেক ছবি তুলেছিল অনিমেষ, সমুদ্রের সামনে পৃথা, বালির ওপর শুয়ে, মন্দিরের দালানে, হাইওয়েতে দাঁড়ানো গাড়িতে ঠেস দিয়ে। শাড়ি, সালোয়াড়-কামিজ, জিন্‌স, নানান ড্রেস করেছিল।

বেড়িয়ে ফিরে ছবিগুলো যেদিন প্রিন্ট করে আনল অনিমেষ, নিজেদের ঘরে বসে তারিয়ে তারিয়ে ছবি দেখল দু'জনে। সদ্য অতীত রোমন্থন করল। অনিমেষ বলেছিল, তুমি ক্যামেরার সামনে দারুণ ফ্রি থাকো। সব ছবিতেই কী সুন্দর হাসছ। এটা অনেকেই পারে না।

পৃথা মজা করে বলেছিল, তুমিই বিয়ে বিয়ে করে আমার কেরিয়ারটা নষ্ট করলে। খুব ইচ্ছে ছিল সিনেমা-টিভিতে অভিনয় করার।

কথা শুনে খুব হেসেছিল অনিমেষ। বলেছিল, সেকী, বিয়ের কথা হয়ে যাওয়ার পরও তো আমি দু'বছর ওয়েট করলাম, চাকরি পেলে তবেই তুমি বিয়ে করবে। কই, তখন তো টালিগঞ্জের দিকে যেতে দেখিনি। গেলে হয়তো দু'বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হত না।

সন্ধেটা বেশ হাসি-মজায় কাটছিল, গোলমালটা বাধল পৃথা যখন বলল, যাই, ছবিগুলো মা-বাবাকে দেখিয়ে আসি।

ঝপ করে মেজাজ বদলে গেল অনিমেষের, না, দেখাতে হবে না।

পৃথা আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, কেন? মা আমাকে বলেছেন, তোমাদের ছবিগুলো এলে আমাকে দেখিয়ো।

তা বলে, তোমার নাইটি পরা ছবিগুলো মাকে দেখাবে!

ঠিক আছে, মাত্র দুটো ছবি, সে নয় আমি সরিয়ে রাখছি।

তাতেও রাজি নয় অনিমেষ। বলেছিল, জিন্‌স, সালোয়ার-কামিজ পরা ছবিগুলো দেখাতে হবে না, মা অসন্তুষ্ট হবে, বাবাকেও হয়তো দেখাবে।

কেন, অসন্তুষ্ট হবেন কেন?

সে তুমি ভাল করেই জানো পৃথা, দেখেছ তো বাবা-মা একটু পুরনো

BanglaBook.org

বিশ্বাসের মানুষ, বাড়ির বউ শাড়ি ছাড়া ওইসব ড্রেস পরলে, ঠিক মেনে নিতে পারবে না।

চকিতে পৃথার মনে পড়েছিল, বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে প্রথম যেদিন ম্যাক্সি পরে সংসারের কাজ করছিল, শাশুড়ি খুব মিষ্টি করেই বললেন, তুমি মা শাড়ি পরে এসো, তোমার শ্বশুর ম্যাক্সি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তখন পৃথার মনে হয়েছিল, সেটা ছিল বোধহয় বিশেষ কোনও অপছন্দের ব্যাপার। ম্যাক্সি বদলে শাড়ি পরে এসেছিল পৃথা। ভুল ভাঙল অনিমেষের আচরণে, হনিমুনের ছবি সে কিছুতেই মা-বাবাকে দেখাতে দেবে না। পৃথা বোঝানোর মতো করেই বলেছিল, পোশাকগুলো খারাপ নয়। বরং শাড়ির থেকেও অনেক বেশি ঢাকাঢুকো দেওয়া। এই পোশাক এখন সবাই পরছে, মা-বাবার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, টিভিতেও দেখছেন সর্বক্ষণ।

টিভির বউ আর বাড়ির বউয়ের মধ্যে অনেক তফাত। বলেছিল অনিমেষ।

সঙ্গেসঙ্গে পৃথা জবাব দেয়, হ্যাঁ, তফাত একটাই, টিভির বউটাকে ইচ্ছেমতো চালনা করা যাবে না, বাড়ির বউকে যা বলবে, শুনতে হবে।

কোন কথার কী মানে করছ পৃথা! একটু যেন অসহায় কণ্ঠে বলেছিল অনিমেষ।

পৃথার মাথায় তখন রাগ চড়ে গেছে, চেতনায় স্পর্শ করেনি অনিমেষের আর্তি, ছবিগুলো জড়ো করতে করতে বলেছিল, আমি এখনই মাকে এগুলো দেখাব, যদি বিরূপ কোনও মন্তব্য করেন, ভাল করে বোঝাব। ওঁর ভুল ভাঙিয়ে দেওয়াটাও আমার কর্তব্য।

বিছানা থেকে প্রায় নেমেই গিয়েছিল পৃথা, অনিমেষ ঝট করে হাতটা ধরে নেয়। বলে, না তুমি যাবে না।

সামান্য ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়ে পৃথা টের পায় বেশ জোরেই ধরেছে অনিমেষ।

কী হল, ছাড়ো। বলে পৃথাও জোর খাটায় এবং বুঝতে পারে অনিমেষ পুরো শক্তি প্রয়োগ করেছে, পুরুষ হওয়ার সুবিধে।

নিস্তেজ হয়ে পড়ে পৃথা। যতটা না শারীরিক কষ্টে, তার থেকে বেশি

BanglaBook.org

অপমানে। চোখের জল দেখে অনিমেষ হাত ছাড়ে। ঝাপসা দৃষ্টিতে পৃথা দেখে বাহুতে দগদগ করছে অনিমেষের আঙুলের ছাপ।

সেই সন্ধেতে অনিমেষের সঙ্গে আর কোনও কথা বলেনি পৃথা। রাতে শোওয়ার পর রাগ ভাঙাতে এল অনিমেষ, কথা দিয়ে নয় আদরে, সে কী বিপুল আকুতি, পৃথাকে ওলটপালট করে খুঁজছিল, শরীরের কোনখানে বাসা বেঁধে আছে অভিমান। পৃথা ছিল নির্বিকার, অনিমেষকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেনি, নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, আমি যখন হেরেই যাব, গায়ের জোর খাটিয়ে কী লাভ।

অব্যক্ত সংকেত অনুধাবন করেনি অনিমেষ, বরফ গলছে না দেখে ভেবেছিল বুঝি মিলনেই উষ্ণতা ফিরিয়ে দেবে। নিঃসাড় মিলন-অভিজ্ঞতা হয়েছিল পৃথার। যেন মোমবাতির আগুনে আঙুল রেখেছে, এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।

অনিমেষের আঙুলের ছাপটা বাহু থেকে মিলিয়ে গেলেও অপমান রয়ে গেছে এখনও। তার পরেও অবশ্য গ্লানির প্রলেপ পড়েছে অনেক।

পাহাড়পথের অমলিন আলোয় পৃথা তার বাহুতে খোঁজে সেই দিনের দাগ। হঠাৎ পিছনে হাসি-হুল্লোড়ের শব্দ। চটক ভেঙে ঘুরে দাঁড়ায় পৃথা। অনিমেষ আর ছেলে তিনটে নিজেদের মধ্যে হাসি-আড্ডা জমিয়েছে। ওদের যেন খেয়ালই নেই আরও অনেকটা পথ যেতে হবে।

পৃথা হাঁটা দেয় জিপ লক্ষ করে, যদি ওকে দেখে সংবিৎ ফেরে অনিমেষদের।

নিজের সিটে গিয়ে বসেছে পৃথা, ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না। অনিমেষরা ফিরে আসে গাড়ির কাছে। ওদের কথা যেন শেষই হচ্ছে না।

পৃথার সিট বরাবর গেটের সামনে দাঁড়ায় অনিমেষ। কপালে ভাঁজ পড়ে পৃথার, অনিমেষ কি এখানে বসবে? পরমুহূর্তে পৃথার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়। গলায় প্রগলভতা এনে অনিমেষ পৃথার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তুমি ওদের একটু বলো না আমাদের সঙ্গে যেতে। মিছিমিছি কষ্ট করছে ওরা।

অনিমেষের একটা আপ্রাণ চেষ্টা থাকে, নিজেদের সম্পর্কের গরমিলটা বাইরের লোককে বুঝতে না দেওয়ার। অভিনয় চালিয়ে

BanglaBook.org

যায় পৃথার সঙ্গে। পৃথা সাধারণত সেই নাটকে যোগ দেয় না। এখন দিল।

গেটের কাছে এগিয়ে এসে ছেলে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিকই তো, গাড়ি যখন আছেই, এক্সট্রা পয়সাও লাগছে না, খামোকা কষ্ট করতে যাবে কেন!— একটু থেমে পৃথা বলে, আমি কিন্তু 'তুমি' করেই বলছি।

বাপ্পা, সুগত সমস্বরে বলে ওঠে, না না এটাই তো ঠিক আছে। তুমি করেই বলুন।

পৃথা ফের বলে, তোমাদের সঙ্গে আলাপটা যখন জমেই গেছে, বাকি রাস্তাটা গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে।

বাপ্পা সুগতর অভিব্যক্তিতে নিমরাজি ভাব। রায়ন আগের মতোই আপত্তি জানায়, না পৃথাদি, হেঁটে ওঠার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাই না। ইটস এ গ্রেট ফিলিং।

তা হলে কিছুটা চলো। বলে পৃথা।

অনিমেষ চটজলদি সমর্থন করে, হ্যাঁ, অন্তত মেঘমা পর্যন্ত।

আরামটা পেয়ে বসতে পারে, পরে আর হাঁটতে ইচ্ছে করবে না। যুক্তি দেয় রায়ন।

অনিমেষ বলে, হাঁটবে না, পুরোটাই আমাদের সঙ্গে যাবে।

রায়ন আর কোনও তর্কে যায় না। সুগত বাপ্পার বিশেষণ দেওয়া বিষাক্ত হাসিটা হাসে। যাতে স্পষ্ট হয় প্রত্যাখ্যান।

পৃথা এবার অন্য পথ ধরে, রায়নকে বলে, বাই-দ্য-বাই, তোমার 'পৃথাদি' ডাকটা আমার বেশ লেগেছে। ওই নামে ডাকার মতো পরিচিত কেউ নেই আমার। তোমরা 'পৃথাদি' বলেই ডেকো।

প্রশংসাটা অপ্রত্যাশিত, লাজুক হেসে মুখ নামিয়ে নিয়েছে রায়ন। রাশ আলগা পড়েছে বুঝে বাপ্পা সুগত বলে, চ না রায়ন, ওঁরা যখন অত করে বলছেন।

রায়ন নড়ে না। বড্ড গোঁ। পৃথা বলে, বুঝেছি, রায়ন ভয় পাচ্ছে ব্ল্যাকমেলিংয়ের।

বুঝতে না পেরে পৃথার দিকে তাকায় সবাই। পৃথা বুঝিয়ে দেয়, রায়ন

BanglaBook.org

ভাবছে, কলকাতায় গিয়ে ওর বন্ধু-বান্ধবদের আমরা বলে দেব গাড়িতে সান্দাকফু গেছে। ফলস পজিশনে পড়ে যাবে বেচারা। বড় মুখ করে সবার কাছে বলে এসেছে, ট্রেক করে পাহাড়ে উঠব।

রায়ন বেশ অবাক হয়েই পৃথার দিকে তাকায়, মহিলার মধ্যে এত উইট আছে, আগে বোঝা যায়নি। কেমন যেন হেডদিদিমণি ভাব বজায় রেখেছিলেন।

রায়ন প্রায় প্রতিরোধহীন হয়ে পড়েছে, সময় নষ্ট করে না অনিমেষ, হাত টেনে বলে ওঠে, চলো, চলো, বাকি কথা গাড়িতে বসে হবে।

সুগত বাপ্পা ঠিক এরকমই একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল, ওরাই সব থেকে প্রথমে উঠে পড়ে গাড়ির পিছনে। বাধ্যত অনিমেষের সঙ্গে রায়নকে উঠতেই হয়।

কিন্তু আসল লোকটাই তো নেই, ড্রাইভার। অনিমেষ বলে, কোথায় গেল রে বাবা।

তখনই পৃথা দেখতে পায় সামনের জঙ্গল থেকে কাঠের টুকরো আর কাটারি নিয়ে বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার।

অনিমেষ পিছন থেকে ফুট কাটে, দেখেছ, কী কাজের লোক, সুযোগ বুঝে সংসারের কুটোটি জোগাড় করে রাখল।

ড্রাইভার সামনে আসতেই পৃথা বলে, কী কাঠ গো?

চন্দন টাইপ কা। জ্বালানে সে বহুত সুন্দর বাস আতা হ্যায়।

দেখি, দেখি! বলে, কাঠটা হাতে নেয় পৃথা। কাঠটার রং মেটে সিঁদুর। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকে পৃথা, তেমন কোনও সুগন্ধ নেই, সাধারণ কাঠের মতোই। পৃথা বলে, কই, কোনও গন্ধ নেই তো!

ড্রাইভার বলে, আভি মালুম নেহি পড়ে গা, জ্বালানে হোগা।

তোমরা এই কাঠ নিয়ে কী করো? ফের জিজ্ঞেস করে পৃথা।

কুছ নেহি, চুলা মে দেতা হুঁ, খানা ভি পাকতা হ্যায়, মহকতা হ্যায় ঘর।

বিষাদে মনটা ছেয়ে যায় পৃথার, মেটে সিঁদুর কাঠটাকে এখানকার কোনও গ্রামের বউ বলে মনে হয়। রান্নার অনুষঙ্গ আসতে এমনটা বোধ হল।

সিটের গদি তুলে কাঠ কাটারি রাখে ড্রাইভার। পিছনের সিটে লোক

BanglaBook.org

বেড়ে গেছে দেখে খুশি হয়। বলে, আচ্ছাই হুয়া, বাবুকা আভি উতনা জার্কিং নেহি লাগে গা।

সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। গাড়ি চলতে শুরু করে সেই একরকমভাবে, লাফাতে লাফাতে। অনিমেষ ছেলেগুলোকে বলে, এটাও তো এক ধরনের এক্সপেরিয়েন্স নাকি?

ছেলে তিনজন কী উত্তর দিল, শুনতে পায় না পৃথা। গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে যায় ওদের গলা।

আধঘণ্টার মধ্যেই ঢালু জায়গা ছেড়ে চড়াই রাস্তা ধরল গাড়ি। প্রকৃতির রূপ বদলে গেল আবার। রাস্তার দু'পাশে এখন বড় বড় গাছ, নিবিড় বনগন্ধ, আবছা আলো চারপাশে।

বেশ ঠান্ডা লাগছে এখানে এসে। একটা কার্ডিগানে পৃথার এতক্ষণ চলে যাচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে শালটা গায়ে দিতে পারলে ভাল হত। শাল আছে পৃথার ব্যাগে, যেটা এখন অনিমেষদের পায়ের কাছে। বার করে দিতে বলতে হবে অনিমেষকে, ইচ্ছে করছে না। শাড়ির আঁচলটা কানে গলায় জড়িয়ে নেয় পৃথা।

কী পৃথাদি ঠান্ডা লাগছে?

পৃথা হাসে। হাসিটা ঠান্ডায় কেঁপে যায়। এখন যে পৃথাদি বলে ডাকল, সে চশমা-পরা ছেলেটা নয়। এ হচ্ছে সুগত। এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনে পৃথা ওদের গলা চিনে গেছে, জেনেছে নামও। পিছন সিট থেকে সুগত আবার বলে, আমাদেরও বেশ ঠান্ডা লাগছে জানেন, হাঁটছিলাম তো, টের পাইনি ঠান্ডা।

এবার অনিমেষের গলা পাওয়া যায়, দেখো। ঠান্ডাটা আবার ছুতো নয় তো? গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার ফিকির।

না, না, আমি ঠিক আছি, রায়নটাকে নিয়েই চিন্তা, কখন যে বেঁকে বসবে।

সুগতর পর বাপ্পা বলে, অথচ দেখুন অনিমেষদা, আমাদের তিনজনের মধ্যে রায়নই কমজোরি, মন শরীর দুটোতেই। ট্রেকিংয়ের শুরুতে আমাদের কাছে যখন জল ছিল না, সব থেকে নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল রায়ন। জলের থেকে ওকে নিয়ে বেশি টেনশন হচ্ছিল আমাদের। এখন

BanglaBook.org

দেখুন, গাড়িতে যাচ্ছে বলে কেমন ব্যাজার মুখে বসে আছে, যেন আদর্শচ্যুত সন্ন্যাসী।

কথাটা শুনে রায়নের কী রি-অ্যাকশন হল, দেখতে ইচ্ছে হয় পৃথার। সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। ছেলেটা মিটিমিটি হেসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পিছিয়ে যাচ্ছে ঝিমানো আলোর জঙ্গল, যার গভীরে ঢুকে গেছে আঁকাবাঁকা রাস্তা।

প্রকৃতিকে নির্জনতা ফেরত দিতে দিতে চলেছে পৃথারা। এই তিনটে ছেলে যখন পৃথাদের সঙ্গ ছেড়ে দেবে, প্রকৃতির মতোই নির্জন হয়ে যাবে পৃথা। যদিও নিরালায় থাকতে চেয়ে পৃথা এই রুটটা বেছেছে। প্রকৃতপক্ষে সে স্বভাব-উচ্ছল মেয়ে। স্কুল-কলেজে তার দুরন্তপনার সঙ্গে তাল রাখতে পারত না বন্ধুরা। এই ছেলেগুলোর আচরণে, কথায়, মজায় সেই তারুণ্যের স্বাদ ফিরে পাচ্ছে পৃথা। এদের খুব বন্ধু মনে হচ্ছে। একথা কী করে বোঝাবে তিনজনকে? এমনিতেই পৃথা ওদের থেকে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। তারপর কথায় কথায় ওরা জেনে গেছে পৃথা কলেজে পড়ায়। তখনই ওদের মুখে স্পষ্ট সম্ভ্রম দেখেছিল। কলেজবেলার স্মৃতি এখনও ওদের ফিকে হয়নি।

পড়াতে ভালই লাগে পৃথার। যেচে এই প্রফেশনে এসেছে। মুশকিল একটাই, যতই সে স্টুডেন্টদের সঙ্গে ফ্রি হওয়ার চেষ্টা করুক, ওরা দূরত্ব বজায় রাখেই। কলেজের অন্য স্টাফের মুখে পৃথা শুনেছে, স্টুডেন্টরা নাকি বলাবলি করে পি. সি-র হেভি পার্সোনালিটি। জ্ঞানও ব্যাপক, দাঁত ফোটানো যায় না। 'দাঁত ফোটানো' মানে কেওস করে ক্লাস বানচাল করা। না, সেটা ওরা পারে না। ফ্রেশাররা প্রথম দিকে ক'দিন চেষ্টা করে, অচিরে বশীভূত হয়ে যায়। একশো ষাট-পঁয়ষট্টি জনের ক্লাস একেবারে সাইলেন্ট করে রাখে পৃথা। সে শিয়োর, লাস্ট বেঞ্চের কোনায় বসা স্টুডেন্ট পর্যন্ত তার পড়ানো মন দিয়ে শুনছে।

চাকরির গোড়ার দিকে পৃথা একদিন লেকচার দিতে দিতে খেয়াল করে, ক্লাসরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্সিপাল। প্রথমটা ভেবেছিল প্রিন্সিপালরা যেমন দেখতে বেরোন, কে কেমন ক্লাস নিচ্ছে, সেরকমই সাধারণ টহলদারি, উনি কিন্তু সরছিলেন না দরজা থেকে।

BanglaBook.org

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নেমে এসেছিল পৃথা। প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বলে, কিছু বলবেন স্যার?

জ্বলজ্বল করছিল প্রিন্সিপালের চোখ, সংযত উচ্ছ্বাস সহ বললেন, ক্লাসরুম থেকে কোনও আওয়াজ পাচ্ছি না, ভাবলাম বুঝি কিছু গণ্ডগোল হল, এসে দেখি এই কাণ্ড!— ভাল, ভাল। তোমার ক্লাসের ডিসিপ্লিন অবশ্যই অন্য ক্লাসে প্রভাব ফেলবে। লেকচারাররা সিনসিয়ার হবেন।

কতটা কী হয়েছে জানে না পৃথা। ক্লাসের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সে খুবই মেলামেশা করে, তবু 'গম্ভীর' বদনাম ঘোচে না। এমন নয় তো, শ্বশুরবাড়ির গুমসানি পরিবেশের ছায়া কলেজে এসেও সরে না পৃথার মুখ থেকে?

বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়িকে ভোলার চেষ্টা করে পৃথা। যেমন, বাপেরবাড়ি গেলে একটু বেশিই হইচই বাধিয়ে দেয়। এই তো মাস কয়েক আগে বাড়ি গিয়ে দেখে, কাকার বাড়িতে খুড়তুতো বোনেরা এসেছে। উপলক্ষ জামাইষষ্ঠী। জামাই দু'জন আসবে পরের দিন। বড়বোনের একটা ছেলে পাঁচ বছরের, ছোট বোনের মেয়ে, বয়স তিন। দুপুরবেলা পৃথা হুজুগ তুলল, চল, সবাই মিলে গঙ্গায় চান করে আসি।

পৃথাদের বাড়ি থেকে গলি ধরে গেলে গঙ্গার ঘাট চার মিনিট। জেঠুর তত্ত্বাবধানে ছোটবেলায় সব ভাইবোন মিলে গঙ্গাস্নান করত। সবাইকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়েছিল জেঠু। বড় বয়সে পৃথার প্রস্তাব শুনে খুড়তুতো দুই বোন পিছিয়ে যায়। বলে, না বাবা, বয়স হয়ে গেছে, কতদিন সাঁতার কাটিনি, ভেসে গেলে কে দেখবে?

আমি দেখব। চল তো তোরা। বাচ্চাগুলো মজা পাবে।

প্রায় জোর করে ওদের গঙ্গায় নিয়ে গিয়েছিল পৃথা। খুব মজা হয়েছে সেদিন। বাচ্চা দুটো দেখল, তাদের মা-মাসিরা কেমন ছোটদের মতন জলে দাপাদাপি করছে।

ফেরার সময় বোন দুটো বারবার বলছিল, তুই হুজুগ তুললি বলেই এত আনন্দ করতে পারলাম। বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে মনে হয় সেসব দিন কোথায় চলে গেছে...

BanglaBook.org

ঘরে এসে পৃথা যখন ভেজা শাড়ি বদলাচ্ছে, মা বলল, তুই সেই আগের মতোই রয়ে গেলি। বয়স বাড়ল না তোর।

মায়ের কথার সুরে এক চিলতে পরিতাপের ছোঁয়া ছিল। কেন, সেটা জানতে পৃথা বলেছিল, বয়স না বাড়া তো ভাল।

মায়ের গলা আরও বিষাদময় হয়। বলে, তুই কেন বড় হতে চাস না, বুঝি।

কীরকম? কৌতূহল দেখিয়েছিল পৃথা।

মা বলে, যে-বয়সে যেরকম কাটানো উচিত, তুই তো তা পারিসনি। ছোটবেলায় খেলার সাথী দিদিটা পাগল হয়ে গেল। পড়াশোনায় মন দিতে হল তোকে। এমনিতে টানাটানির সংসার, দুম করে বাবা চলে গেল মাথার ওপর থেকে। বুঝতে পারলি আমরা দু'জন তোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চাকরি পাওয়ার পর বিয়েতে বসলি। আর এমনই কপাল, শ্বশুরবাড়িটা হল সেকেলে, হাসি-মজা করার সুযোগ পেলি না। তাই ছোটবেলাটা তোর সঙ্গে রয়ে গেছে।

মা মিছিমিছি আক্ষেপ করছিল সেদিন, বাড়িতে হয়তো শান্ত হয়ে থাকত পৃথা, স্কুলে, কোচিনে বদমাইশি করত চুটিয়ে। একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে, সুবীর স্যারের কোচিনে পড়তে যেত পৃথা। সন্ধেবেলার ফার্স্ট ব্যাচ। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বারোজন। ঠিক ওই সময়টাতে স্যারের বন্ধু প্রবালকাকু আসত। সুবীর স্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে উঠে যেত পাশের ঘরে। বউদি আর প্রবালকাকুর হা-হা হি-হি ভেসে আসত। গায়ে শিরশিরানি ধরানো হাসি। স্যারের হয়ে অপমানিত হত পৃথারা। লোকটার ওপর রাগ বাড়ছিল। পৃথাদের ব্যাচের দুটো ছেলে স্কুল কামাই করে আচম্বিতে হানা দিল স্যারের বাড়ি। অজুহাত দিয়েছিল স্যার বলেছিলেন বাড়ি থাকবেন।

দোর আগলে বউদি বলেন, স্যার সেরকম কোনও কথা হয়নি। তোমাদের স্যার স্কুলেই গেছেন।

বউদি আর দরজার মধ্যে যতটুকু ফাঁক, তার মধ্যে দিয়ে প্রবালকাকুর চটি দেখেছিল স্যারের দুই ছাত্র। ব্যাচের সকলে মিলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হল। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছিল না পৃথারা, স্যার

BanglaBook.org

কি কিছুই টের পান না? নিশ্চয়ই পান, কোনও একটা কারণে উনি কিছু বলে উঠতে পারছেন না। কোনও বিষয়ে স্যার হয়তো ঋণী প্রবালকাকুর কাছে।

কারণ অনুসন্ধান অনেক জটিল কাজ, ক্লাস নাইন-এইটের পৃথারা পেরে উঠবে না। সব থেকে সোজা রাস্তা, প্রবালকাকুকে তাড়াও। প্ল্যান করতে বসে যায় পৃথারা। পৃথাই মধ্যমণি। কেননা ওর মাথায় বদমাইশি বুদ্ধি খেলে ভাল। অবশেষে ছক তৈরি হয়।

পরের দিন প্রবালকাকু যথারীতি সন্ধেবেলা পৃথাদের ব্যাচের মাঝে বসলেন। স্যারের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলেই চলে যাবেন ভেতরের ঘরে।

ব্যাচের একটা ছেলে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির নীচে মেন সুইচের সামনে। পৃথা দু'বার নকল কাশতেই নিভে গেল আলো। স্টুডেন্টরা একসঙ্গে বলে উঠল, এই রে, লোডশেডিং!

তারপরই শুরু হল মার, যে যেমন পারছে গাট্টা, চাটি, খিমচি, কিল চালাচ্ছে অন্ধকারে বসে থাকা প্রবালকাকুকে, এক-দু'বার বুঝি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, স্যার বলে উঠলেন, তোরা কী করছিস রে! লাগছে আমার।

বউদি মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকতেই যে যার জায়গায় ভালমানুষ সেজে বসে গেল। ওদিকে মেন স্যুইচ অন করে দিয়েছে ছেলেটা। আলো ফিরে আসতে দেখা গেল, প্রবালকাকুর ঘাঁটা চুল, অবিন্যস্ত পোশাক, চশমা খুলে পড়ে আছে কোলে।

পৃথাদের স্যার খুবই সোজাসাপটা মানুষ। অন্ধকারে ঠিক যে কী ঘটে গেল বুঝতে পারেননি। প্রবালকাকুকে বললেন, কী হল বল তো? এরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করছিল, না?

কোনও উত্তর না দিয়ে প্রবালকাকু উঠে দাঁড়ালেন। রাগে গরগর করতে করতে বললেন, শেষে এই কাজই বেছে নিলি! মুখেই বলতে পারতিস।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রবালকাকু। আর কোনওদিন তাঁকে স্যারের বাড়িতে দেখা যায়নি। এখন পৃথা ভাবে, ছোটবেলায় কত সহজেই ভালমন্দর বিচার করে বসত। এমন তো হতেই পারে,

BanglaBook.org

স্যারের দিক থেকে কোনও গণ্ডগোল ছিল। বউদি অসুখী ছিলেন। প্রবালকাকু ছিলেন বউদির জানলা। স্যারের একটা খারাপ দিক পরে জানা গিয়েছিল। প্রচুর মদ খেতেন। মারাও গেলেন লিভার নষ্ট হয়ে।

আরও একটা বদমাইশির কথা ভোলেনি পৃথা। আগেরটা ছিল ন্যায়ের জন্য, এটা অন্যায় করেছিল নিজেই। স্কুল বয়সটা বুঝি এরকমই হয়। মধুরিমা ছিল বেশ ন্যাকা টাইপের। নাচ-গান জানত, পড়াশোনায় খারাপ না, বাড়ির অবস্থা বেশ ভালই। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল। তবে অতিরিক্ত ন্যাকামির জন্য ওর সৌন্দর্যটা কেমন জানি বেমানান, বেখাপ্পা ঠেকত। মধুরিমাকে তাই কখনও কমপিটিটার মনে হত না পৃথার। ক্লাসে পৃথা যে পয়লা নম্বরের সুন্দরী, সকলে স্বীকার করত সেটা। সেই জ্বালাতেই বুঝি মধু বেশির ভাগ সময় পৃথার গা ঘেঁষে বসে ওর প্রেমের খুঁটিনাটি বলত। ও জানত পৃথার কোনও প্রেমিক নেই।

পৃথা একদিন বলল, তোর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করাবি না! ওর সম্বন্ধে এত কথা শুনি।

সহজে রাজি হয়নি মধুরিমা। পিছনে লেগে থাকতে হয়েছিল। শেষে বোধহয় অধৈর্য হয়ে রাজি হয়। বলে, শুধু তোর সঙ্গে আলাপ করাব। আর কাউকে কিছু বলবি না।

একদিন স্কুলড্রেসের ওপরে একটু সাজগোজ করে এল মধু। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পারলারে ঘুরে এসেছে আগের দিন। স্কুল ছুটির পর বলল, চল আলাপ করিয়ে দিই, সামনের বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে।

পৃথার তখন তেলতেলে মুখ। জল, রুমাল দিয়ে মুছে, চলল মধুর সঙ্গে স্কুলের আগের স্টপেজে।

উদাসীন অপেক্ষায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল বাস স্ট্যান্ডের শেডের নীচে। কী অপূর্ব দেখতে তাকে। সাদা পাঞ্জাবি, নীল জিনস্, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, মানানসই ফরসা। অনেকটা কাশ্মীরি শালওলাদের মতো দেখতে। বয়সও বেশি না, হার্ডলি পৃথাদের থেকে দু'বছরের বেশি হবে।

মধু আলাপ করিয়ে দেওয়ার পরও ছেলেটার দিকে খানিকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে ছিল পৃথা। ছেলেটি বিব্রত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

BanglaBook.org

কথা হল খুব সামান্য। বাস এসে যেতেই মধু বলল, চ, চ, উঠে পড়ি। বাড়িতে লোক আসার কথা আছে।

পৃথা বলেছিল, দাঁড়া না, বাসটায় বড্ড ভিড়, পরের বাসে যাব।

না ভাই, মা ভীষণ বকুনি দেবে। নেকু সুরে বলল মধুরিমা। গুঁতোগুঁতি করে উঠে পড়ল বাসে। উঠতে হল পৃথাকেও। ছেলেটা ঝুলছিল গেটে। ওর একটা হাত ছিল লেডিস সিটের পিছনের রডে। পৃথা দাঁড়িয়ে আছে লেডিসের সামনে। বাসের জানলা দিয়ে যতবার ছেলেটার চোখে চোখ রাখতে যায় পৃথা, ছেলেটা অন্য দিকে তাকায়। একদম একনিষ্ঠ প্রেমিক, নাকি মধুরিমার বাবার কাছে টাকা ধার করেছে? রাগের মাথায় এরকমটাই মনে হচ্ছিল পৃথার। একটা সময় একটু বেশিই সাহস দেখিয়ে ফেলে পৃথা, ভিড় সামলাতে পারছে না ভান করে হাতটা রাখে জানলার রডে। ছেলেটার হাতের থেকে ইঞ্চি খানেকের তফাত। বাস খানিকটা যেতেই, পৃথা আলতো করে হাতটা তুলে দেয় ছেলেটার হাতে। গেটে ঝুলতে থাকা ছেলেটা ভীষণ অবাক হয়ে তাকায় পৃথার দিকে, নিজের সাহসিকতায় পৃথা নিজেই ঘাবড়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসতে। পেরেছিল কিনা জানে না পৃথা। ছেলেটা হাত সরিয়ে নেয়। ছেলেটার দৃষ্টিতে তখন অবিশ্বাস পালটে ঘৃণা হয়ে যাচ্ছে। ও হয়তো ভাবতে পারেনি বান্ধবীর প্রেমিকের সঙ্গে কেউ এরকম আচরণ করতে পারে।

পরের দু'দিন স্কুলে এল না মধু। যেদিন এল একটিও কথা বলল না পৃথার সঙ্গে। তারপর থেকে আর কোনওদিনও না। ছেলেটাকেও আর কখনও দেখেনি পৃথা। ওই হয়তো মধুরিমাকে বন্ধুর কীর্তির কথা জানিয়েছে।

পথেঘাটের ভিড়ে ছেলেটাকে খুঁজত পৃথা। কখনও কখনও অন্য কাউকে দেখে মনে হয়, ওই বুঝি। বারেবারে ভাঙত ভুল। এইভাবে পৃথার কল্পনাসঙ্গী হয়ে গেল ছেলেটা। যে -ম্যাটাডোরে বাবার ফুলে ঢাকা মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছিল, তার ডালাতে বসে ছিল ছেলেটা। দিদিকে নিয়ে ভিড় বাসে উঠতে গেলে, ছেলেটা হাত বাড়িয়ে দিত। পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়তে পড়তে এমন ঢুলুনি আসত, মাথা ঠুকে যেত

BanglaBook.org

টেবিলে, কখনও ঠোকার আগেই তালু পেতে দিয়েছে ছেলেটা। ওকে উদ্দেশ করে অনেক কথা লেখা ছিল ডায়েরিতে।

কবে থেকে যে ছেলেটা সঙ্গ-ছাড়া হয়ে গেল, টেরই পেল না পৃথা। ডায়েরি ওলটালে মাঝেমাঝে তবু দেখা হত ছেলেটার সঙ্গে।

আবছা আলোর বন-জঙ্গলের ঘেরাটোপ ছেড়ে পৃথাদের জিপ উঠে এসেছে বিস্তৃত প্রাকৃতিক শোভার সামনে। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে চারপাশ, দূরে পাহাড়ের মাথার ওপর মাথা তুলেছে আর একটা পাহাড়। মাঝের ফাঁকা জায়গায় নদীর ছদ্মবেশে শুয়ে আছে মেঘ। তিরতিরে হাওয়া। রাস্তার ধারে বাঁদিকে পাথরের দেওয়ালে অচেনা গাছ-ফুল হাওয়ায় কাঁপছে। আবার সেই নীল ফুলটাকে মাটিতে দেখতে পায় পৃথা। নামটা জানা হল না। ড্রাইভার কি জানে? জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার আগে চোখে পড়ে, যে-দিকটা খাদ মনে হচ্ছিল, সেখানে উঠে আসছে এক দঙ্গল মেয়ে। কারা এরা? স্কুল বয়সি, চেহারায় শহুরে ছোঁওয়া। পৃথা অবশ্য দেখেছে, এদের গ্রামের লোকেরাও বেশ ড্রেস কনশাস।

মেয়েগুলো হাসতে হাসতে উঠে এল রাস্তায়, আলগা কৌতূহলে তাকাল জিপের দিকে। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগোতে লাগল। ওদের সবার হাতেই ছোট লাগেজ। এরা নিশ্চয়ই বেড়াতে যাচ্ছে না। স্থানীয় মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে।

পৃথাদের জিপ ক্রস করে গেল ওদের। পৃথা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছে এরা?

সব কথারই হেসে উত্তর দেয় ড্রাইভার। হিন্দিতে বলে, বাড়ি ফিরছে। সামনের দু'দিন স্কুল ছুটি।

কোন স্কুলে পড়ে ওরা?

নীচে বোডিং স্কুল মে, কাল পাহাড় বন্ধ হ্যায়, পরশো সানডে। ইসি লিয়ে লড়কি সব আপনা ঘর যা রহি হ্যায়।

পৃথার ভারী অদ্ভুত লাগে! কী আশ্চর্য সমাপতন! একটু আগেই সে স্কুলবেলার কথা ভাবছিল, পাহাড় বেয়ে উঠে এল স্কুলের মেয়েরা। ওদের দু'জনের গায়ে সম্ভবত স্কুল ইউনিফর্ম। সাদা সালোয়ার-কামিজ, নীল ওড়না। বাকিরা ক্যাজুয়াল ড্রেস পরেছে। পোশাক যতই আধুনিক হোক,

BanglaBook.org

শ্রম আর দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এরা কোন গ্রামে থাকে? এখন পর্যন্ত তেমন কোনও গ্রাম চোখে পড়ল না। হয়তো আছে, পাহাড়ের আড়ালে। দেশের সরকারের নজরে থাকলেই হল।

পৃথা ফের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, ওরা কি সরকারি স্কুলে পড়ে?

নেহি, মিশনারি স্কুল।

পৃথা যা ভেবেছিল মিলে গেল। জিপ এগোচ্ছে, একই রকম দুলকি চালে। মেয়েগুলোর থেকে এখনও খুব একটা দূরে আসেনি পৃথারা। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে পৃথা। পিছন থেকে অনিমেষ জানতে চায়, কেন, কী হল?

পৃথা বলে, মেয়েগুলোকে তুলে নিই। হেঁটে হেঁটে কখন বাড়ি পৌঁছোবে কোনও ঠিক আছে।

পৃথার সিদ্ধান্তে ড্রাইভার খুশিই হয়েছে, যতই হোক নিজের এলাকার মেয়ে! গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে ড্রাইভার। একমুখ হাসি। অনিমেষ ফের বলে, গাড়িতে জায়গা হবে? প্রায় দশ-বারোজন দেখলাম।

পৃথা কিছু বলার আগেই রায়ন বলে, আমরা নেমে যাচ্ছি। আমাদের তো হেঁটে যাওয়ারই কথা। দারুণ একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

অনিমেষ বলতে থাকে, না, না, সে কী, তা কী করে হয়!

অনিমেষের কথা কানে না নিয়ে রায়ন, সুগত ঝপাঝপ গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। নিজেদের রুকস্যাক দুটো তুলে নেয়।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বাপ্পাও কাঁধে ব্যাগ তুলে নিয়েছে, মেয়েগুলো এসে পড়ে গাড়ির কাছে। ড্রাইভার নিজের ভাষায় ওদের উঠে পড়তে বলে জিপে। অপ্রত্যাশিত সুবিধে পেয়ে মেয়েগুলো বিহ্বল হয়। কুণ্ঠিত উচ্ছ্বাসে একে একে উঠে আসে জিপের পিছনে।

বেগতিক দেখে বাপ্পা বলে, এ কী রে, আমি কি জিপে যাব নাকি?

রাস্তা থেকে সুগত বলে, তাই যা, পরে দেখা হবে। তুই তো এরকমই জার্নির কথা বলছিলি গোড়ায়।

না না ভাই, ওসব হবে না। বলে, মেয়েদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার নিষ্ফল চেষ্টা চালায় বাপ্পা।

BanglaBook.org

ড্রাইভার সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয়। রায়ন সুগতকে বলে, আপলোগ সামনে কা সিটপে বৈঠিয়ে।

হোগা চার আদমি? সন্দেহ প্রকাশ করে সুগত।

ড্রাইভার বলে, হো যায়ে গা। আইয়ে না।

সত্যিই চারজন ধরে গেল। যদিও ড্রাইভার দরকারের থেকেও কম জায়গা নিয়েছে, এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ওদের এলাকার মেয়েদের কষ্ট কমিয়ে দিয়েছে পৃথারা।

পৃথার পাশে বসেছে রায়ন, তারপর সুগত। ঝাঁকুনি সামলাতে রায়ন সামনের হ্যান্ডেলটা ধরেছে। পৃথার মনে পড়ে যায়, মধুরিমার প্রেমিকের কথা। সেই ছেলেটার তুলনায় রায়ন একটু বড়। চোখে চশমার জন্য রাশভারী। তবু ওর হাতটা আহ্বান করে পৃথার স্কুলবেলা। রায়নের হাতের ঠিক ইঞ্চি খানেক দূরে পৃথাও রডটা ধরে।

আট

মেঘমার পর থেকে আবার তিন বন্ধু হাঁটা শুরু করেছে। এগিয়ে গেছে অনিমেষদের গাড়ি। সুগত বাপ্পাকে হেঁটে যাওয়ার জন্য রাজি করাতে রায়নকে এবার আর বেশি বেগ পেতে হয়নি। রায়ন একবার বলতেই ওরা বলেছে, হ্যাঁ মাইরি, গাড়িতে যা ঝাঁকুনি তার থেকে হেঁটে যাওয়া অনেক আরামের।

মেঘমার নির্জন মলিন রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বাইরে হাত-মুখ ধুতে এসে আলোচনাটা করেছিল তিন বন্ধু। তারপর বাপ্পাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে। অর্থাৎ অনিমেষদাকে বলতে। মানুষটি এমনই সম্পৃক্ত হয়ে থাকছে সুগতদের সঙ্গে, আলাদা করা ভারী মুশকিল। এর একটা কারণ আপাতত তিন বন্ধুই আবিষ্কার করে ফেলেছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা তেমন সুবিধের জায়গায় নেই। ব্যাপারটা বুঝতে না দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল অনিমেষদা। পৃথাদির কোনও আগ্রহ ছিল না বিষয়টা গোপন করার। অতটা রাস্তা

BanglaBook.org

উজিয়ে আসা হল, পৃথাদি যেচে একটাও কথা বলেনি অনিমেষদার সঙ্গে। একাকিত্ব কাটাতে অনিমেষদা আঁকড়ে ধরেছিল সুগতদের। পৃথাদির আচরণও ছিল সেরকম।

বাপ্পা বন্ধুদের থেকে দায়িত্ব পেয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল দম্পতির খাবার টেবিলের সামনে। বলল, আপনাদের ব্যবহারে, বদান্যতায় আমরা ভীষণভাবে আপ্লুত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, আমরা আর জিপে উঠছি না। এই রাস্তায় গাড়িতে যাওয়া মোটেই সুখপ্রদ নয়। তা ছাড়া প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য, মানে যে-কারণে আমাদের এখানে আসা, সেটাই ব্যাহত হচ্ছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, প্রজাপতি কত কাছ থেকে দেখার কথা ছিল আমাদের, সেসব কিছুই হচ্ছে না। অতএব আপনাদের সঙ্গী হতে পারছি না বলে ক্ষমা করুন।

শেষের কথাটা হাতজোড় করে বলেছিল বাপ্পা। ওর সিরিয়াস ভঙ্গি ও ভাষণ শুনে সেই প্রথম স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হেসে উঠেছিল। হাসি শেষ করে পৃথাদি বলে, আমরা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি, একটা কথা দিতে হবে।

সুগত, রায়ন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে টেবিলের সামনে। সুগত জানতে চায়, কী কথা?

তোমরা টংলু যাবে না। তুমলিংয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। রাতটা কাটিয়ে কাল গাড়ি করে যাবে সান্দাকফু।

রায়ন বলেছিল, কালকের কথা পরে ভাবা যাবে। আজ কে কেমন থাকি দেখে নিই।

কী একটু ভেবে নিয়ে পৃথাদি বলে, ঠিক আছে, আজ তা হলে দেখা হচ্ছে।

সরাসরি রায়নের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেছিল পৃথাদি, একটু হুকুমের সুর লেগে ছিল কি?

রায়ন এখন পড়েছে দোটানায়, একবার ভাবছে যাবে না তুমলিং, পরমুহূর্তে মনে হচ্ছে যাবে। এই অস্থিরতার বিশেষ একটা কারণ আছে। বাকি দু'জনের কোনও ঝামেলা নেই, তারা এখন পর্যন্ত জানে যাওয়া হচ্ছে তুমলিং। রায়ন যদি সিদ্ধান্ত পালটায় ওরা আপত্তি করবে না। কথা

BanglaBook.org

দিয়েছে বলেই যে যেতে হবে, এতটা নীতিবাগীশ এরা কেউই নয়। মুশকিল হচ্ছে সুগত বাপ্পা তো জানতে চাইবে, কেন ডিসিশন চেঞ্জ করছে রায়ন?

প্রকৃত কারণটা কি ওদের বলা ঠিক হবে? এদিকে সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার নিতে হবে মিনিট কুড়ির মধ্যে। বাপ্পার কথা অনুযায়ী আর খানিকটা হাঁটার পর টংলু, তুমলিংয়ের রাস্তা আলাদা হয়ে যাবে। টংলুর দূরত্ব দু' কিলোমিটার, রাস্তা খাড়াই। শুধু ট্রেকারদের চলার জন্য। তুমলিং পাঁচ কিলোমিটার দূরে, গাড়ির রাস্তা।

দ্বিধা সংশয়ের জন্যই বোধহয় হাঁটায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে রায়ন। সুগত একটা সুর গুনগুন করছে, বাপ্পা একদম সামনে, হেঁটে যাচ্ছে চুপচাপ।

সুগত যে-সুরটা ভাঁজছে, নেপালি স্কুল ছাত্রীদের ফেলে যাওয়া। ওদের গ্রুপের চারজন নেমে গেছে মেঘমায়, বাকিরা জিপে করে চলল তুমলিংয়ের দিকে। কিছু মেয়ের বাড়ি সেখানেই, লিফট্ পাবে না বলে বাকিদের ফের হাঁটতে হবে। হাঁটা নিয়ে অবশ্য এতটুকু দুশ্চিন্তা ছিল না ওদের। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে এতটা পথ গাড়িতে আসতে পেরে খুশি হয়েছিল খুব। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচুর কথা বলছিল। যার এক বর্ণও বুঝতে পারছিল না রায়ন-অনিমেষরা। বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিলেই ওদের কথোপকথন কলকাকলী বলেই বোধ হচ্ছিল। অনিমেষদা ওদের সঙ্গে আলাপ জমায় দুর্বল হিন্দিতে। একসময় গান গাইতে বলে, ওদের মধ্যে একটি মেয়ে হয়তো গান জানে, বাকি মেয়েরা তাকেই অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। গাড়ির আওয়াজের মাঝে মেয়েটা গেয়ে উঠল সম্প্রতি রিলিজ হওয়া হিন্দি সিনেমার গান। কণ্ঠ মিষ্টি, সুরেলা।

দু'কলি গাইতে না-গাইতেই অনিমেষ ওদের বাধা দিল। বলল, এ গান নয়। তোমাদের লোকাল গান গাও।

গান বদলে নিল মেয়েটা। শুরু করল নেপালি কোনও লোকসংগীত। বাকি মেয়েরাও যোগ দিয়েছিল ওর সঙ্গে। কী অনবদ্য সুর! তীব্র সম্মোহনী ক্ষমতা। আশপাশের প্রকৃতির সঙ্গে দারুণভাবে মিশে যাচ্ছিল,

BanglaBook.org

নাকি প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল সুর! আচ্ছন্ন হয়ে সুরে ভাসছিল রায়ন, তখনই ঘটনাটা ঘটে, যে-কারণে রায়ন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, আবার কি দেখা হওয়া ঠিক হবে পৃথাদির সঙ্গে?

গান চলাকালীন রায়ন টের পায় তার আঙুলে অন্য কারুর আঙুলের স্পর্শ। সামনের রডটা ধরে বসেছিল রায়ন, স্পর্শটা এসেছে পৃথাদির থেকে। হতেই পারে, গাড়ি যেরকম দুলছে। হাত সরিয়ে নিতে গিয়ে চমকায় রায়ন, তার হাতের ওপর উঠে এসেছে নরম, উষ্ণ তালু। আমূল কেঁপে ওঠে রায়ন। হাত সরাচ্ছে না পৃথাদি। বাঁপাশে বসে আছে সুগত, লক্ষ করছে কিনা, কে জানে! আড়চোখে পৃথাদির দিকে তাকিয়েছিল রায়ন, মুখে কোনও ভাষা নেই। তা হলে বেখেয়ালে হাতটা রেখেছে, অন্যমনস্ক হয়ে আছে ভীষণ? তাও না। কেননা মুখের বদলে কথা বলছিল হাত, অল্প অল্প চাপ বাড়ছিল, কেমন যেন আঁকড়ে ধরা ভাব। হাতটা সরিয়ে নেওয়ার মতো মনের জোর পাচ্ছিল না রায়ন। একটা সময় নিজে থেকেই হাত সরিয়ে নেয় পৃথাদি। এই আচরণের মানে কী, এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ওই ঘটনার কোনও ছাপ পরবর্তী সময়টুকুতে পৃথাদির মুখে ছিল না। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, চোখের ইশারা, কিছুই না। যেন ব্যাপারটা ঘটেইনি। নেপালি মেয়েগুলোর পর গান ধরেছিল অনিমেষদা, উই শ্যাল ওভারকাম... দেখা গেল মেয়েগুলোও গানটা জানে, গলা মেলাল রায়নদের সঙ্গে। পৃথাদি একলা গুনগুন করে গাইছিল, নাম তার ছিল জন হেনরি, যেন এক দুরন্ত ইঞ্জিন... রায়নরা যখন মেঘমা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, পৃথাদি বলেছিল, আজ তা হলে দেখা হচ্ছে।— কথাটার মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন হুকুম অথবা দেখা হওয়াটা খুব জরুরি এটা জানানো।

পৃথাদি কি কিছু বলতে চায়, গোপনে? আর কোনও সুযোগ না পেয়ে ওই সংকেতটাই বেছে নিয়েছে? নাকি রায়ন চাইছে না পৃথাদির ভাবমূর্তিটাকে লঘু করতে? যে ব্যাপারটা করেছে পৃথাদি, বাপ্পা সুগতকে বললে, এক্ষুনি হইচই শুরু করে দেবে, আগামী কী কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটাও গড়গড় করে বলে দেবে ওরা। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলোর কেন্দ্রে থাকবে যৌনতা। পৃথাদিকে সেখানে নামিয়ে আনতে ইচ্ছে হচ্ছে

BanglaBook.org

না রায়নের। আরও একটা সমস্যা হচ্ছে, বিষয়টা বন্ধুদের জানালেই রায়নদের ট্যুরটা হয়ে যাবে পৃথাদি সংক্রান্ত, পাহাড় নয়।

বড্ড দোলাচলের মধ্যে পড়েছে রায়ন। পৃথাদির শরীরী সংকেতের মানে সাধারণভাবে একটাই হয়। রায়নের যৌন-অভিজ্ঞতা সত্যিই খুব অল্প। বোধগম্য হচ্ছে না পৃথাদির অভিপ্রায়। এই সূত্রে মনে পড়ে যাচ্ছে প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতার কথা, আজ যখন হেঁটে আসতে আসতে সুগত কথা প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল কোনও সেক্স এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা রায়নের, এই গল্পটাই মনে পড়ে গিয়েছিল আগে, ঘটনাটা মামারবাড়ির। অজয় নদীর ধারে চন্দনপুর। মা বেঁচে থাকতে প্রত্যেক বছর কালীপুজোর সময় চন্দনপুরে বাবা-মা'র সঙ্গে যেত রায়ন। বাড়িতে মোটেই কালীপুজো হত না। গ্রাম জুড়ে একটা দারুণ উৎসব হত। কালীপুজোর দিন কাকভোরে অজয়ের জলে ভাসানো হত প্রদীপ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সারা গ্রামের লোক প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে, গ্রামের যুবকরা নৌকা নিয়ে মাঝনদীতে। নৌকায় জ্বালানো হচ্ছে আলোর বাজি। অন্ধকারে আলোর মালা। সেই মালা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে একাকার হয়ে যেত।

রাত থাকতেই রায়নদের মামারবাড়ির ছোট-বড় সবাই চলে যেত নদীর ধারে। ছোটদের জলের কাছে যেতে দেওয়া হত না। প্রদীপ ভাসাত বড়রাই।

রায়ন তখন ক্লাস এইট। সেবার মেজমামা বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে বিছানা থেকে তুলছে। বড়মামার মেয়ে রঞ্জনাদি বলল, যাবে না। জ্বর আসছে। বাড়ির ছোটরা সব এক বিছানায় শুয়েছিল। কেউ রঞ্জনাদি যেতে না পারার জন্য 'সমবেদনা' দেখাল না। টকাটক বিছানা থেকে উঠে, দাঁত-মুখ ধুয়ে রেডি। রায়ন চিরকালই শান্তশিষ্ট অনুভূতিশীল ছেলে। রঞ্জনাদিকে বলল, কী গো, একদমই পারবে না যেতে?

না রে, জলো হাওয়া লাগলে আরও জ্বর আসবে।

একা থাকবে বাড়িতে! মন খারাপ করবে না?

কী করব বল, কাকে থাকতে বলি, কারও আনন্দ কেড়ে নেওয়া ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

সাতপাঁচ ভেবে রায়ন বলে, ঠিক আছে, আমি থাকছি তোমার সঙ্গে। প্রত্যেকবার তো দেখি প্রদীপ ভাসানো। একবার না দেখলে কিছু হবে না।

রায়ন ভেবেছিল রঞ্জনাদি হয়তো বলবে, না না তুই যা, আমার জন্য তুই কেন বাড়িতে বসে থাকবি। এটা দেখতেই তো কলকাতা থেকে আসিস।

কিছুই বলল না রঞ্জনাদি। উপুড় হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। তখনও রঞ্জনাদির আসল উদ্দেশ্য টের পায়নি রায়ন। বুঝতে পারেনি কেন সেবার একটু বেশি বেশি কাছে ঘেঁষছিল রঞ্জনাদি। আদর করার ধরনটা ছিল বাড়াবাড়ির পর্যায়। খুব যে খারাপ লাগছিল রায়নের, তা নয়। তবে অস্বস্তি হচ্ছিল।

সেদিন বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেছে, মা এসে বলল, রায়ন তুই যা। আমি রঞ্জনার কাছে বসছি।

তক্ষুনি রঞ্জনাদি বলে উঠেছিল, তুমি যাও পিসি, ও থাকুক। ওর সঙ্গে গল্প করতে পারলে আমার ভাল লাগবে।

মায়ের মনে কোনও প্যাঁচ নেই, রঞ্জনাদির কপালে গলায় হাত দিয়ে বলল, এখনও তেমন আসেনি, তবে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। ভাইয়ের দিকেও লক্ষ রাখিস, ও আবার একা একা পালিয়ে না যায় নদীর ধারে। তারপর রায়নকে বলে, সদরের খিলটা দিয়ে দে।

মা চলে যেতেই রঞ্জনাদি বলেছিল, তুই দেখ তো জ্বর কতটা? এত কাঁপুনি লাগছে কেন?

জ্বর পরীক্ষা করতে গিয়েই রঞ্জনাদির জালে ধরা পড়ে যায় রায়ন। ওর হাতটা নিজের সুখের জায়গাগুলোয় টেনে নেয়, নাভি, তলপেট, নিতম্ব, পিঠ হয়ে বুকে আসতেই প্রচণ্ড শক খায় রায়ন। এত কম!

ঘোর রায়নেরও লেগেছিল, মুহূর্তে খানখান হয়ে যায় সবকিছু। ছিটকে সরে আসে। রঞ্জনাদি কী যেন বলছিল, কানে ঢোকেনি কিছুই।

বিছানা থেকে নেমে, দাঁত-মুখ না ধুয়েই ভেজানো সদর খুলে দে দৌড়। নদীর দিকে যেতে যেতে রায়ন ভাবছিল, রঞ্জনাদিকে এবার অনেক ভরাট লাগছিল, একটা জায়গায় এত কম কেন? মেয়েদের কি তা হলে এরকমই হয়?

BanglaBook.org

নদীর ধারে বাড়ির লোকেদের খুঁজে পেল না রায়ন। হাওয়া ছিল খুব। বেশির ভাগ প্রদীপ নিভে গেছে, যে-ক'টি কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে, তাদের দেখে রঞ্জনাদির কথাই মনে পড়ছিল। চোখ দিয়েই অনুভূত হচ্ছিল প্রদীপের ম্রিয়মাণ উষ্ণতা।

রঞ্জনাদির মতোই কি পৃথাদি আহ্বান করছে কোনও শূন্যগর্ভে? কালীপুজোর সকালের ঘটনা নিয়ে রঞ্জনাদির কোনও কুণ্ঠা বা অপরাধবোধ ছিল না। সেইদিনই সন্ধেবেলা ছাদে রায়নকে একা পেয়ে রঞ্জনাদি বলেছিল, হ্যাঁরে, তুই আমার ওপর রাগ করে আছিস? কী করব বল, আমার এ দুটো তো খুব খুব কম, বন্ধুরা বলে কেউ আদর করে দিলে নাকি বাড়ে।— ভুল তথ্য। নিজের ছেলেমানুষি অজ্ঞানতার জন্য এখন হয়তো হাসে রঞ্জনাদি। কিন্তু সেই শূন্যতা কি ভরাট হয়েছে ভালবাসায়। অনেক মেয়েরই হয়তো হয় না। পৃথাদি কিন্তু অনেক উজ্জ্বল, ফুলে ভরা টগর গাছের মতো।— নাঃ। চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে রায়ন চলে এসেছে বাপ্পার পাশে, জিজ্ঞেস করে, আমরা তুমলিংয়ের রাস্তা ধরেই হাঁটছি তো?

হ্যাঁ, কেন?

টংলুর রাস্তাটা চোখে পড়ল না যে।

এই তো একটু আগে ফেলে এসেছি, বাঁদিক দিয়ে সরু রাস্তা উঠে গেছে ওপরে। খেয়াল করিসনি?

না। বলে, চুপ করে যায় রায়ন। মনটা ভারী হয়ে আছে, ফের দেখা হবে অনিমেষদাদের সঙ্গে, তখন কেমন আচরণ করবে রায়ন, ঠিক করতে থাকে মনে মনে।

তখনই সুগত হঠাৎ বলে ওঠে, অনিমেষদাকে তোর কেমন লাগছে রায়ন?

ভালই তো।

পৃথাদিকে?

সতর্ক হয় রায়ন, পৃথাদি যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে, সুগতর পক্ষে দেখে ফেলা স্বাভাবিক, রায়নের পাশেই বসেছিল। এতক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, রায়ন নিজে কিছু বলে কিনা? প্রসঙ্গটা তোলার জন্য এবার খোঁচাচ্ছে।

BanglaBook.org

সাতপাঁচ ভেবে রায়ন বলে, ঠিক আছে, আমি থাকছি তোমার সঙ্গে। প্রত্যেকবার তো দেখি প্রদীপ ভাসানো। একবার না দেখলে কিছু হবে না।

রায়ন ভেবেছিল রঞ্জনাদি হয়তো বলবে, না না তুই যা, আমার জন্য তুই কেন বাড়িতে বসে থাকবি। এটা দেখতেই তো কলকাতা থেকে আসিস।

কিছুই বলল না রঞ্জনাদি। উপুড় হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। তখনও রঞ্জনাদির আসল উদ্দেশ্য টের পায়নি রায়ন। বুঝতে পারেনি কেন সেবার একটু বেশি বেশি কাছে ঘেঁষছিল রঞ্জনাদি। আদর করার ধরনটা ছিল বাড়াবাড়ির পর্যায়। খুব যে খারাপ লাগছিল রায়নের, তা নয়। তবে অস্বস্তি হচ্ছিল।

সেদিন বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেছে, মা এসে বলল, রায়ন তুই যা। আমি রঞ্জনার কাছে বসছি।

তক্ষুনি রঞ্জনাদি বলে উঠেছিল, তুমি যাও পিসি, ও থাকুক। ওর সঙ্গে গল্প করতে পারলে আমার ভাল লাগবে।

মায়ের মনে কোনও প্যাঁচ নেই, রঞ্জনাদির কপালে গলায় হাত দিয়ে বলল, এখনও তেমন আসেনি, তবে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। ভাইয়ের দিকেও লক্ষ রাখিস, ও আবার একা একা পালিয়ে না যায় নদীর ধারে। তারপর রায়নকে বলে, সদরের খিলটা দিয়ে দে।

মা চলে যেতেই রঞ্জনাদি বলেছিল, তুই দেখ তো জ্বর কতটা? এত কাঁপুনি লাগছে কেন?

জ্বর পরীক্ষা করতে গিয়েই রঞ্জনাদির জালে ধরা পড়ে যায় রায়ন। ওর হাতটা নিজের সুখের জায়গাগুলোয় টেনে নেয়, নাভি, তলপেট, নিতম্ব, পিঠ হয়ে বুকে আসতেই প্রচণ্ড শক খায় রায়ন, এত কম!

ঘোর রায়নেরও লেগেছিল, মুহূর্তে খানখান হয়ে যায় সবকিছু। ছিটকে সরে আসে। রঞ্জনাদি কী যেন বলছিল, কানে ঢোকেনি কিছুই।

বিছানা থেকে নেমে, দাঁত-মুখ না ধুয়েই ভেজানো সদর খুলে দে দৌড়। নদীর দিকে যেতে যেতে রায়ন ভাবছিল, রঞ্জনাদিকে এবার অনেক ভরাট লাগছিল, একটা জায়গায় এত কম কেন? মেয়েদের কি তা হলে এরকমই হয়?

BanglaBook.org

নদীর ধারে বাড়ির লোকেদের খুঁজে পেল না রায়ন। হাওয়া ছিল খুব। বেশির ভাগ প্রদীপ নিভে গেছে, যে-ক'টি কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে, তাদের দেখে রঞ্জনাদির কথাই মনে পড়ছিল। চোখ দিয়েই অনুভূত হচ্ছিল প্রদীপের ম্রিয়মাণ উষ্ণতা।

রঞ্জনাদির মতোই কি পৃথাদি আহ্বান করছে কোনও শূন্যগর্ভে? কালীপুজোর সকালের ঘটনা নিয়ে রঞ্জনাদির কোনও কুণ্ঠা বা অপরাধবোধ ছিল না। সেইদিনই সন্ধেবেলা ছাদে রায়নকে একা পেয়ে রঞ্জনাদি বলেছিল, হ্যাঁরে, তুই আমার ওপর রাগ করে আছিস? কী করব বল, আমার এ দুটো তো খুব খুব কম, বন্ধুরা বলে কেউ আদর করে দিলে নাকি বাড়ে।— ভুল তথ্য। নিজের ছেলেমানুষি অজ্ঞানতার জন্য এখন হয়তো হাসে রঞ্জনাদি। কিন্তু সেই শূন্যতা কি ভরাট হয়েছে ভালবাসায়। অনেক মেয়েরই হয়তো হয় না। পৃথাদি কিন্তু অনেক উজ্জ্বল, ফুলে ভরা টগর গাছের মতো।— নাঃ। চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে রায়ন চলে এসেছে বাপ্পার পাশে, জিজ্ঞেস করে, আমরা তুমলিংয়ের রাস্তা ধরেই হাঁটছি তো?

হ্যাঁ, কেন?

টংলুর রাস্তাটা চোখে পড়ল না যে।

এই তো একটু আগে ফেলে এসেছি, বাঁদিক দিয়ে সরু রাস্তা উঠে গেছে ওপরে। খেয়াল করিসনি?

না। বলে, চুপ করে যায় রায়ন। মনটা ভারী হয়ে আছে, ফের দেখা হবে অনিমেষদাদের সঙ্গে, তখন কেমন আচরণ করবে রায়ন, ঠিক করতে থাকে মনে মনে।

তখনই সুগত হঠাৎ বলে ওঠে, অনিমেষদাকে তোর কেমন লাগছে রায়ন?

ভালই তো।

পৃথাদিকে?

সতর্ক হয় রায়ন, পৃথাদি যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে, সুগতর পক্ষে দেখে ফেলা স্বাভাবিক, রায়নের পাশেই বসেছিল। এতক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, রায়ন নিজে কিছু বলে কিনা? প্রসঙ্গটা তোলার জন্য এবার খোঁচাচ্ছে।

BanglaBook.org

রায়নকে নিরুত্তর দেখে সুগত ফের বলে, কী হল, বললি না, কেমন মনে হল পৃথাদিকে?

ভাল। যতটা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বলে রায়ন।

সুগত বলে, দু'জনেই যদি ভাল হবে, নিজেদের মধ্যে মিল নেই কেন?

বাপ্পা ঢুকে এল আলোচনায়। বলে, যে যার নিজের জায়গায় ভাল। কোনও ব্যাপারে হয়তো বনিবনা হচ্ছে না। দাম্পত্য সম্পর্ক বড় জটিল, থার্ড পার্টি কিছুই বুঝতে পারে না।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সুগত বলে, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে কেউ একজন ভাল মানুষের অভিনয় করছে।

ফের রায়নের বুকটা ছমছম করে ওঠে, সুগতর ইঙ্গিত কি পৃথাদির দিকে? নিঃসন্দেহ হতে রায়ন জিজ্ঞেস করে, কেন তোর এমন মনে হচ্ছে?

আমার মেজদির বৈবাহিক জীবন দেখে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয় রায়ন। জানতে চায়, কী রকম?

একটা ঢোঁক গিলে সুগত বলে, তোদের কখনও বলিনি, খুব একটা সুবিধের হয়নি মেজদির বিয়েটা। জামাইবাবু অ্যালকোহলিক, মারধর করে মেজদিকে। একা বাপের বাড়ি এসে মেজদি কাঁদে, গালিগালাজ দেয় জামাইবাবুর উদ্দেশে। কিন্তু যখনই দু'জনে আসে, মেজদির মুখে কী হাসি, জামাইবাবু পার্থদার সঙ্গে যেচে যেচে কথা, আমাদের কাছে পার্থদার গুণকীর্তন করা। পার্থদা মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে না আমাদের বাড়িতে।— একটু থামে সুগত। ফের বলে, মেজদিকে একদিন ধরেছিলাম, কেন তুই পার্থদার সামনে হাসিহাসি মুখ করে থাকিস? উত্তরে মেজদি বলল, আমি এখনও জানি না, কেন আমাকে পছন্দ করে না তোর জামাইবাবু। বিয়ের পর সব ঠিকই ছিল, হঠাৎ পালটে গেল লোকটা। কেন, কার উসকানিতে এই বদল আমাকে জানতে হবে। তারপর আমি নিজের মূর্তি ধরব।

চুপ করে গেল সুগত। ভ্রূ কুঁচকে হেঁটে যাচ্ছে। বাপ্পা বলে, দিদিকে তোর কাছে আনিয়ে নে, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে ফেলে রাখার! এখনও যখন বাচ্চাকাচ্চা কিছু হয়নি, নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে।

BanglaBook.org

বলেছিলাম দিদিকে। শুনছে না। ওর সেই এক গোঁ, আমাকে বুঝতে হবে, কেন অপছন্দ করে? মেজদিটাকে নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তায় থাকি।

চিন্তাটা চারিয়ে গেল রায়ন বাপ্পার মধ্যে। তিনজনে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। একটু পরে রায়ন বলে, আমার কী মনে হয় জানিস, তোর মেজদি একটা চাকরি পেলে, মানে স্বনির্ভর হতে পারলে গোঁ-টা ছেড়ে দেবে।

তাই যদি বলিস, পৃথাদি তো রীতিমতো ভাল চাকরি করে, আছে কেন অনিমেষদার সঙ্গে? এটা বলল বাপ্পা।

সুগত বলে, সমস্যাটা স্বনির্ভরতার নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একটা মেয়ে যখন বিশ্বাস করে নিজের সবকিছু তুলে দেয় কোনও পুরুষের হাতে, ঠকে গেলে বড্ড ক্ষতি হয়ে যায় তার। ডিভোর্সি মেয়ে সমাজে, বাড়িতে যতটা করুণার পাত্রী, ছেলেরা তা নয়। সে কারণেই মেয়েরা অনেক দূর অবধি দেখে, তবেই সম্পর্ক ভাঙে।

তুই তা হলে কী মনে করছিস, অভিনয়টা করছে অনিমেষদা? জানতে চায় রায়ন।

ঠোঁট উলটে চিন্তিত মুখে সুগত বলে, সেটাও ঠিক বলতে পারছি না। সবসময় যে ছেলেদের দোষেই ম্যারেড লাইফ নষ্ট হয়, তা তো নয়। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও দায়ী থাকে।

পৃথাদির দিকে সন্দেহের তির রেখেছে সুগত। রায়ন এখন আর আগের মতো উদ্বিগ্ন হচ্ছে না। বুঝে গেছে, সুগত ঘটনাটা দেখেনি। দেখলে এতক্ষণে বলে ফেলত। পৃথাদির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করত না।

সুগত ফের বলতে শুরু করে, অনিমেষদা-পৃথাদি দু'জনেই যথেষ্ট সেনসেটিভ, উদার মনের মানুষ। স্কুলের মেয়েগুলোকে নির্দ্বিধায় গাড়িতে তুলে নিল পৃথাদি। সাদা চামড়ার অনেক বড়লোকের বউ এটা করত না। আর অনিমেষদার ওই কথাটা লক্ষ করলি, গাড়িতে আসার সময় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির পর পৃথাদি যখন বলল, কত রিমোট এলাকায় পিচ রাস্তা হয়ে গেছে, এখানে কেন হয় না কে জানে! উত্তরে অনিমেষদা বলল, না হয়ে ভালই হয়েছে, যে-কোনও গাড়ি নিয়ে লোকে ওপরে উঠে আসত,

BanglaBook.org

লোকাল লোকের চলত কী করে? —তারপর ধর আমাদের মতো তিনটে ইয়াং ছেলেকে ওরা গাড়িতে তুলে নিল। আমাদের মনে কী আছে না আছে ওরা তো জানে না। এরকম একটা কাপল-এর কেন যে মিল নেই, আশ্চর্য!

রায়ন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তাই দেখে অবাক হয় দুই বন্ধু। বাপ্পা জানতে চায়, কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

রায়ন বলে, আমরা খামোকা ওদের মিট করতে যাচ্ছি, পুরো বেড়ানোটাই মাটি হবে আমাদের। আমরা তো ক'দিন একটু নিরালায় থাকতে এসেছিলাম। এখানেও মানুষ, সম্পর্ক, সৌজন্য...

তা হলে কী করবি এখন? জানতে চায় বাপ্পা।

আমাদের ঠিক করে রাখা রুটে ঘুরব। চল টংলুতে যাই। কেন আমরা ওদের জন্য টংলুর সিনসিনারি মিস করব?

রায়নের কথার চট করে কোনও উত্তর দিতে পারে না দুই বন্ধু। ওদের শরীরী ভাষা বলছে, আবার এতটা ব্যাক করতে হবে! সুগত অনেকক্ষণ হল নিজের ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়েছে। কোনও মতামত দেবে না বলে, হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাস্তার ধারে একটা গোলাপি ফুলকে ফোকাস করতে। দায়িত্ব বর্তায় বাপ্পার ওপর। আকাশ, পাহাড়, মেঘ, খাদ, জঙ্গল দেখতে দেখতে বাপ্পা বলে, টংলু আর কত ভাল হবে, এই একই ল্যান্ডস্কেপ, একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে। পৃথাদির থেকে ভাল তো নয়। টংলুর বদলে আমরা পৃথাদিকে দেখব।

কথাটা বলে মিটিমিটি হাসছে বাপ্পা। রায়ন বলে, এখানে না এসে তুই গড়িয়াহাট মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পারতিস। পৃথাদির থেকে আরও ভাল মেয়ে দেখতে পাওয়া যেত।

মনে হয় না। পৃথাদি আমার দেখা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এই নির্জন পাহাড়ি ব্যাকড্রপে রূপ আরও খোলতাই হয়েছে।

রায়ন বুঝতে পারে বাপ্পাকে নিরস্ত করা যাবে না। যতটা না মজছে পৃথাদির প্রতি, তার থেকে বেশি অনীহা টংলুর চড়াই ভাঙা।

ছবি তুলে সোজা হয় সুগত। বাপ্পাকে বলে, তুই যে বলছিলি, সেক্স নিয়ে তোর ঘেন্না মতন আছে। এখন তো দেখছি আমাদের থেকে তোর আগ্রহটা বেশি।

BanglaBook.org

বাপ্পা শ্লেষ মিশিয়ে বলে, যার যেমন রুচি। আমি মোটেই যৌনচিন্তা মাথায় রেখে পৃথাদিকে সুন্দর বলছি না। একটা ফুল, পাখি, পাতা...

বলে যা, বলে যা। পৃথাদিকে তুই সেরকম চোখেই দেখছিস। ঢপ মারার জায়গা পাসনি? একটা জলজ্যান্ত যৌবনবতীকে দেখে তোর তুলসীপাতা, আকন্দ ফুল মনে হচ্ছে? শালা ভণ্ড।

সুগতর কথার তোড়ে একটু দমে যায় বাপ্পা। একটু সময় নিয়ে বলে, তোদের একটা কথা বলতে পারি, সেক্স নিয়ে আমার ঘেন্নাভাবটা পৃথাদিকে দেখে কেটে যাচ্ছে।

এর উত্তরে আর কী-ই বা বলা যেতে পারে, রায়ন ফের সামনে হাঁটা শুরু করে দেয়। সুগতও ঘাঁটায় না বাপ্পাকে। বুঝতে পারে ওর ঘেন্নার স্মৃতিটা বড্ড দগদগে। যে করে হোক মুছতে চাইছে। ঘটনাটা জানতে হবে বাপ্পার থেকে।

রায়ন ভাবে, বাপ্পা পৃথাদিকে বসিয়েছে মনের মধ্যে পবিত্র বেদিতে। রায়ন সেটা পারছে না। তার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। সামনে কী ঘটতে চলেছে আন্দাজ করা যাচ্ছে না। নিয়তি নির্ধারিত পথে হেঁটে চলেছে তিনজন।

একটু আগে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে একটা গিরগিটি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রায়নদের। রং বদল করল একবার।

নয়

বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ ফুট দৃশ্যমান হয়ে আছে। বাকি সবটাই দখল নিয়েছে মেঘ। মনে হচ্ছে এ জগতে জীবিত মাত্র পাঁচজন মানুষ, টুমলিং ট্রেকার্স হাটের মালকিন নেপালি দুই বোন, অনিমেষ, পৃথা আর ড্রাইভার। আর হ্যাঁ, একটা বুড়ো বিষণ্ণ কুকুর আছে, কান লটপট, লেজটা ঝাঁকড়া লোমের।

অনিমেষরা এখানে এসে পৌঁছোতে কুকুরটা বেশ কয়েকবার হাঁকডাক করে এগিয়ে এসেছিল, অতিথিদের গন্ধ শুঁকে ফের গিয়ে বসল বারান্দায়।

BanglaBook.org

কুকুরটা এখন তাকিয়ে আছে অনিমেষের দিকে, দৃষ্টিতে কী গভীর নিঃসঙ্গ অবসাদ! মৃত্যুর স্থবিরতাকেও হার মানায়। মেঘ কবলিত এই হিম বসতে দিনের পর দিন কাটিয়ে ও এমন হয়েছে। ওর চাউনিটা ভীষণ ছোঁয়াচে। চোখ সরিয়ে নেয় অনিমেষ।

এই পান্থশালার দুটো ভাগ, কিচেন, ডরমেটরি, দোতলায় মালিকের থাকার জায়গা নিয়ে একটা বাড়ি, উলটো দিকে তিনটে সেপারেট রুম আটাচড বাথের কটেজ। সেটারই কাঠের বারান্দায় বসে আছে অনিমেষ। রুম তিনটে এক একটা ফুলের নামে, টিউলিপ, অ্যাসটার, আইরিস। নামগুলো কাঠের দরজায় লেখা। শৌখিনতা দেখে মালকিনের রুচি আন্দাজ করা যায়।

ঘরগুলো বাইরে থেকে দেখেই খুবই উৎফুল্ল হয়েছিল পৃথা। দরজা খুলে যখন ভেতরটা দেখাল মালকিন, পৃথা আশাহত হয়। ঘরটার ইন্টেরিয়ার ডেকোরশনে পাহাড়ি লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকলেও, পরিসর অত্যন্ত অল্প।

পৃথা বলে উঠেছিল, হামলোগ দো রুম লেঙ্গে।

কিউ? ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল মালকিন। বিস্ময় কেটে গিয়ে মালকিনের মুখে সন্দেহ ঘন হওয়ার আগেই অনিমেষ বলে ওঠে, অ্যাকচুয়ালি বহুত ছোটা রুম, ইসে লিয়ে... ঠিক হ্যায় চল যায় গা।

পৃথাও ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিল তার চাওয়াটা বেখাপ্পা হয়ে গেছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে বলে, ইতনা জায়গা হ্যায়, ছোটা রুম কাহে বানায়া?

ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে মালকিন বলে, ঠান্ডামে ছোটা রুম গরম রহেতা হ্যায়। বহুত পসন্দ করতা হ্যায় কাপল লোগ।

পৃথা আর কথা বাড়ায়নি, রুমে লাগেজ রেখে মালকিনের সঙ্গে গেছে কিচেনে। সেখানে আর এক মালকিন রান্নার জোগাড় করছে, তাদের সঙ্গে আড্ডা মারছে পৃথা। অনিমেষ একবার ঘুরে এসে এখানে বসেছে। ভেবেছিল ড্রাইভারের সঙ্গে কথাটথা বলে টাইম কাটবে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সঙ্গী বলতে এখন অবসাদগ্রস্ত কুকুর।

পৃথা এই পাহাড়ি নির্জনতায় আসতে চাওয়ায় অনিমেষের মনে একটা ক্ষীণ আশা তৈরি হয়েছিল, নিজেদের মধ্যে গোলমালটা একান্ত সান্নিধ্যে

BanglaBook.org

মিটিয়ে ফেলা যাবে। পৃথার হয়তো তেমনটাই ইচ্ছে। ওর এমন অনেক কিছু বলার আছে, প্রকৃত নির্জনতা ছাড়া বলা যাবে না।

অনিমেষের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, পৃথা একা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা পাহাড়ের মতো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, লোকজন পেলেই রোদ পড়ছে ওর মুখে। সুগতরা, স্কুলের মেয়েগুলো, নেপালি দুই মালকিন সবার সামনে বেশ স্বচ্ছন্দ থাকছে পৃথা। সুগতদের সঙ্গে ট্রেক করতেও রাজি হয়ে গিয়েছে। ছেলে তিনটের সব ভাল লাগছে অনিমেষের, শুধু একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হচ্ছে, দেশ, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে ওরা কোনও কথাই বলছে না। রাজনীতি অবজ্ঞা করে দিব্যি আছে ওরা! পৃথাও বেশ মানিয়ে নিয়েছে ওদের সঙ্গে।

তা হলে পৃথার আসল উদ্দেশ্যটা কী? এই নিরালায় এনে ও কি এটাই বোঝাতে চাইছে, পৃথিবীতে যদি শুধু আমরা দু'জন বেঁচে থাকি, তাও আমাদের সম্পর্কটা জোড়া লাগবে না।

পৃথা অনিমেষের কাছে জীবনে একটাই জিনিস মুখ ফুটে চেয়েছে, ডিভোর্স। মিউচুয়াল ডিভোর্স। চেঁচামেচি, লোক জানাজানি, এসব সে চায় না, কেসটা কোর্টে ঝুলে থাকুক তেমনটাও তার পছন্দ নয়।

উপহারটা পৃথাকে এখন অবধি দিতে পারেনি অনিমেষ, আবার এও জানে দিতে তাকে হবেই। যে-অপমানটা পৃথাকে সে করছে, সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও, ওর মতো মেয়ে সেটা ভুলতে পারবে না।

পৃথা যেদিন বলল, 'আমার অস্তিত্বটা গ্রাস করতে চাইছেন তোমার বাবা', অনিমেষ নিজেকে সামলাতে পারেনি, সপাটে চড় কষিয়ে দিয়েছিল পৃথার গালে। দেড়-দু' হাত দূরে ছিটকে পড়ে যায় পৃথা। ওর চোখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিকে ছিল নিদারুণ বিস্ময়, সেই ফাঁকে মরে গেল অনিমেষের জন্য তুলে রাখা সমস্ত হাসি, মজা। আর কখনও অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হাসেনি পৃথা। তার পরের দিন থেকে সিঁদুর পরা বন্ধ করল, শাঁখা, পলা আগেই ছেড়েছে। সিঁদুর নিয়ে কোনও সংস্কার নেই অনিমেষের, সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেছে বলে, পৃথার ফাঁকা সিঁথি দেখলে নিজেকে বড্ড নেই নেই মনে হচ্ছিল।

মা এসে ধরেছিল অনিমেষকে, সে কী রে, বউমা তো সিঁদুর পরা বন্ধ

BanglaBook.org

করে দিল! পাড়ায়, লোকসমাজে আমাদের তো নাক কাটা যাবে। তা ছাড়া তোর মঙ্গলের দিকটাও ভাবতে হয়।

পৃথার হয়ে একটা দুর্বল অজুহাত দিয়েছিল অনিমেষ, সিঁদুর পরলে ওর মাথায় র‍্যাশ বের হয়। এমনিতে আজকাল অনেক বউই সিঁদুর পরে না। কিছু যায় আসে না তাতে।

আমাদের আসে যায়। তুই এক কাজ কর, বউমাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যা। যদি মনে করিস এ সংসারে টাকা দেওয়া উচিত, দিবি। দিতেই হবে এমন জোর করব না। বউমা না থাকলে, অভাবে হলেও, আমরা শান্তিতে থাকব।

মায়ের কথার কোনও উত্তর দেয়নি অনিমেষ। মাকে তো আর বলা যায় না, পৃথা বলেছে, তোমাদের জন্য আলাদা ফ্ল্যাট কিনে দিতে। বললে, যাচ্ছেতাই অবস্থা হত।

অনিমেষ কোনওদিনই মারকুটে ছিল না। ছোটবেলায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মারামারি করার কোনও স্মৃতি নেই। বরং এক-দু'বার বোকার মতো মার খেয়েছে। পৃথাকে হঠাৎ কেন সেদিন মেরে বসল, ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। ক্রমাগত ব্যার্থতা বোধ থেকেই কি জমা হয়েছিল এই আক্রোশ? আছড়ে পড়ল পৃথার গালে, যাকে সে নিঃশর্তভাবে ভালবেসেছে।

ব্যর্থতার শুরু পার্টির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া থেকে। সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কারণ একটাই, ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হবে না। ক্ষমতার লোভ সেভাবে ছিল না অনিমেষের, সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটা পছন্দ হচ্ছিল না।

নানান অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল তারাদাস স্যারের কাছে। একসময় প্রাইভেট পড়াতেন অনিমেষকে। উনিই অনিমেষকে রাজনীতির হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। এখন ট্রেড ইউনিয়নের বড় নেতা। অনিমেষের সব কথা শুনে বললেন, কী দরকার তোর সেন্ট্রাল কমিটিতে ঢুকে! বইমেলা, বিজ্ঞানমেলা, কালচারাল কাজকারবার নিয়ে থাক না। খুব একটা ক্ষতি কিছু হবে না।

'ক্ষতি' শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল অনেক কিছু। তারাদাস স্যারকে নিয়ে যেসব কথা পার্টির মধ্যে চালু ছিল, সত্য প্রমাণিত হল সেদিন।

BanglaBook.org

স্যারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এতটাই স্ফীত হয়েছে, এম পি ইলেকশনে নমিনেশন পাচ্ছেন না। নমিনেটেড হতে গেলে অ্যাকাউন্ট ডিসক্লোজ করতে হয়।

অনিমেষের মনে পড়ছিল এ বাড়ির একতলায় বসে স্কুলের পড়া ছাড়াও, মার্কসবাদ বোঝাতেন স্যার। রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারটায় ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। হায়ার সেকেন্ডারির পর ওই ঘরে অনিমেষও ক্লাস নিয়েছে। ক্লাস শেষে গান হত, এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো।

সেসব দিন এখনও চোখে ভাসে, মিছিল ফেরত কারখানার শ্রমিকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে স্যারের বাড়ির সামনে। স্যারের বউ দীপাকাকিমা ভোররাত থেকে উঠে দিস্তে দিস্তে রুটি করেছেন। দুটো রুটির মাঝে আখের গুড় দিয়ে মুলো করে শ্রমিকদের হাতে সাপ্লাই দিচ্ছে অনিমেষ। কেউ বাড়িয়ে দিচ্ছে জল, ওই সামান্য খাবার খেয়ে পথক্লান্ত মানুষগুলোর কী তৃপ্তি। একগাল হাসি, সহজ সরল ঠাট্টা, মশকরা...

কত অনাড়ম্বর ছিল সেই সময়ের জীবনযাপন। ধীরে ধীরে সব কেমন যেন পালটাতে লাগল। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পার্টির উদারনীতি আপোস এমন জায়গায় পৌঁছোল, জাতীয়তাবাদী পার্টির সঙ্গে নিজেদের তেমন তফাত করা যাচ্ছিল না। নতুন যেসব ছেলে পার্টিতে আসছে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। সেই সময় নতুন কমরেডদের নিয়ে ক্লাস করার উদ্যোগ নিয়েছিল অনিমেষ, লোকাল কমিটি তাকে উৎসাহ দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পাওয়া গেল না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তারা অনিমেষের বন্ধু তাপসের নির্দেশে অন্য কাজে গেছে।

তাপসকে গিয়ে ধরেছিল অনিমেষ, ক্লাস আগে না পার্টির কাজ আগে? ছেলেগুলোকে তো জানতে হবে, তারা কী পার্টি করে, আদর্শ কী হওয়া উচিত।

তাপস ঠান্ডা মাথায় বলেছিল, সব হবে বাবা, আগে পার্টির পায়ের তলায় মাটিটা শক্ত হয়ে যাক। তারপর যত খুশি ক্লাস করাস।

তাপস অনিমেষদের এলাকার এম এল এ হয়েছে। ক্লাস আর হয়নি। তাতে তো কোনও ক্ষতি হয়নি পার্টির। অনিমেষ বেছে নিয়েছে নিজের

BanglaBook.org

পছন্দমতো শিক্ষা-সংস্কৃতির কাজ। এই কাজটা যে পার্টির অস্তিত্ব রক্ষায় খুব একটা সাহায্য করে না, বুঝতে সময় লেগেছে। ততদিনে পার্টির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে। চোখের সামনে দেখেছে, পার্টির সক্রিয় কর্মী সদর্পে ঢুকে যাচ্ছে দুর্গাপুজোর কমিটিতে, তা নাকি শোধনের জন্য। প্রমোটারের কোলঘেঁষা হয়ে গেল কয়েকজন, সেটারও হয়তো কোনও অজুহাত ছিল।

তাপসকে জিজ্ঞেস করেছে অনিমেষ, এসব কী হচ্ছে, কোনও স্টেপ নিচ্ছিস না কেন ওদের এগেনস্টে?

উত্তরে তাপস বলেছে, একটা ব্যাপার ভুলে গেলে চলবে না, পুঁজিবাদের মালমশলা ঝাড়াইবাছাই করে গড়তে হবে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র আকাশ থেকে পড়ে না। তাই সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে লাভ নেই। এর মধ্যে থেকেই কাজ করে যেতে হবে।

তাই করে যাচ্ছে অনিমেষ। ছাত্রাবস্থার সেই তাগিদ আর নেই। গন্ধহীন ফুল যেমন মর্যাদাচ্যুত, নিখোঁজ আদর্শের কাজ তেমনই অর্থহীন। সিস্টেমের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে অনিমেষ। অল্পবয়সে বাবার প্রতি সম্ভ্রম আর নির্ভরশীলতার কারণে, পারিবারিক পুজোপাঠের সংস্কার নিয়ে প্রতিবাদ করেনি। বড় হয়ে দেখেছে পার্টির নীতিই যেভাবে পালটে গেছে, বাড়ির সঙ্গে বিরোধ করে কী লাভ?

ক্রমাগত মানিয়ে চলার মধ্যে এক ধরনের অসহায় একাকিত্ব থাকে। সেই নিঃসঙ্গ সময়ে আচমকা শিউলির গন্ধের মতো পৃথার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পৃথাকে বিয়ে করার পর অনিমেষ বুঝতে পারে নিজের ভুল, পৃথার মতো তীব্র বিশুদ্ধ মেয়েকে এ বাড়িতে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। সমাজ, পার্টির নীতি সে গ্রাহ্য করে না। ইনফ্যাক্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই তার। সে নিজের বিশ্বাসে, আদর্শে অটল। তবে ছোটখাটো আপোসে বিরাগ নেই। বিশ্বাসের বিপরীত কিছু চাপিয়ে দিতে গেলে, কিছুতেই মেনে নেবে না। বাবা-মা সেটাই করতে গিয়েছিল। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য। যাকে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কথা বলে তাপস। সংশোধন পদ্ধতিতে না গিয়ে সংঘাতে নেমে এল পৃথা। ডায়েরিটা হারিয়ে বা চুরি যাওয়ার পর থেকে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। পৃথা

BanglaBook.org

যে ডায়েরি লিখত, কোনওদিন খেয়াল করেনি অনিমেষ। ওর জিনিসপত্তরের ওপর অনিমেষের কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল কখনও ছিল না। ডায়েরিতে কী এমন লেখা ছিল এতটা খেপে গেল পৃথা?

হাততালির মতো মৃদু শব্দে সংবিৎ ফেরে অনিমেষের। ঘাড় ফেরাতে দেখে কুকুরটা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঝুলন্ত কান দুটোর জন্যই ওই আওয়াজ।

মেঘ একটু পিছিয়ে গেছে। সামনের দৃশ্য অনেকটাই দেখা যাচ্ছে এখন। কুকুরটা বারান্দা থেকে নেমে যেতে অনিমেষ দেখে, পৃথা এগিয়ে আসছে। ওর দু' হাতে চায়ের মগ।

কালো শালে মোড়া ধবধবে ফরসা পৃথা তার স্বামীর জন্য চা নিয়ে আসছে, দৃশ্যটা বাঁধিয়ে রাখার মতো। হঠাৎ এই অনুকম্পার কারণটা কী?

বারান্দায় উঠে এসেছে পৃথা। চায়ের মগ এগিয়ে দেয় অনিমেষের দিকে। চা নিয়ে অনিমেষ বলে, থ্যাঙ্ক ইউ। এই সময় চায়ের খুব দরকার ছিল।

প্রত্যুত্তরে পৃথা কোনও কথা বলে না। চা খেতে খেতে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মেঘ সরে গিয়ে ট্রেকার্স হাটের সংলগ্ন ছোট্ট বাগানটা প্রকাশিত হয়েছে, কত ধরনের রঙিন ফুল। ট্রেকার্স হাটের মালকিন দুই বোন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তাদের জায়গাটাকে আকর্ষণীয় করার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু, প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে কত নিষ্ঠার সঙ্গে এই আয়োজন, যাতে মানুষ এখানে এসে ক'টা দিন সুখে থাকে। পয়সা খরচটাকে অপচয় বলে না মনে হয়। এই আয়োজন কি অনিমেষদের বেলায় নিষ্ফল হবে? নাকি প্রকৃতির মনোহর রূপে পৃথা খানিক নরম হয়েছে। চা নিয়ে এসেছে অনিমেষের জন্য? মনোভাব বুঝতে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা শুরু করে অনিমেষ, চা-টা এরা বেশ ভালই করে, কী বলো?

হ্যাঁ।

কথা শেষ হয়ে গেল, অনিমেষ ফের কথা খুঁজে নিয়ে বলে, যতটা ঠান্ডা লাগবে ভেবেছিলাম, তেমন নয়।— কয়েক সেকেন্ড পজ নেয় অনিমেষ, যদি পৃথা কিছু বলে। ফের শুরু করে, রাতে কী হয় দেখা

BanglaBook.org

যাক।— আবার বিরতি। পৃথা নির্বাক। কথা চালাতে হয় অনিমেষকে, ঘরে ছোট একটা ফায়ার প্লেস আছে দেখলাম, সেরকম বুঝলে রাতে জ্বালিয়ে নেব, কী বলো?

পৃথার কোনও ভাবান্তর নেই। নিজেকেই সন্দেহ করে অনিমেষ, সে কি আদৌ কথাগুলো বলেছে? আরও কিছুটা সময় যায়। অনিমেষের কেন জানি মনে হয় পৃথা হয়তো কিছু বলতে এসে দ্বিধায় পড়ে গেছে।

পৃথাকে সুবিধে করে দিতে অনিমেষ বলে, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ।

অনিমেষ অপেক্ষা করে। অল্প শ্বাস নিয়ে পৃথা বলে, ডিভোর্সের ব্যাপারে কী ভাবলে?

অদূরে কুকুরটা মাথা ঝাঁকায়, মৃদু হাততালির শব্দ। অনিমেষ নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে চপল কণ্ঠে বলে, ভূতটা দেখছি এখানে এসেও মাথা থেকে গেল না।

ভূত নয়, ফ্যাক্ট। ডিভোর্স আমার ভীষণ দরকার।

চায়ে চুমুক মারে অনিমেষ, একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। মগটা কাঠের মেঝেতে রেখে অনিমেষ বলে, তারপর, ডিভোর্সের পর কী করবে?

এক্ষুনি অন্য কাউকে যে বিয়ে করব না, তা তুমি ভাল করেই জানো।

কী ভাবে জানলাম?

যেদিন ডিভোর্সের কথা প্রথম তুলি, তারপর থেকে তুমি আমার বাইরের জগৎটার ওপর নজর রাখছ। কলেজ ছুটির পর ফলো করেছিলে দু'দিন।

মনে মনে পৃথাকে তারিফ করে অনিমেষ, ঠিক দেখে নিয়েছে, এতদিন কিছু বলেনি! তিরস্কার গায়ে মাখে না অনিমেষ। বলে, ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত যদি এতটাই পাকা, এলে কেন এখানে আমার সঙ্গে?

তুমি সঙ্গে থাকলেও, আমি কিন্তু একাই আছি। নিজের মতো ঘুরছি।

ফের মেঘ জমে, ঝাপসা হয়ে যায় চারপাশ। অনিমেষ বলে, ডিভোর্সের পর কি শ্রীরামপুরে ফিরে যাবে?

এখনও কিছু ঠিক করিনি।

তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছ?

BanglaBook.org

না, তুমিও বলতে যাবে না। মায়ের শরীরটা এখন একদমই ভাল যাচ্ছে না।

কথা চালাতে ইচ্ছে হয় না অনিমেষের। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। কটেজের বারান্দা থেকে নেমে আসে লনে। উলটোদিকে কিচেন, ডরমেটরির বাড়িটা মেঘে ঢাকা, কী নির্জন শান্তি বাড়িটার স্ট্রাকচারে, প্যাগোডা বলে ভ্রম হয়। পায়ে পায়ে মূল বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় অনিমেষ। এর আগে যখন ঘুরে গিয়েছিল, দেখেছে ডাইনিংয়ের শোকেসে তাক ভরতি মদের বোতল, ভুটান, ইন্ডিয়ান সব ধরনের মদ আছে। মদ্যপানের জন্য আড়াল তৈরি করা হয় না এ অঞ্চলে। সব খাবার দোকান বার-কাম রেস্টোরেন্ট।

ডাইনিংয়ের চেয়ারে গিয়ে বসে অনিমেষ। কিচেনে উনুনের সামনে ব্যস্ত দুই বোন, এক মালকিন উঠে আসে। অনিমেষের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কুছ লাগে গা স্যার?

ভুটানি রাম পিলাইয়ে।

ও কে, বহুৎ আচ্ছা। সাথ মে কেয়া লেঙ্গে?

জো আপ কো মর্জি। পাঁপড়, স্যালাড...

মহিলা বোতল-গ্লাস নিয়ে আসে টেবিলে, রেডি করে ড্রিঙ্ক। অনিমেষ তাকায় কিচেনের দিকে। আর এক মালকিন উনুনে কাঠের টুকরো গুঁজে দিচ্ছে, গোলাকার লাল আগুন। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হয়, এই দুই মালকিনকে এক রকম দেখতে, এরা নিশ্চয়ই যমজ। যেন একই নারীর দুই রূপ। কখনও আগুন জ্বালায় সরাসরি, কখনও বা তরলের মাধ্যমে।

চার-পাঁচ পেগ খাওয়ার পর ড্রাইভার সামনে এসে উদয় হয়। হাসিহাসি মুখে হাত তুলে বলে, বাবু, ঠিক হ্যায় না?

একদম ঠিক হ্যায়। তুম কাঁহা গেয়া থা?

থোড়া নীচে, মেরা এক রিলেটিভ রহতা হ্যায়।

বাঃ বাঃ, এখানেও আত্মীয়স্বজন থাকে! এই মেঘের মধ্যে কী করে টিকিয়ে রাখো সম্পর্ক?

অনিমেষের কথা না বুঝেই ড্রাইভার হাসে। বড়ই অতিথিপরায়ণ।

BanglaBook.org

লোকটা ধীর পায়ে কিচেনে চলে যায়, উনুনের সামনে বসে হাত সেঁকতে সেঁকতে দুই বোনের সঙ্গে গল্প করে।

অনিমেষের সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই। বুকে চাপ হয়ে বসছে একাকিত্ব। বোতলের শেষটুকু গ্লাসে উপুড় করে নেয়।

ডাইনিং থেকে বেরিয়ে লনে আসে অনিমেষ। ঘন মেঘের মধ্যে আলো নিস্তেজ। বিকেল বিদায় নিচ্ছে চুপিচুপি। ঘড়ি দেখে অনিমেষ, সময় পড়তে পারে না। কটেজের বারান্দায় এখনও বসে আছে পৃথা, ওয়াশ পেন্টিং মনে হচ্ছে। কটেজের দিকে না গিয়ে বাইরে যাওয়ার গেটের দিকে এগোয় অনিমেষ। পা পড়ছে এলোমেলো। পিছন পিছন বিষণ্ন কুকুরটা যাচ্ছে, দু'-চারবার ঘেউঘেউ করল। ঠান্ডায় বসে যাওয়া গলা কুকুরটার। অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ে প্রচুর গালাগাল দিল কুকুরটাকে। তারপর গেট খুলে বেরিয়ে পড়ল।

দশ-পনেরো হাতের বেশি দেখা যাচ্ছে না। অনিমেষ এগোতে থাকে, রাস্তা আরও একটু প্রকাশিত হয়, বিশাল একটা পাথরখণ্ড দেখা যাচ্ছে, যার পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে বেঁকে। অনিমেষ যত এগোয় মেঘ যেন পিছিয়ে যায়। বেশ একটা খেলা পেয়ে যায় সে। টলোমলো পায়ে মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায় অনিমেষ।

সন্ধে সাতটা। টুমলিংয়ে যেন মাঝরাত। সোলার এনার্জিতে টিমটিম করে কয়েকটা বাল্‌ব জ্বলছে ট্রেকার্স হাটে। ঘণ্টাখানেক হল সুগতরা এখানে পৌঁছেছে। বিশাল ডরমেটরি ঘরটার তিনটে খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছে ওরা। মনমেজাজ খুবই খারাপ, গা-হাত পায়ে ব্যথার পিন ফুটছে। তিনজনের মুখেই কোনও কথা নেই। মেঘমা থেকে এতটা হেঁটে আসতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ওদের। তবু মনে একটা চাঞ্চল্য ছিল, দু'জন আমাদের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে টুমলিংয়ে। এই সুখের ভাবনাটাই ছিল ওদের স্পিরিট।

ট্রেকার্স হাটের সামনে এসে দেখে কেউ ওদের অপেক্ষায় নেই। তখন এমনই হা-ক্লান্ত, গেটের উলটো দিকে বাঁশের মাচায় বসে পড়ে। একটা

BanglaBook.org

করে সিগারেট ধরায় তিনজনেই। এখানে কোনও তাড়াহুড়ো নেই, সম্ভাবনা নেই সমস্ত জায়গা বুক হয়ে যাওয়ার।

অনিমেষদের জিপটাকে গেটের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকাতে দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। পৃথাদিরা এখানেই এসেছে। বাপ্পা তখন কমেন্ট করে, দ্যাখ, বরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে কোনও ঘরে। আমরা যে আসব খেয়ালই নেই।

সুগতর মুখে চলে এসেছিল একটা কথা, তুই কি ভেবেছিলি, তোকে জড়িয়ে শোবে। —ক্লান্তির কারণেই কথাটা আর বলেনি।

মাচায় বসে থাকতে ওরা লক্ষ করে, ট্রেকার্স হাটের দুটো পোরশন, ব্যস্তসমস্ত হয়ে এবাড়ি ওবাড়ি করছে দু'-তিনজন। অনিমেষদার ড্রাইভারকেও চোখে পড়ল যেন।

কোনও একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে ট্রেকার্স হাটের গেট খুলে ঢুকে আসে তিনজন। বাঁদিকের কটেজের একটা ঘর খোলা। আলো এসে পড়েছে সামনের জমিতে। ওই ঘরেই চার-পাঁচজনের একটা জটলা। রায়নরা পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। উঁকিঝুঁকি দিতে, দেখতে পায় খাটে বসে আছে অনিমেষদা, পুরোপুরি বিধ্বস্ত চেহারা। এলেমেলো চুল, ঘাড় তুলতে পারছে না। অনিমেষদার মুখের সামনে চা বা কফির মগ তুলেছে পৃথাদি, এমন টলমল করছে অনিমেষদার মাথা, খেয়ে উঠতে পারছে না। অনিমেষদা যে নেশায় ঝুল হয়ে গেছে, ভালই বোঝা যাচ্ছিল। তবে চেহারার হাল এতটা কেন খারাপ ধরতে পারছিল না সুগতরা।

ঘরে ঢুকে আসতে ড্রাইভার সব জানায়, প্রচুর নেশা করে একা হাঁটতে বেরিয়েছিল অনিমেষদা।

সন্ধে নেমে যাওয়ার পর ফিরে আসছে না দেখে, ড্রাইভার, পৃথাদি গাড়ি নিয়ে বেরোয় খুঁজতে। ঘন মেঘ থাকার কারণে খুঁজতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। পাওয়া গেল আধ-মাইলটাক যাওয়ার পর। রাস্তার ধারে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পড়ে ছিল উপুড় হয়ে।

বৃত্তান্ত শুনে তিন বন্ধু ভীষণ অবাক, অনিমেষদাকে এতটা তালজ্ঞানহীন মানুষ বলে তো মনে হয়নি!

BanglaBook.org

দু'-এক চুমুক গরম পানীয় খাওয়ার পর একটু যেন স্টেডি হয় অনিমেষদা। ঘাড় তুলে অপরাধী চাউনিতে ঘরের সবাইকে দেখে। সুগতদের দিকে চোখ পড়তেই বাচ্চা ছেলের মতো হেসে বলে, যাক, তোমরা এসে গেছ। তোমাদের খুঁজতেই তো বেরিয়েছিলাম। চলো আড্ডা মারা যাক।

তক্ষুনি অনিমেষদাকে নিবৃত্ত করে বাপ্পা। বলে, আপনি এখন শুয়ে থাকুন। আড্ডা মারার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

না না, আমার কিছু হয়নি। বলে বিছানা থেকে প্রায় উঠেই পড়ছিল অনিমেষদা।

পৃথাদি গম্ভীরভাবে বলে, ছেলেমানুষি করে লাভ নেই। এখানে ডাক্তার ওষুধ কিছুই পাওয়া যাবে না।

মন্ত্রের মতো কাজ হল পৃথাদির কথায়। পোষা সাপের মতো অনিমেষদা কম্বলের তলায় সিঁধোল। তিন বন্ধু সরে আসে ওদের ঘর থেকে। মালকিনের সঙ্গে কথা বলে, ডরমেটরিতে থাকার ব্যবস্থা করে নিজেদের।

চা-বিস্কিট খেয়ে সেই যে শুয়েছে খাটে, পাশ ফেরেনি পর্যন্ত। এত টায়ার্ড। পরস্পরে কথাও বলছে না। কখনও চোখ চেয়ে, কখনও বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে। স্নায়ুতে এখনও রয়ে গেছে পথ হাঁটার অস্থিরতা।

অনেকটা সময় যেতে রায়ন বলে ওঠে, না এলেই ভাল হত এখানে। কী বিচ্ছিরি একটা সিচুয়েশন হয়ে আছে। আমরা আছি বলে আরও অপ্রস্তুত বোধ করছে পৃথাদি।

বেশ খানিকক্ষণ পর বাপ্পা উত্তর দেয়, টংলুর পুরো রাস্তাটাই খাড়াই। এখানেই তোর যা অবস্থা, ওখানে তো হামাগুড়ি দিয়ে উঠতিস।

তোর অবস্থা বুঝি খুব ভাল? বলে রায়ন।

বাপ্পা তক্ষুনি উত্তর দেয় না। কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর বাপ্পা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে দেখ তো সুগতটা বেঁচে আছে কিনা?

আছি। তোরা যদি তাস খেলতে রাজি থাকিস আমি উঠে বসতে পারি। বলে সুগত।

BanglaBook.org

বাপ্পা রায়ন শোয়া অবস্থাতেই হাসে। বাপ্পা বলে, শালার হেভি এনার্জি!

চল চল, উঠে পড়ি। যত শুয়ে থাকব, আলিস্যি পেয়ে বসবে। বলতে বলতে উঠে বসে রায়ন। দেখাদেখি অন্য দু'জন ওঠে। সুগত নিজের ব্যাগ থেকে বার করে তাস।

খেলা মোটামুটি জমে উঠেছে, ওরা লক্ষ করে ঘরে বিশাল একটা ছায়া এসে পড়ল। শাড়ি পরা।

ডাইনিং রুমের আলো থেকে তৈরি হয়েছে ছায়াটা। তারপরই পৃথাদির গলা, আমি টোয়েন্টি নাইন খেলতে জানি। বসব নাকি তোমাদের সঙ্গে?

প্রাথমিক অপ্রতিভতা কাটিয়ে ওরা সাদরে ডেকে নেয় পৃথাকে। বাপ্পা বলে, তিনজনে ঠিক তাস খেলা জমে না, আপনি এসে ভালই হয়েছে।

রায়ন জিজ্ঞেস করে, অনিমেষদা এখন কেমন আছেন?

ভাল। ঘুমোচ্ছে। বলে, বাপ্পার খাটে বসে পৃথা। বাপ্পা একটু সংকুচিত, তাই দেখে মিটিমিটি হাসে সুগত রায়ন। নিজেদের খাট দুটো বাপ্পার খাটের সঙ্গে জোড়া লাগায়।

খেলা শুরু হয়। তাস খেলায় পৃথা মোটেই আনাড়ি নয়। খেলার মধ্যেই চলে টুকটাক কথাবার্তা। কে কোথায় থাকে, কী কী করে। তিন বন্ধুর কারও প্রেমিকা নেই জেনে ভারী অবাক হয় পৃথা। সুগত অবশ্য বলে, আমার একটা কেস হব হব করে হচ্ছে না।

কী রকম? পৃথা কৌতূহলী হয়।

মেয়েটি কলকাতার এক নামকরা নার্সিংহোমে নার্সের কাজ করে। সদ্য চাকরিটা পেয়েছে। তাই এখন রোজই নাইট ডিউটি।

তো তাতে অসুবিধেটা কোথায়? জানতে চায় পৃথা।

বোর্ডে নিজের তাসটা ফেলে সুগত বলে, দিনেরবেলায় মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে গেলে বড্ড হাই তোলে, গায়ে ওষুধের গন্ধ।

রায়ন, বাপ্পা হেসে উঠলেও, পৃথা হাসে না। নিজের দান ফেলতে ফেলতে বলে, গন্ধ, হাই তোলা, এগুলো ছুতো, তোমার আসল প্রবলেম বোধহয় নাইট ডিউটি নিয়ে।

BanglaBook.org

থতমত খেয়ে যায় সুগত। বাপ্পা রায়ন বুঝতে পারে পৃথাদি সহজ মানুষ নয়, হিসেব-নিকেশ করেই কথা চালানো উচিত।

রায়ন কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যায়, পৃথার কলেজ, পড়ানো নিয়ে আলোচনা করে। স্টুডেন্টরা পৃথাকে কতটা সমীহ করে...

ইতিমধ্যে ট্রেকার্স হাটের মালকিন বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে যায়, সোলার লাইট রাত দশটা অবধি জ্বলবে। তারপর মোমবাতি ভরসা। সাড়ে ন'টার মধ্যে বোর্ডাররা যদি খেয়ে নেয়, কাজের সুবিধে হয় ওদের।

ঘড়ি দেখে পৃথা, আটটা বাজছে। খেতে এখনও অনেক দেরি। তাস খেলতে আর ভাল লাগছে না, রাউন্ডের মাঝপথে হাতের সব ক'টা তাস ফেলে পৃথা বলে, অন্য কোনও খেলা হোক।

কী খেলা? জিজ্ঞেস করে সুগত।

একটু ভেবে পৃথা বলে, অন্ত্যাক্ষরী।

বাপ্পা প্রায় চমকে উঠে বলে, মাথা খারাপ, আমার গান শুনলে এখানকার কুকুরটা পর্যন্ত শিয়ালের ডাক ডাকতে শুরু করবে।

সেটা যে সত্যি রায়ন সুগত জানে। দু'জনেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে বাপ্পার গলায় গান শোনা। রায়ন বলে, তার থেকে একটা অন্য খেলা হোক।

কী খেলা? জানতে চায় পৃথা।

রায়ন বলতে থাকে, আমরা তো জীবনে কখনও না কখনও কোনও ঘটনায় খুব বোকা বনে গেছি, পছন্দমতো একটা করে বোকা হয়ে যাওয়ার গল্প বলব। প্রথম শুরু করবে সুগত। ডিউরেশন ম্যাক্সিমাম তিন মিনিট।

ও কে, নো প্রবলেম। বলে, সুগত শুরু করে, আমি তখন ইলেভেনে পড়ি। ছুটিতে মামারবাড়ি যাচ্ছি। ট্রেনে করে। প্রায় ফাঁকা কম্পার্টমেন্ট। অন্ধ ভিখারি থালা ঝাঁকিয়ে এল সামনে। অনেক খুচরো পয়সা, কয়েন। ভিখিরিটার ওপর হিংসে হল আমার, অত পয়সা আমার পকেটে থাকে না। মিষ্টি করে বললাম, দুটো টাকার কয়েন দিয়ে এক টাকা তুলে নেব? 'নিন না বাবু' বলে সায় দিল ভিখারিটা। আমি ঠিক উলটোটা করলাম। ভিখিরি কিছু না বুঝে নমস্কার ঠুকে চলে গেল।

BanglaBook.org

সুগতকে চুপ করে যেতে দেখে বাপ্পা বলে, এখানে তো ভিখারিটাই বোকা বনে গেল। তুই কি রায়নের দেওয়া বিষয়টা বুঝতে পারিসনি?

বুঝেছি। আমার বলা এখনও শেষ হয়নি। ফের নতুন করে শুরু করে সুগত, সেই ভিখারিটাকে একদিন হাওড়া স্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেখলাম। ভোরের ট্রেনে হাওড়া পৌঁছেছি, লোকটা চানটান করে, আয়না সামনে রেখে চুল আঁচড়াচ্ছে।

পুরো বানানো। এমন চিৎকার করে উঠল বাপ্পা, চমকে উঠেছে বাকি তিনজন। অনুযোগের সুরে বাপ্পা রায়নকে বলে, আগাগোড়া বানিয়েছে মাইরি। আগেকার দিনের কোনও ছোটগল্প থেকে ঝেড়েছে। এই হল সুগতর দোষ, বোকা হয়ে যাওয়ার গল্প বলতে গিয়ে চালাকি করছে।

সুগত কোনও প্রতিবাদ না করে, চোখ পিটপিট করে দেখছে রায়ন কী সিদ্ধান্ত নেয়।

পৃথা বাপ্পাকে বলে, ঠিক আছে ওর গল্পটাকে আমরা ডিসকোয়লিফাই করলাম। এবার তুমি বলো।

বাপ্পা শুরু করে, তখন আমার কত আর বয়স হবে, আট-নয়। মায়ের সঙ্গে গেছি গুরুদেবের আশ্রমে। গুরুদেব মারা গেছেন। গুরুমা আশ্রমের হেড। মা আমাকে বারবার বুঝিয়েছে, ওঁর সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি না। চট করে প্রণাম করবি। আমাকে যেন বলতে না হয়।— আমি একটু হাঁদা টাইপের ছিলাম। তাই মা...

সেই তুই এখনও আছিস। ফুট কাটে সুগত। বাপ্পা কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নিয়ে ফের বলতে থাকে, আশ্রমে ঢুকে গুরুমার কুঁড়েঘরের দিকে এগোচ্ছি। বুক ঢিপঢিপ, হাত ধরে আছি মায়ের। আশপাশে সাদা থান পরা কত বয়স্ক মহিলা, গুরুমাকে গুলিয়ে ফেলব না তো? ঠিক তাই হল। কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন এক মহিলা। মা দাঁড়িয়ে পড়েছে তাঁকে দেখে, আমি ঝপ করে প্রণামটা সেরে নিলাম। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে উনি বলে উঠলেন, আমি না আমি না, ভেতরে...

এমন অভিনয় করে দ্যাখাল বাপ্পা, বাকিরা হেসে কুটোপুটি। তখনই ঘরে ভেসে এল গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ, আমি কি আমার বোকা হওয়ার একটা ঘটনা বলতে পারি?

BanglaBook.org

সবাই ঘুরে তাকায় দরজার দিকে, অনিমেষ এসে দাঁড়িয়েছে। সুগত সাদর সম্ভাষণ জানায়, আরে আসুন আসুন। আপনি ছিলেন না বলে পুরোপুরি জমছিল না। শরীর এখন ফিট তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে খাটে এসে বসে অনিমেষ। সবার মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, আমি একটা সময় ভীষণ ডিপ্রেশনে ভুগছিলাম। অবস্থা এমন পর্যায় চলে গিয়েছিল, আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবে ফেলেছি। কিন্তু পদ্ধতিটা কী হবে? যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু যাতে না হয় সেইজন্য ঘুমের ওষুধ জমাচ্ছিলাম আমি। একদিন সত্যিই মৃত্যুর বড় ঝোঁক এল, লুকোনো জায়গা থেকে ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বার করতে গিয়ে দেখি একটাও নেই! এদিকে এক মুহূর্ত বাঁচতে ইচ্ছে করছে না....

কথার মাঝে উঠে গেল পৃথাদি। হাঁটায় তড়িঘড়ি ভাব। রায়ন অবাক হয়ে অনিমেষকে জিজ্ঞেস করে, কী হল বলুন তো! হঠাৎ উঠে গেলেন...

অনিমেষ খাট থেকে নেমে আসতে আসতে বলে, প্রচণ্ড খেপেছে। তোমরাও এসো আমার সঙ্গে। একা সামলাতে পারব না।

অনিমেষকে অনুসরণ করে কটেজের সামনে আসে রায়নরা। বারান্দায় জ্বলছে ঝিমোনো বাল্ব। অনিমেষের রুমের দরজা বন্ধ। রুমটার নাম আইরিশ। দরজায় লেখা। দরজায় নক করে অনিমেষ। ভেতর থেকে কোনও সাড়া নেই। আবারও নক করে, নাম ধরে ডাকে অনিমেষ। কোনও লাভ হয় না।

বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে শরীরে। রায়নরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। পৃথা! পৃথা! বলে ডেকে যায় অনিমেষ। এই চরাচরে আর কোনও শব্দ নেই। ঠান্ডা অন্ধকার রাতে অনিমেষের ডাকটাকে কেমন যেন অপার্থিব মনে হয়।

BanglaBook.org

দশ

আপনি কি জানেন, আমরা দু'জন এখন বিদেশে!

রায়নের কথায় অবাক হয়ে মুখে তোলে পৃথা। বলে, বুঝলাম না।

রায়ন আঙুল তুলে বড়সড় সিমেন্টের হলুদ ফলক দেখায়, যার ওপর কালো অক্ষরে ইংরেজিতে ঘোষণা, সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে এই এলাকাটা নেপাল সরকারের।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পৃথার মুখ। বলে, আরিব্বাস, দারুণ ব্যাপার তো!

ঢালু সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রায়ন, পৃথা। সমান্তরালভাবে ভারতের রাস্তা ফুট দশেক দূরে। মাঝে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ভারতের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে বাপ্পা, সুগত। কিছুক্ষণ আগে পৃথারা ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, কী মনে হতে নেমে আসে মাঠে। এত সহজে যে বিদেশে চলে আসা যায়, ভাবতেই পারেনি পৃথা। বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছে। রায়নকে বলে, তোমার বন্ধুদের বিদেশে ডেকে নাও।

আপনি ডাকুন। বলে রায়ন।

বাপ্পা-সুগতর উদ্দেশে গলা তোলে পৃথা, অ্যাই, আমরা কিন্তু এখন বিদেশে। আসবে নাকি তোমরা? কোনও এক্সট্রা খরচ লাগবে না।

পৃথার কণ্ঠ বাতাসে সুরমূর্ছনা তোলে। অনাবিল প্রকৃতিতে পাখির ডাকের সঙ্গে তুলনা চলে যার। কে বলবে এই মহিলাই কাল রাতে রাগে অভিমানে দোর এঁটে বসে ছিল।

পৃথার ডাকে ঘাড় ফিরিয়েছে বাপ্পা, সুগত, এখনও কোনও উত্তর দেয়নি। সত্যি বলতে কী সবুজ গালচের মতো মাঠে, নীল-হলুদ সালোয়ার-কামিজের পৃথাকে দেখে ওরা ফের একবার মোহিত হয়েছে। এই উপত্যকায় এখন বৃষ্টিধোওয়া আলো। কালো সানগ্লাস পৃথাদির চোখে। কাল সারারাত বৃষ্টি পড়েছে পাহাড়ে।

কী হল, চলে এসো। ফের ডাকে পৃথা।

ঘোর কাটিয়ে বাপ্পা বলে, আমরা নিজেদের দেশেই ঠিক আছি।

BanglaBook.org

আপনারাও কাছাকাছি থাকবেন। গাড়ি নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই আসবেন অনিমেষদা।

পৃথাদি মুখ নামিয়ে নিল, সম্ভবত অনিমেষদার নাম উঠল বলে। পৃথাদিকে নিয়ে এই জার্নিটা ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না বাপ্পার। বুঝতে পারছে, একটা বড় কোনও ঝামেলার মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঢুকে পড়ছে তারা। অনিমেষদা, পৃথাদি দু'জনেই খুব শিক্ষিত মানুষ। তাই তাদের দাম্পত্যকলহটাও জটিল। বাপ্পারা ওদের ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

কাল রাতে অনেক ডাকাডাকির পরও যখন দরজা খুলছিল না পৃথাদি, বাপ্পারা ঠিক করে দরজা ভেঙে ফেলবে। ট্রেকার্স হাটের দুই মালকিন ততক্ষণে কটেজের সামনে চলে এসেছে। তারাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন, পারমিশন দিয়ে দেয় দরজা ভাঙার। ড্রাইভার আনতে যায় ভারী কোনও জিনিস। যা দিয়ে ভাঙা হবে। এই ফাঁকে বুদ্ধি খাটায় রায়ন, বন্ধ দরজার এপার থেকে বলে, পৃথাদি, দরজা কিন্তু ভাঙতেই হচ্ছে। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে লজের মালিকের। আপনি ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। কত সুন্দর করে সাজিয়েছে কটেজটা, সেটাও নষ্ট হবে।

রায়নের কথার একটু পরে খুট শব্দে দরজা খুলে যায়। বন্দি বিড়ালের মতো থমথমে হয়ে আছে পৃথাদি। ঘটনাটা কী ঘটল, কেন পৃথাদি দরজা বন্ধ করে বসে রইল, কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না বাপ্পাদের। অনিমেষদা পৃথাদিকে কিছুই না বলে ধড়াস করে গিয়ে বসল বিছানায়। চেহারা জুড়ে হতাশ ভাব। রায়ন চেষ্টা করেছিল কৌতূহল মেটাতে, নিশ্চল পৃথাদির সামনে গিয়ে বলে, কী ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ এরকম রেগে গেলেন?... আমরা তো চিন্তায়...

সুগত রায়নের পিঠে টোকা মেরে ডেকে নেয়। যেন কিছুই ঘটেনি এমন সুরে সুগত বলে, চলো সবাই খেয়ে নিই। অনেক রাত হয়ে গেছে। একটু পরেই আলো চলে যাবে।

আমি খাব না। বলেছিল পৃথাদি।

সুগত বলে, তা কী করে হয়, আপনি অভুক্ত থাকবেন, আমরা খেয়ে নেব! তা ছাড়া রাগ করে না খাওয়াটা বাচ্চা মেয়েদের মানায়।

BanglaBook.org

রোষভরা দৃষ্টিতে পৃথাদি একবার সুগতর দিকে তাকিয়েছিল, একই সঙ্গে হাঁটতেও শুরু করেছিল মেন বাড়ির দিকে।

খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে বসেছিল পৃথাদি, খেতে পারছিল না কিছুই। মুখে কান্নার তেমন ছাপ নেই, চোখ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে অঝোর জল।

একটা সময় উঠে পড়ল খাওয়া ছেড়ে। বাপ্পারা আর বাধা দেয়নি। মালকিনের সার্ভ করা গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে পৃথা ফিরে গেল কটেজে।

বাপ্পারা নীরবে খেয়ে যাচ্ছিল, জানার ইচ্ছে থাকলেও অনিমেষদাকে জিজ্ঞেস করছিল না পৃথাদির এহেন আচরণের কারণটা কী?

সবাইয়ের জন্য লার্জ পেগ রাম চেয়ে নিয়ে অনিমেষদা নিজেই বলতে শুরু করল, পৃথার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে। বেড়াতে এসেছিলাম, যাতে ওর মনটা ভাল থাকে, ভুলে থাকে ওইসব বদ ভাবনাচিন্তা। কিন্তু কেন জানি ওর মেজাজ দেখে আমার মনে হচ্ছিল, খেয়ালটা ওর মাথা থেকে যায়নি। আজ যখন তোমাদের সঙ্গে পৃথা গল্প করতে এল, আমি ওর ব্যাগ সার্চ করি। চারটে ঘুমের ট্যাবলেটের স্ট্রিপ পাই। খুবই কড়া ডোজ। স্ট্রিপগুলো আমি ফেলে দিই। তারপর যাই তোমাদের কাছে, গল্পের ছলে পৃথাকে বুঝিয়ে দিই ট্যাবলেটগুলো ফেলে দিয়েছি আমি। তাতেই ফিউরিয়াস হয়ে যায় ও।

তিন বন্ধু তো পুরো থ। পৃথাদিকে দেখে তো বোঝার উপায় নেই, মাথায় এরকম মারাত্মক ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম দিকে গম্ভীর থাকলেও, পরে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছিল বাপ্পাদের সঙ্গে।

অনিমেষদার কথার পর অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল তিন বন্ধু। নীরবতা ভাঙে রায়ন। বলে, ওঁকে ডাক্তার দেখিয়েছেন?

অনিমেষদা বলেছিল, স্বনির্ভরশীল শিক্ষিত মেয়েদের নিয়ে এই এক মুশকিল, তারা নিজে যা ঠিক বোঝে, তাই করে। খামোকা হ্যাজবান্ডের কথা শুনতে যাবে কেন।

ওঁর এই ডিপ্রেশনের সূত্রটা কী? ডাক্তারি গাম্ভীর্যে ফের জানতে চেয়েছিল রায়ন। সুগত, বাপ্পা, তখন প্রমাদ গোনে, অনিমেষদা যদি

BanglaBook.org

বলে দেন, তোমায় কেন এত পার্সোনাল ব্যাপার জানাতে যাব ভাই?

অনিমেষদা সে রকম কোনও কথাই বললেন না। খুবই সজ্জন লোক। শুধু বললেন, বাপেরবাড়ি নিয়ে ভীষণ ডিসটার্বড থাকে পৃথা। তা ছাড়া কে কোন পরিস্থিতিতে কতটা ডিপ্রেস হবে, সেটা ডিপেন্ড করছে সেই মানুষটির ওপর। একটু থেমে অনিমেষদা বলে, তোমাদের আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, বাকি ট্যুরটা আমাদের সঙ্গে থেকো। গল্প-আড্ডার মধ্যে থাকলে পৃথা অনেক ভাল থাকবে।

ট্যুর প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে দেখে বাপ্পাকে বলতেই হয়েছিল, আমরা কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে ফিরব না। সান্দাকফুর পর ফালুট, গোর্খে, রাম্মাম, রিম্বিক হয়ে গাড়িতে দার্জিলিং অর ডাইরেক্ট এন জে পি।

আমরা না হয় তেমনটাই যাব। বলেছিল অনিমেষদা।

বাপ্পা বলে, গাড়িতে বোধহয় ওই রাস্তায় যাওয়া যাবে না। এখানকার থেকেও খারাপ অবস্থা। সান্দাকফু দেখে নেমে আসতে হবে আপনাদের। তবে সান্দাকফু দেখা হয়ে গেলে আর কিছু দেখার থাকে না।

আলোচনা আরও এগোত। সুগত ছেদ টেনে বলেছিল, পরের প্ল্যান কাল হবে। অনিমেষদা, আপনি এখন রুমে যান, পৃথাদি একলা আছে।

হ্যাঁ যাই। কাল সকালে দেখা হবে। বলে, বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে উঠে গিয়েছিল অনিমেষদা। হাতমুখ ধুয়ে বাপ্পারা ঠিক করে লনে পায়চারি করতে করতে সিগারেট খাবে। দু'মিনিটের বেশি সেখানে টিকতে পারেনি ওরা। এত ঠান্ডা! ঘরে এসে ডবল কম্বলের তলায় ঢোকে।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়, কী করা যায়? অনিমেষদারা ঘুম থেকে ওঠার আগেই কি হাঁটা দেবে ওরা? টেকাস রুট ধরে যাবে, দেখা হবে না অনিমেষদাদের সঙ্গে।

সুগত বলেছিল, সান্দাকফুতে গিয়ে দেখা তো হবেই, অত ছোট জায়গা, লোকজন নেই, তখন অপ্রস্তুতের একশেষ।

বাপ্পা সুগতকে অবাক করে রায়ন বলে উঠেছিল, আরও একটা দিন ওদের সঙ্গে আমাদের থাকা উচিত। পৃথাদি স্টেবল হয়ে গেলে আমরা নিজেদের পথ দেখব। রায়ন প্রথম থেকে অনিমেষদাদের এড়াতে

BanglaBook.org

চেয়েছে এখন গাইছে অন্য সুর। পৃথাদির সঙ্গে এমনভাবে হেঁটে যাচ্ছে, যেন কতদিনের চেনা।

পৃথাদির হাঁটার কারণটা তৈরি হল সকালে। ব্যাগট্যাগ বেঁধে, জুতো-পোশাক পরে বাপ্পারা রেডি হয়ে লনে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখে, যেন পৃথাদি নয়, তার বোন সালোয়ার-কামিজ সোয়েটার পরে কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে। বাপ্পাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠল, সরি, তোমাদের কপালে গাড়ি নেই। হেঁটে যেতে হবে আপাতত। আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।

ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল তিন বন্ধু। সুগত জানতে চায়, গাড়ির কী হল?

গাড়ির কিছু হয়নি। হয়েছে তোমাদের অনিমেষদার। বলেছিল পৃথাদি।

রায়ন জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

শরীর ভাল নেই। ভীষণ মাথার যন্ত্রণা। ওষুধ খেয়ে শুয়ে আছে। আমাকে বলল, তুমি ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকো। আমি বেটার ফিল করলেই, গাড়ি করে গিয়ে তোমাদের তুলে নেব।

পৃথাদির কথায় কনভিন্সড হয়নি রায়ন। কটেজের রুমের দিকে যেতে যেতে বলেছিল, দেখি তো কী হয়েছে, কতটা অসুস্থ?

বাঁকা হাসি সহ পৃথাদি বলেছিল, হ্যাঁ, একবার দেখেই নাও, বানিয়ে বলছি কিনা।

তিনজনেই অনিমেষদার ঘরে যায়। দেখে সত্যিই খুব অসুস্থ, মাথা তুলতে পারছে না। শোয়া অবস্থায় বলে, আমার একটু মাইগ্রেন মতো আছে। কাল রাস্তায় শুয়ে ঠান্ডা লাগিয়েছি। আশা করছি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ছেড়ে যাবে। ওষুধ খেয়েছি। তোমরা পৃথাকে নিয়ে এগোও। আমি তোমাদের তুলে নেব। ওর ট্রেকিং করার শখ কিছুটা মিটবে।

সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। কে দেখবে আপনাকে? উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেছিল বাপ্পা।

উত্তরে অনিমেষদা বলে, হব না। রোগটাকে আমি চিনি। বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক ভোগাবে। তারপর একদম ফিট। তোমরা আমার জন্য সময় নষ্ট কোরো না, বেরিয়ে পড়ো।

BanglaBook.org

উদ্বেগ অনিশ্চয়তার মধ্যেই প্রস্তাবে রাজি হয় তিন বন্ধু। পৃথাদির কোনও টেনশন নেই। কাল রাতের গোলমাল, হাজব্যান্ডের শরীর খারাপ, কোনও কিছুর ছাপ নেই মুখে। খোশমেজাজে বেরিয়ে পড়ল বাপ্পাদের সঙ্গে। জঙ্গল থেকে গাছের ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে দিয়েছে বাপ্পা। সেটা হাতে নিয়ে অভিজ্ঞ ট্রেকারের মতো হেঁটে যাচ্ছে পৃথাদি। পায়ে আবার একটা জগিং-শু পরেছে।

নেপালের সীমানা ক্রমশ নিচু হচ্ছে, ভারতের রাস্তা খাড়াই। পৃথা-রায়নের দিকে তাকিয়ে থেকে সুগত বাপ্পাকে বলে, হ্যাঁরে, ওরা কি নেপালেই থেকে যাবে নাকি বল তো! বেহুঁশ হয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

অত চিন্তার কিছু নেই, ডায়গোনালি হেঁটে গেলে রাস্তা একটা জায়গায় মিট করবেই। বলে বাপ্পা।

আরও কয়েক পা হাঁটার পর ফের বাপ্পাই বলে, আচ্ছা, আমি ঠিক ধরতে পারছি না, রায়ন পৃথাদির দিকে ভিড়ে গেল, নাকি পৃথাদিই ভিড়ল রায়নের দিকে?

সুগত বলে, আমি লক্ষ করছি, প্রথম দেখা হওয়ার সময় থেকে পৃথাদি রায়নের প্রতি আলাদা অ্যাটেনশন দিয়েছে। রায়ন সেটা বুঝতে পেরেও পাত্তা দেয়নি। বরং ও পৃথাদিদের এড়াতে চেয়েছিল।

এখন ভোল পালটে ফেলল কেন? জানতে চায় বাপ্পা।

সুগত বলে, কালকের ঘটনার পর রায়নের হয়তো মনে হয়েছে পৃথাদিকে কম্পানি দেওয়া উচিত। জেনুইন মন খারাপ নিয়ে বেড়াতে এসেছে মহিলা।

আই অপোজ। বলে বাপ্পা, ব্যাখ্যা করে, আমি তো বলব মন খারাপ থাকার কথা অনিমেষদার। সদা-সতর্ক থাকতে হচ্ছে, কখন বউ সুইসাইড করে ফেলে। এটা এক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং।

সুগত চুপ করে থাকে। বাপ্পা খুব একটা ভুল কিছু বলেনি। অপজিট সেক্স বলেই পৃথাদির পক্ষ নিয়ে ফেলছে সুগতরা। ব্যাপারটা রায়নকেও বুঝিয়ে বলতে হবে। ভাবতে ভাবতে আর একবার নেপালের অংশে তাকায় সুগত। পৃথাদি-রায়নের কোনও ট্রেস নেই। সবুজ মাঠে প্রায় গোলাকার সাদা মেঘ গড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা কি মেঘের মধ্যেই ঢুকে গেল?

BanglaBook.org

যাঃ শালা, ওদের তো দেখাই যাচ্ছে না! বিস্ময় উদ্বেগ মিশিয়ে বলে ওঠে সুগত।

বাপ্পা বলে, অযথা টেনশান করিস না তো। দু'জনের কেউই বাচ্চা নয়। কত দূর আর যাবে, আশেপাশে আছে।

সিগারেটের প্যাকেট বার করে সুগত। বাপ্পাকে বলে, খাবি? মাথা নাড়ে বাপ্পা। একা সিগারেট ধরায় সুগত। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, মেয়েদের এই এক দোষ, দিব্যি তিন বন্ধু মিলে ছিলাম, খপ করে একটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

হেসে ফেলে বাপ্পা। বলে, তুই এমনভাবে বলছিস, পৃথাদি যেন বাঘিনি, শিকার করে নিয়ে গেছে রায়নকে।

কুহকী নির্জনতা এখানে। মেঘেদের মায়াখেলায় প্রকৃতি ছলনাময়ী। নিজেকে উন্মোচনে কামকুশলী নারীর মতোই পারদর্শী। এই নিসর্গের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পৃথা, রায়ন।

পৃথার বাঁ পাশে মেঘ পিছু হটতেই দেখা যায় কাচের মতো নিষ্কম্প জলাশয়। রোমাঞ্চিত হয় পৃথা। রায়নকে বলে, ওই দেখো কী সুন্দর একটা পুকুর! যাবে ওখানে?

যাওয়াই যায়। তবে কাদা হবে কিন্তু।

হোক, চলো না যাই। ওই পুকুরটার জল হয়তো আজ পর্যন্ত কেউ ছোঁয়নি। আমরাই প্রথম ছোঁব।

ছোঁওয়ার পরই দেখা গেল, আপনি হয়ে গেলেন রাজকুমারী। আমি ব্যাং। তারপর ব্যাংকে নিয়ে আপনার সে কী হয়রানি! সুগত-বাপ্পাকে দেখাচ্ছেন, ওরা বিশ্বাসই করছে না, এটাই ওদের বন্ধু...

খিলখিল করে হাসছে পৃথা। বলছে, তুমি পারোও বটে। সত্যি কী ইমাজিনেশন!

কিছু দূর এগোনোর পরই পৃথার ভুল ভাঙে, পুকুরটা মোটেই স্পর্শবঞ্চিত নয়, খানিকটা তফাতে দুটো চমরি গাই চোখে পড়ে। ঘাস খাচ্ছে।

বিস্ময়ের ঘাটতি পড়ে না তাতে। পৃথা রায়নকে দেখায়, ওই দেখো

BanglaBook.org

চমরি গাই! আমরা কী লাকি না? ওরা বেচারা দেখতে পেল না। তখন ডাকলাম ওদেরকে...।

মেঘ এখন অনেকটাই সরে গেছে। রায়ন চারপাশে চোখ বোলায়, দৃষ্টি আটকে যায় দূরে একটা কুঁড়েঘরে। একটাই চালাবাড়ি, পিছনে মেঘ।

পৃথারও চোখে পড়েছে কুঁড়েটা। বলে, বাবাঃ, এখানেও লোক থাকে তা হলে!

দু'জনে এগোতে থাকে ছোট্ট জলাশয়ের দিকে, যেখানে রোজ মুখ দেখে মেঘ, কখনও কখনও নীল আকাশ। পাখি চমকে ওঠে তারই মতো আর একটা পাখিকে উলটো হয়ে উড়তে দেখে... এসব ভাবনায় আচ্ছন্ন পৃথার মন আচমকা খানখান হয়ে যায়। দূরের কুঁড়েঘর থেকে গমগমে কুকুরের ডাক ভেসে আসে।

আমূল কেঁপে উঠে রায়নের কনুই ধরে নেয় পৃথা। ভাল করে চালাবাড়িটা লক্ষ করতে দেখে, একটা মোটাসোটা কুকুর প্রচণ্ড অস্থির হয়ে ডাকাডাকি করছে, যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলবে চেন।

ও মা গো! ভয়চকিত গলায় বলে ওঠে পৃথা।

রায়ন বলে, মনে হচ্ছে এটা কোনও চারণভূমি, গোশালা। কুকুরটাকে পাহারায় রাখা হয়েছে।

পৃথা ভীষণই ভয় পেয়ে গেছে, রায়নকে তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে। বাইচান্স চেন ছিঁড়ে যায় কুকুরটার!

প্রকৃতির নির্জন নাভির মতো জলাশয়ের পাশে এরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে, রায়নও আন্দাজ করতে পারেনি। পৃথাকে বলে, চলুন, বাপ্পারা কোথায় আছে দেখি।

মিনিট পনেরো-কুড়ি হাঁটা হয়ে গেল, বাপ্পাদের দেখা পেল না পৃথা, রায়ন। এমনকী ভারতের রাস্তাটাও বেপাত্তা। পৃথা উদ্বিগ্ন হয়। রায়নকে বলে, কী ব্যাপার বলো তো, আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেললাম নাকি?

রায়ন হাসতে হাসতে বলে, হারিয়ে গেলে আপনার খুব অসুবিধে হবে, লাগেজ রয়ে গেছে টুমলিংয়ে। এক ড্রেস পরে কাটাতে হবে হারিয়ে যাওয়ার ক'দিন।

BanglaBook.org

পৃথাদি কোনও উত্তর দেয় না। হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কী ভাবছে এখন? মনে পড়ে গেল কি কাল রাতের ঘটনা? অথবা অনিমেষদার শরীরের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছে। রায়ন অনেক ভাবনাচিন্তা করেই পৃথাদিকে নিয়ে আলাদা হাঁটছে, কায়দা করে পৃথাদির কাছে জানতে হবে, জীবন-উচ্ছল পৃথাদি কেন গাদাখানেক ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘোরে? অ্যাকচুয়াল সমস্যাটা কী? এই রূপ, বিদগ্ধ মন, শিশুর মতো সরল বিস্ময় কেন অপচয় করতে চাইছে পৃথাদি? মায়ের অকালমৃত্যুর পর থেকে রায়ন বয়ে চলেছে গভীর আর্ত অনিশ্চয়তাবোধ। খালি মনে হয় পাশের মানুষটা বুঝি হারিয়ে গেল, অনেকটা অল্প বয়সে মেলায় অভিভাবকের হাত ছেড়ে যাওয়ার মতো। এই বোধ তাকে বড় অস্থির করে, এখন যেমন ভীষণ ঝোঁক চেপেছে, পৃথাদির দুঃখটা জানার। যদি রায়নের পক্ষে সম্ভব হয় পৃথাদির মনের গোপন কুঠুরির সামনে পৌঁছোনোর, যে করে হোক দুঃখটাকে বার করে আনবে।

এ কী, এখানে এরকম সিঁড়ি কেন?

পৃথাদির প্রশ্নে সংবিৎ ফেরে রায়নের, ডান হাতি বেশ কিছুটা দূরে টিলার গা বেয়ে বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে। রায়ন বলে, মনে হচ্ছে ট্রেকার্সদের জন্য বানানো। শর্টকাট রাস্তা। চলুন ওটা দিয়েই যাই, মেন রাস্তায় মিট করবেই একসময়।

পৃথাও রাজি। কিছুটা হেঁটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে দু'জনে। পনেরো-কুড়ি ধাপ ওঠার পর নজরে আসে টিলার ওপরে ছোট্ট বৌদ্ধস্তূপ। বৌদ্ধস্তূপের মিনিয়েচার ফর্ম বলা ভাল। যেন ঝুলনে সাজানো হয়েছে।

ওটা কী ব্যাপার বলুন তো? এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বুদ্ধমন্দির।

রায়নের প্রশ্নের তক্ষুনি কোনও উত্তর দেয় না পৃথা, সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে স্তূপটা কেন ওখানে। সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হয়ে রায়নকে বলবে।

টিলার মাথায় বৌদ্ধস্তূপের কাছে পৌঁছে গেছে পৃথারা। পৃথা তাকিয়ে আছে ল্যান্ডস্কেপের দিকে, রায়নের চোখ হাঁটুসমান স্তূপটার ওপর।

কল্পনাতীত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট পৃথা রায়নের দিকে না

BanglaBook.org

তাকিয়ে বলে ওঠে, এটা কোনও এক বৌদ্ধ আচার্যর সমাধিক্ষেত্র।

কথাটা শোনার পরই রায়নের কেমন যেন একটা অস্বস্তি শুরু হয়। পৃথা বলে যায়, এখান থেকে পাহাড়ের ভিউটা কী অসাধারণ লাগছে দেখো! যাঁর সমাধি এখানে, জীবদ্দশায় উনি নিশ্চয় এই জায়গায় এসে বসতেন। সমাধিক্ষেত্র হিসেবে পছন্দ করে রাখেন এই জায়গাটাই। দু'পাশে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চোখ চলে যায় অনন্তে। শান্ত, নির্জন এই দৃষ্টিপথ। মৃত্যুর পর এখানে শুয়ে থাকার একটা আলাদা রোমান্টিকতা আছে। যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী, এই পথটাকে নির্দ্বিধায় স্বর্গে যাওয়ার পথ ভাবতে পারে।

কথা শেষ করে পাথরের ওপরই বসে পড়ে পৃথা। মৃত্যুর প্রসঙ্গ যখন এসেই গেছে, সুযোগ হাতছাড়া করে না রায়ন। বলে, আপনি কেন ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘুরে বেড়ান?

রায়নের দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে পৃথা ফের দৃষ্টি রাখে নিসর্গে। বলে, ট্যাবলেটগুলো আমার নয়, দিদির। দিদি রোজ এবেলা-ওবেলা একটা করে খায়। আমার ইচ্ছে ছিল একবারেই খেয়ে নেব।

এরকম একটা হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণটা কি একটু জানতে পারি?

সিদ্ধান্ত এখনও আমি নিইনি। শুধু ট্যাবলেটগুলো সঙ্গে রাখতাম। যদি কখনও এমন মুহূর্ত আসে, মনে হল আর বেঁচে না থাকলেও চলবে, তখনই ওষুধটা খেতাম।

কেমন মুহূর্তের কথা আপনি বলছেন?

ধরো, এমন দুঃখ পেলাম, সহ্যের অতীত অথবা এমন সুখ যে আর কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। তখনই মরার ইচ্ছে আছে আমার।

রায়ন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে ইচ্ছেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কেন? কোনওভাবে মেরে ফেলা যায় না?

বড় একটা শ্বাস ফেলে পৃথা বলে, সুইসাইডের মধ্যে আমি একটা মুক্তির পথ দেখতে পাই। যদিও আত্মহত্যা করা অত সহজ নয়, নিজের ওপর থেকে মায়া তুলে নেওয়া ভীষণ কঠিন।

মুক্তি বলতে, কোন অবস্থা থেকে মুক্তির কথা বলছেন আপনি? জানতে চায় রায়ন।

BanglaBook.org

পৃথা রায়নের চোখে চোখ রাখে। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। কয়েক পলের গাম্ভীর্য ভেঙে পৃথা হাসতে হাসতে বলে, একদিনেই সবকিছু জেনে ফেলবে?

মুখ নামিয়ে নেয় রায়ন। সত্যি, বড্ড বেশি কৌতূহল দেখানো হয়ে যাচ্ছে। দু'জনের নীরবতার মাঝে বাতাসের শব্দ ভাসে। সাঁইসাঁই। টিলাটার ওপর বেশ হাওয়া আছে, কনকনে ভাব। ওড়নাটা কানে মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে পৃথা বলে, আপাতত আমি মুক্তি চাইছি অনিমেষের থেকে।

কেন? ফের কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে ফেলে রায়ন।

পৃথা কপাল কুঁচকে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, অনিমেষকে তোমার কেমন লাগছে?

বেশ ভাল। আপনার ব্যাপারেও যথেষ্ট কেয়ার নিচ্ছেন।

পৃথা বলে, এটাই অনিমেষের ক্যামাফ্লেজ। বাইরের মানুষকে বুঝতে দেয় না ওর আসল চরিত্রটা।

মানে? অবাক কণ্ঠে জানতে চায় রায়ন।

পৃথা বলে যায়, অনিমেষ একজন অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত পজেসিভ মানুষ। স্যাডিস্টও বলা যায়। ও আমাকে মারধর পর্যন্ত করেছে।

রায়নের যেন বিশ্বাস হতে চায় না পৃথার কথা। বলে, কিন্তু উনি তো আপনাকে নির্দ্বিধায় আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন।

ও ছেড়ে দেওয়ার কে? আমি জোর করেই এসেছি তোমাদের সঙ্গে। উষ্মার গলায় বলে ওঠে পৃথা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, অল্প বয়স থেকেই আমার পায়ে পায়ে জড়িয়েছিল দুঃখ বেদনা। চাকরিবাকরি করে ভেবেছিলাম বাড়িতে সুখের আবহাওয়া আনব। কিন্তু যা হয়, মেয়েদের বয়স হয়ে গেলে বিয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। চেনা মানুষকেই বিয়ে করলাম। তখন ভাবিনি এরকম নজরবন্দি হয়ে যাব।

নজরবন্দি! কথাটা রিপিট করে রায়ন।

হ্যাঁ, অনিমেষ সবসময় আমায় চোখে চোখে রাখে। ওর সঙ্গে ঝগড়া করলেই সন্দেহ করে, অন্য কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি। লুকিয়ে কলেজ অবধি ধাওয়া করে আমাকে। এসব থেকে মুক্তি পেতে চাই

BanglaBook.org

আমি। ও আমাকে কোনওদিনও ডিভোর্স দেবে না। অধিকারবোধটাকে ভালবাসা বলে ধরে বসে আছে।... বলতে বলতে পৃথা ভাবে বেশ বেছে বেছে, এডিট করে কথাগুলো বলছে রায়নকে, অবচেতন থেকে পৃথা চাইছে অনিমেষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হোক রায়ন। কেন চাইছে নিজেই জানে না!

উত্তেজনার লক্ষণ রায়নের মুখে নেই, নিরীহ গলায় বলে, আপনি তো আপনার মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন।

ওই একটি জিনিস আমি করব না। বেশির ভাগ মেয়ে যা করে স্বামী-শ্বশুরবাড়িতে মানাতে না পেরে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। কোন অযোগ্যতার নিরিখে ফিরব বাড়ি? আমি আপাতত একা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাই, ডিভোর্স না হলে অনিমেষের রাইট থাকবে আমার কাছে যাওয়ার। ওই রাস্তাটাই বন্ধ করতে হবে। এমন কোনও পরিজন নেই আমার, এক-দু' মাস থাকতে দিয়ে ডিভোর্সের কেসটা চালাতে সাহায্য করবে।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে দম নেয় পৃথা। রায়নের কোনও ভাবান্তর নেই। ঠায় তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। বেশ খানিকক্ষণ পর খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে রায়ন বলে ওঠে, আপনি আমাদের বাড়িতে এসে থাকতে পারেন।

এই আবেগহীন সোজাসাপটা প্রস্তাব রীতিমতো টলিয়ে দেয় পৃথাকে। বড় বড় চোখ করে পৃথা রায়নকে বলে, তুমি যা বলছ, ভেবে বলছ তো? বাবার সঙ্গে আলোচনা না করেই এত বড় একটা কথা দিয়ে দিলে!

আমার বাবাকে আমি চিনি। আপনার যা পরিস্থিতি, তাতে উনি অরাজি হবেন না থাকতে দিতে।

পৃথা আরও একটু শিয়োর হয়ে নেওয়ার জন্য বলে, আমাকে আশ্রয় দেওয়া মানে, অনেক ধরনের ঝামেলা ফেস করা। অনিমেষ মাঝেমধ্যেই আসবে বিরক্ত করতে, পুলিশ,কোর্ট-কাছারি অবধি গড়াতে পারে ব্যাপারটা।

রায়ন হাসে। বলে, আমি ওসব বিষয়ে কতটা আপনাকে হেল্প করতে পারব জানি না। বাবা পারবে। রিটায়ারমেন্টের পর এখনও বেশ

BanglaBook.org

স্টেডি আছে। অফিসে উঁচু পদে কাজ করার সুবাদে কোর্ট-কাছারির ব্যাপারে বাবা খুবই স্বচ্ছন্দ। একটু থেমে রায়ন বলে, আর হ্যাঁ, আপনি আশ্রয় কথাটা উইথড্র করুন। আশ্রয়ের সঙ্গে 'করুণা' শব্দটা জুড়ে থাকে, যেটা আপনার পক্ষে অপমানজনক।

পৃথার গলায় কষ্ট গুটুলি পাকিয়ে উঠেছে। বার দু'-তিনেক ঢোঁক গিলেও ভেতরে পাঠানো গেল না। কিছুই বলতে না পেরে রায়নের কাঁধে হাত রাখে পৃথা। এবারের স্পর্শের মানে করতে পারে রায়ন।

রায়ন, পৃথাদি, রায়ন, রায়ন, পৃথাদি... টিলার পিছন থেকে উঠে আসছে সুগত-বাপ্পার উদ্বিগ্ন ডাক। 'আমরা এখানে' বলতে গিয়ে ভেঙে গেল পৃথার গলা। আওয়াজ নিশ্চয়ই বেশি দূর যায়নি। পৃথা উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দেয় রায়নের দিকে। বলে, ওঠো, ওরা চিন্তা করছে।

পৃথার হাত না ধরেই রায়ন দাঁড়ায়। যেদিক দিয়ে উঠেছে তার উলটো দিকে এগোতে থাকে। পৃথা বলে, ওদিকে বোধহয় সিঁড়ি নেই, পারব নামতে?

রায়ন আর একটু এগিয়ে যেতে, সিঁড়ি দেখতে পায়। পৃথার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, চলে আসুন। আছে সিঁড়ি।

দু'জনে পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে নামে। পৃথাকে না জানিয়ে পৃথার হাতটা ধরে নেয় রায়নের হাত। একটু আগের প্রত্যাখ্যান সে মেনে নিতে পারেনি।

পৃথা-রায়নকে দেখতে পেয়ে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছে সুগত, বাপ্পা। দু'জন হাত ধরাধরি করে নামছে দেখে সুগত বাপ্পাকে বলে, কেস জন্ডিস। রায়নটা ঝুলে গেল মনে হচ্ছে।

বাপ্পাও ভারী চিন্তায় পড়ে যায়। রায়নের এই অনুরাগ তাদের কতটা বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে, আন্দাজ করে উঠতে পারে না।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দম ছেড়ে বসে পড়ে পৃথা। মুখের হাসিতেও ক্লান্তি। বলে, আর পারছি না। পা ভারী হয়ে গেছে। হাঁটু অসাড়।

কেমন বেড়ালেন, নেপাল?

একটু যেন বাঁকাভাবে প্রশ্নটা করে বাপ্পা। রায়নের কানে খটকা লাগলেও, পৃথার কোনও হেলদোল নেই। বলে, ভালই। সঙ্গে লাগেজ থাকলে কাঠমাণ্ডু অবধি চলে যেতাম।

BanglaBook.org

বাপ্পা আর কথা বাড়ায় না। রায়নের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সুগত ক্যামেরা চোখে দিয়ে ফোকাস করছে পৃথাদিকে। কোনও আড়ষ্টতা নেই পৃথাদির, ঝরনার মতো হাসছে। এই জার্নিতে বাপ্পাদের চোখে ঝরনা খুব কমই পড়েছে, তখন তো জানত না সঙ্গে চলেছে আস্ত একটা ঝরনা নিয়ে।

শাটার টিপল সুগত। পৃথা উঠে দাঁড়ায়। বলে, ক্যামেরাটা দাও, আমি তোমাদের একসঙ্গে একটা ছবি তুলে দিই।

সুগত ক্যামেরাটা দিতে যাবে, শুনতে পায় চলমান ইংরেজি কথা। টিলার বাঁক থেকে ভেসে আসছে মহিলা কণ্ঠ। একজনেরই গলা পাওয়া যাচ্ছে। উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে বিদেশিনী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁকে দেখা গেল, ছিপছিপে চেহারা, এক মাথা সোনালি চুল, হাঁটছে না দৌড়োচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, বয়স আন্দাজ করা বেশ কঠিন। একা বকবক করে যাচ্ছে দেখে ভারী আশ্চর্য হয় সুগতরা।

সুগতদের দলের দিকে তাকিয়ে মহিলা হাসেন, সৌজন্যমূলক হাসি। সুগত স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে 'হাই' বলে। মহিলা প্রত্যুত্তর দেন। একই সঙ্গে ওঁর খেয়াল পড়ে, যাঁর উদ্দেশে উনি কথাগুলো বলছিলেন, সে পাশে নেই। মহিলা পিছন ফিরে হাঁক পাড়েন, শেরপা, কাম অন শেরপা...

কামিং ম্যাম, বলে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে আসে একটা লোক, সম্ভবত গাইড। বেচারা বেজায় কাহিল। পাহাড়ের লোক হয়েও তাল রাখতে পারছে না বিদেশিনীর সঙ্গে।

সুগতর হঠাৎ কী হয়, মেমের উদ্দেশে বলে, মে আই টেক ইয়োর স্ন্যাপ প্লিজ?

ও, শিয়োর। বলে, গাইডের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ান মহিলা। সুগতর ছবি তোলা হলে, থ্যাঙ্ক ইউ বলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেন, শ্যাল আই ক্লিক ইয়োর গ্রুপ ফোটো?

ইটস আওয়ার প্লেজার। বলে সুগত।

পৃথা ফের বসে পড়ে সিঁড়িতে। সুগত, বাপ্পা, রায়ন দাঁড়ায় পাশে। মেম যতক্ষণ সময় নিচ্ছেন ফোকাস করতে গাইড রায়নদের শুনিয়ে হিন্দিতে

BanglaBook.org

বলে, ক্যায়া পার্টি মিলা মেরে কো, একহি দিন মে সান্দাকফু পৌঁছ যায়গা। ই লোগ ক্যায়া খাতা হ্যায়? ইতনা এনার্জি। ম্যায় তো মর যাউঙ্গা।

ছবি তোলা হয়ে যায়। গাইডের কথা শুনে বাপ্পারা হাসছে, মেম ভাবে বুঝি কোনও জোকস, না বুঝে সেও হাসে। ক্যামেরা ফেরত দিয়ে টা টা করে এগিয়ে যায়। গাইড পিছনেই পড়ে থাকে। মেমসাহেব ডাকেন, কাম অন, শেরপা, কাম অন...

গাইড পা চালায়। ওরা অদৃশ্য হতে বাপ্পা বলে, হ্যাঁরে সুগত, তুই হঠাৎ মেমটার ছবি তুললি কেন? ফরেনার দেখে এত আদেখলেপনা কীসের?

মন দিয়ে লেন্সগার্ড লাগাতে লাগাতে সুগত বলে, ছবি তুলতে গেলে একটু টাইম পাওয়া যায় তো, দেখছিলাম মেমসাহেব আমাদের পৃথাদির থেকে সুন্দর কিনা।

সিঁড়িতেই বসেছিল পৃথা, ছিটকে উঠে আসতে আসতে বলে, এইসান চাঁটি মারব না!

সুগত দৌড়ে পালায়। বাপ্পা, রায়ন হাসতে থাকে।

মিনিট পনেরো পর বোল্ডার ফেলা পাহাড়ি রাস্তায় একটা নাটক বা খেলা শুরু হয়। নাটকটা মৌলিক নয়, বিদেশিনীর থেকে ধার করা। মেমসাহেব দ্বারা অনুপ্রাণিত পৃথা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেছে সামনে। পিছিয়ে পড়েছে তিন বন্ধু। হাঁটতে হাঁটতে পিছনে ঘাড় ফেরায় পৃথা। ডাকে, কাম অন বয়েজ, কাম অন...

হাসি পেলেও গম্ভীর হয়ে থাকে তিন বন্ধু। সামনে চলেছেন রানি, ওরা অনুগত সৈনিক।

BanglaBook.org

কিছু কিছু স্বপ্ন থাকে যেগুলো সহজেই ধরে ফেলা যায় 'স্বপ্ন' বলে। ভেতরে প্রচুর ভেজাল। রায়ন ঘুমের মধ্যে সেরকমই একটা জগতে ঢুকে গেছে। ইচ্ছে করছে জেগে উঠতে, পারছে না। ভীষণ ক্লান্ত।

স্বপ্নটা হচ্ছে পৃথাদির সঙ্গে গ্রামের স্কুলে ক্লাস নিতে গেছে রায়ন। আরও দশ-বারোটা মেয়ে আছে। তারা পৃথাদির কলেজের স্টুডেন্ট। এত দূর স্বপ্নটা মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আছে। পৃথাদি ট্রেক করতে করতে এই তথ্যটা দিয়েছিল রায়নকে, পৃথাদি নাকি নিজের স্টুডেন্টদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই অনুন্নত স্কুলগুলোতে ক্লাস নিতে যায়। হতেই পারে ইচ্ছাপূরণের কারণে রায়ন স্বপ্নে পৃথাদির সঙ্গে গেছে ক্লাস নিতে। ওই দশ-বারোটা মেয়ে কিন্তু ভেজাল। ওরা সেই মেয়ে, যারা মাঝপথে রায়নদের জিপে উঠেছিল। স্কুলে পর পর দুদিন ছুটি পেয়ে ফিরছিল যে যার বাড়ি। এত দূর পর্যন্ত তবু মেনে নেওয়া গেল। স্বপ্নে রায়ন, পৃথাদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যখন ক্লাস নিচ্ছে, দেখে কিনা, স্টুডেন্টদের মধ্যে বসে আছেন অনিমেষদা, চোখেমুখে ছাত্রসুলভ বিহ্বলতা... এর পরও কি স্বপ্নটা আর দেখা উচিত? এদিকে চোখ খুলতে পারছে না রায়ন। আঠার মতো ঘুম জড়িয়ে রেখেছে চোখের পাতা। ঘুমকে প্রশ্রয় দিলেই জেগে উঠছে অবান্তর স্বপ্ন।

গত সন্ধেয় সান্দাকফু পৌঁছেছে রায়নরা। কালাপোখরি অবধি হেঁটে আসতে আসতে প্রায় সন্ধে নেমে গিয়েছিল। অনিমেষদার কোনও পাত্তা নেই। শরীর কি আরও খারাপ হল?

কালো জলে প্রার্থনার ফ্ল্যাগের ছায়া যখন ক্রমশ বিলীয়মান, জব্বর ঠান্ডা, রায়নরা ভাবতে শুরু করেছে, রাতটা এখানকার কোনও কটেজে থেকে যাবে, তখনই জিপের শব্দ।

চারজনেই রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওদের আশ্বস্ত করে অনিমেষদা জিপ নিয়ে হাজির।

গাড়িতে সান্দাকফু যখন পৌঁছোল, রাত হয়ে গেছে। আকাশে চাঁদের আলোর তেমন জোর নেই, ফলে তুষারশৃঙ্গ দেখা গেল না। প্রকৃতিও

BanglaBook.org

হয়ে রইল অপ্রকাশিত। তবে আকাশভরা অসংখ্য তারা ছিল, কলকাতার আকাশের তুলনায় চারগুণ বেশি। এ যেন অন্য কোনও আকাশ।

একটা প্রাইভেট লজে উঠল সুগত, পৃথারা। ইতিউতি আরও কয়েকটা ট্রেকার্স হাট আছে, সেগুলোয় সোলার এনার্জির আলো নেই। একমাত্র শেরপা লজে জ্বলছিল আলো। সংলগ্ন রেস্টোরেন্ট-কাম-স্টেশনারি-কাম-বার বেশ বড়সড় এবং ব্যস্ত। অন্য লজগুলো খাবারদাবার সব এখান থেকেই নিয়ে যায়।

পুরো লজটাই কাঠের, দোতলা, টুমলিংয়ের ট্রেকার্স হাটের মতো এটারও দোতলায় ফ্যামিলি হাউস অর্থাৎ লজ ওনার থাকেন। টুমলিংয়ের মতোই তিনি একজন মহিলা। একাই সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, অ্যাসিস্ট করার জন্য অল্প বয়সি দু'-চারটে নেপালি ছেলে, একজন বৃদ্ধা, আর মাঝবয়সি মহিলা আছে।

লজের মালকিনকে বেশ কর্মঠ মনে হল। একার হাতে রান্নাবান্না, রায়নদের ঘর দেখানো সবই করলেন। এখানে পাহাড়ের উচ্চতা টুমলিংয়ের থেকে আড়াই হাজার ফুট বেশি, সেই অনুপাতে এখানকার মালকিন টুমলিংয়ের মালকিনের থেকে অনেক টাফ। বাঁশ-কাটা লম্বা গ্লাসে এক ধরনের পানীয়, স্ট্র ডুবিয়ে খেতে খেতে ভদ্রমহিলা কাজ সারছিলেন। সুগত জিজ্ঞেস করে জানতে পারে পানীয়র নাম ছ্যাং, নেশার জিনিস। গুটিকয় স্থানীয় মহিলা-পুরুষ এবং বি এস এফ-এর জওয়ান সবাই মিলে রেস্তোরাঁয় বসে ছ্যাং খাচ্ছিল। অনিমেষদাও বসে গিয়েছিল ওদের পাশে। রায়নদের খেতে বলেছিল। সুগত বলে, আপনি খান, আপনাকে হাঁটতে হয়নি। আমরা কুকুরক্লান্ত।

পৃথাদি খোঁড়াচ্ছিল, তার অবস্থাও কাহিল। রায়ন খুব একটা ফ্রি হতে পারছিল না অনিমেষদার সামনে। পৃথাদির কাছে জেনেছে লোকটার দুটো রূপ।

দুটো ভিউ সাইড রুম পছন্দ করল রায়নরা। পৃথাদি, অনিমেষদার ডবল বেড, রায়নদের ফোর বেড। সেই যে ঘরে সেঁধিয়েছিল তিন বন্ধু আর বিছানা থেকে ওঠেনি। খাবার ঘরে আনিয়ে নিয়েছে।

পৃথাদিরা কী করল, কোথায় খেল কোনও খোঁজ নেয়নি তিনজন। ঘুম

BanglaBook.org

আসতে দেরি হয়নি। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছে সাড়ে পাঁচটায়। মালকিন বলেছে, সাড়ে পাঁচটার একটু পরে সানরাইজ শুরু হয়। তারা ডেকে দিতে পারবে না। সারাদিন যা খাটুনি যায়, তাদের ঘুম ভাঙতে দেরি হবে। অ্যালার্ম দিয়ে রাখা ভাল।

অ্যালার্ম এখনও বাজল না। এদিকে রায়নের ঘুম প্রায় ভেঙেই গেছে। চোখ খোলে রায়ন। ঘরে আবছা আলো।

খাট চারটে একসঙ্গে করে শুয়েছে রায়নরা। বাপ্পা, সুগত ঘুমে কাদা। বালিশের তলা থেকে টর্চ বার করে রায়ন। উঠে বসে টর্চ জ্বালায় টেবিলের ঘড়ি লক্ষ করে। পাঁচটা দশ।

বিছানার পাশেই কাচের জানলা। পরদা ঢাকা। এই জানলা দিয়েই নাকি পাহাড়ের টোটাল রেঞ্জ দেখা যাবে। পরদা সরাতেই ভীষণ অবাক হয়ে যায় রায়ন, বাইরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মহিলা! শাড়ি পরা, গায়ে মাথায় চাদর। ধরে নেওয়াই যায় পৃথাদি। আর তো কোনও শাড়ি পরা কেউ আসেনি লজে।

কী পাগল মেয়ে রে বাবা! সূর্যোদয় দেখবে বলে রাত থাকতেই বাইরে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আছে!

ফুলহাতা সোয়েটার পরে শুয়ে ছিল রায়ন, ওপরে একটা শাল চাপিয়ে দরজা খুলে বেরোয়।

লজের বাইরে পা রাখতেই ঠান্ডায় কাঁপতে শুরু করে। প্রায় ঝড়ের কাছাকাছি হিমেল হাওয়া। ঠান্ডায় কুঁজো হয়ে গেছে রায়ন, পায়ে পায়ে এগোয় পৃথাদির দিকে। লজের মালকিন বলছিল এই ঠান্ডা নাকি কিছুই নয়। জুন মাসটা ওদের গরমকাল।

পৃথাদি একদম সটান, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে। রায়ন পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, কাঁপা গলায় বলে, এত ঠান্ডায় কী করে দাঁড়িয়ে আছেন! সানরাইজ হতে এখন ঢের দেরি।

পৃথাদি বলে, ওই দেখো! শুরু হয়ে গেছে।

পৃথার দৃষ্টি অনুসরণ করে রায়ন সামনের দিকে তাকায় এবং চমকে ওঠে। এত কাছে পাহাড়ের শৃঙ্গগুলো! একটু আগে এদের মেঘ মনে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

চিলতে লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে তুষারশৃঙ্গগুলোতে, বিশাল রেঞ্জ। অকল্পনীয় এক সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রায়ন, পৃথা। আর কেউ জেগে নেই সান্দাকফুতে। কত কোটি বছরের পুরনো এই সৌন্দর্য অথচ কী নবীন!

অতিরিক্ত সুন্দরের সামনে কেমন যেন একটা নার্ভাস ফিল করে রায়ন। বুকটা খালিখালি লাগছে তার। নীচের কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসছে মুরগির ডাক। গলার কী জোর!

ফুলের মতো ফুটে উঠছে তুষারচুড়ো। রায়ন পৃথাকে বলে, অনিমেষদাকে ডাকবেন না?

ডেকেছি। ওঠেনি।

ইস। এত সুন্দর একটা সিন মিস করছে! একই সঙ্গে রায়নের মনে পড়ে বন্ধুদের কথা। বলে, যাই, সুগত-বাপ্পাকে ডেকে নিয়ে আসি।

রায়ন যেতে পারে না। পৃথা হাত ধরে নিয়েছে। বলছে, এই দৃশ্যের এতটুকু মিস করা উচিত নয়। ওদের আগ্রহ থাকলে, ঠিক উঠে আসত।

পৃথা গা সেঁটে দাঁড়ায় রায়নের। সেতারের আলাপের ঢঙে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে আরও সব পিক। কাঞ্চনজঙ্ঘাটা শুধু চিনতে পারছে রায়ন। সব থেকে সামনে। গিরিশিরা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আরক্ত তুষারপথ। যেন ওই পথে এইমাত্র কোনও দেবতা হেঁটে গেছেন।

রায়ন টের পায় তার কাঁধে মাথা রেখেছে পৃথাদি। বলছে, জানো তো, এরকম একটা সুন্দরের সামনে আমার মরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। অনিমেষ সব ওষুধ ফেলে দিল।

রায়ন একটু বিরক্তই হয়। বলে, এখনও কি ইচ্ছে করছে?

না।

কেন?

তুমি আছ বলে।

পৃথাদি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, রায়ন সিঁটিয়ে যায় আরও এক নরম শৃঙ্গের স্পর্শ পেয়ে, তুলনায় খুবই কম হলেও, যার আকর্ষণক্ষমতা কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকেও অমোঘ।

BanglaBook.org

ভয়ে ভয়ে পৃথার দিকে তাকায় রায়ন, সূর্যের প্রথম আলো পৃথাদিকেও রাঙিয়েছে, রডোডেনড্রন গাছ মনে হচ্ছে যেন!

পিছনে খুকখুক করে কাশির শব্দ। সচকিত হয়ে পৃথার থেকে সরে আসে রায়ন। পাশে এসে দাঁড়ায় বাপ্পা, সুগত। দু'জনেই লজের দেওয়া বিছানার কম্বলটা গায়ে-মাথায় জড়িয়েছে। সুগত বলে, কী রে শালা, আমাদের না ডেকে... কথা অসম্পূর্ণ রেখে জিভ কাটে। পৃথার দিকে তাকিয়ে বলে, সরি, স্লিপ অফ টাং, গালাগালটা বেরিয়ে গেল।

ইটস্ অল রাইট। বলে, পৃথা তাকিয়ে থাকে পিকগুলোর দিকে।

বাপ্পা, সুগত মন দিয়েছে বর্ণাঢ্য সূর্যোদয়ে। নিজেদের ভাল লাগা প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়ে যাচ্ছে, ওঃ, রিয়েলি, বিউটিফুল! সুপার্ব! এক্সসেলেন্ট! ভাবা যায় না! পাগল হয়ে যাব মাইরি। হেভেনলি বিউটি...

সুগত ক্যামেরা বার করে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করছে, বাপ্পা বার করেছে একটা চিরকুট, সামনের তুষারশৃঙ্গগুলোর নকশা, নাম আছে তাতে। বাপ্পা আঙুল তুলে চেনায়, ওই দ্যাখ নন্দাদেবী, চামলং, সাউথ কোল, লোতসে, মাকালু, থ্রি-সিস্টার, ওই তিনটে মাথা, ওর পাশেই ইঁউচুলি, কুম্ভকর্ণ, আর এই হল কাঞ্চনজঙ্ঘা। তারপর নরসিম, পাণ্ডিম, ব্ল্যাক কাবরু। মেঘে খানিকটা ঢেকে আছে, একটু কোণের দিক করে দেখ, সিম্ভু কাবরু, নর্থ...

আর বলিস না গুরু, এবার গুলিয়ে যাচ্ছে। বলে, সুগত।

বাপ্পার উৎসাহে এতটুকু ভাঁটা পড়ে না। বলে যায়, আসল পিকটাই তো তোদের দেখানো হয়নি, ওই দ্যাখ, একদম আলাদা, একা দাঁড়িয়ে আছে এভারেস্ট। ইন্ডিয়ার আর কোনও স্পট থেকে এত সুন্দর এভারেস্ট দেখতে পাবি না।

পৃথা এভারেস্টের দিকে তাকায়। দূরে একাকী দাঁড়িয়ে আছে, গেরুয়া নিস্তেজ আলো ওর গায়ে। কী নিঃসঙ্গ লাগছে পাহাড়টাকে। বিনা কারণে চোখে জল এসে যায় পৃথার, বাবার কথা মনে পড়ে গেল যে হঠাৎ।

কী, তোমরা কি ভেবেছ আমাকে না ডেকে নিজেরাই সব সুন্দর উপভোগ করে নেবে?

BanglaBook.org

অনিমেষের গলা পেয়ে পৃথা ছাড়া সবাই ঘাড় ফেরায়। মজা করেই কথাটা বলেছে অনিমেষ। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনে বাপ্পা বলে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছিলাম আপনাকে ডাকতে।

তার কোনও দরকার ছিল না। আমি বহুক্ষণ আগে উঠেছি। জানলা দিয়ে দেখছিলাম সানরাইজ।

রায়ন ভেতর ভেতর কেঁপে ওঠে, সানরাইজ ছাড়া আর কিছু কি দেখেননি অনিমেষদা? আড়চোখে পৃথাদিদের জানলাটা দেখে নেয় রায়ন, একটু দূরেই আছে, তবে এদিকটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয়। অনিমেষের পরের কথাগুলোয় কান দেয় রায়ন, দেখে ফেলার কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা খোঁজে। পৃথাদির কোনও হেলদোল নেই। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগুনরঙা পাহাড়ের দিকে।

অনিমেষদা ক্যামেরা চোখে দিয়ে তাক করেছে বরফশৃঙ্গ। বলছে, যা ঠান্ডা! আমি তো ঘরে বসেই তিন-চারটে স্ন্যাপ মারলাম। তোমাদের দেখে সাহস হল, বেরিয়ে এলাম বাইরে।

অনন্ত সময় ধরে সূর্যোদয় হয়েই চলেছে, রং অবশ্য আগের মতো অত উজ্জ্বল নয়। প্রকৃতির অপার রূপ চোখসওয়া হয়ে গেছে পাঁচজনের। ওরা এখন ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। কেউ কাঠের বেঞ্চে, বেতের মোড়ায়, চেয়ারে।

রেস্টোরেন্ট থেকে বড় মগে চা দিয়ে গেছে সবাইকে। চা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা। পৃথার মনোযোগ রয়ে গেছে পাহাড়শৃঙ্গে।

এই লজে লেট রাইজার মুরগি আছে একটা, ক্ষণে ক্ষণে ডেকে উঠছে। বাঁশের খুঁটিতে বসে আছে মুরগিটা, যখনই ডাকছে লজের পোষা বেড়ালের একটা দৌড়ে গিয়ে খুঁটিতে উঠতে চাইছে। শীতের দেশ বলে বেড়ালটা লোমওলা, লেজটা মোটা।... এ সবই মন দিয়ে দেখছিল রায়ন। হঠাৎ খেয়াল করে, আশপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। সামনে চেয়ারে বসে আছে শুধু পৃথাদি।

রায়ন বলে, ওরা কোথায় গেল?

BanglaBook.org

পৃথা আঙুল দেখায় নীচের রাস্তায়, সেখানে হেঁটে যাচ্ছে অনিমেষ, সুগত, বাপ্পা। রায়ন অবাক হওয়া গলায় বলে, আমাকে ডাকল না তো!

ডেকেছিল, তুমি অন্যমনস্ক ছিলে। বলে পৃথা।

রায়নের ইচ্ছে করে বন্ধুদের কাছে যেতে, আবার পৃথাদিকে ছেড়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। রায়ন বলে, চলুন, আমরাও হেঁটে আসি।

পৃথা কোনও উত্তর দেয় না। সে এখন মন দিয়ে দুটি নেপালি কিশোরের জলের ট্যাঙ্ক ভরতি করা দেখছে।

ছেলে দুটো এই লজে কাজ করে। চা-পাতা তোলে যেরকম ঝুড়িতে, তাতে বিশাল জ্যারিকেন বসিয়ে কোথা থেকে যেন জল নিয়ে আসছে ছেলে দুটো। চা-পাতা তোলার কায়দাতে ঝুড়িগুলো পিঠে নিয়েছে।

রেস্টোরেন্টের সামনে বিশাল প্লাস্টিকের কালো ট্যাঙ্ক, ধারণক্ষমতাও লেখা আছে, তিনশো লিটার। রায়ন আন্দাজ করে ছেলে দুটো বইছে পনেরো অথবা কুড়ি লিটার জল। বহু সময় ধরে ভরতে হবে ওদের।

এত পরিশ্রমের কাজ হলেও দু'জনের মুখে হাসি, খুনসুটি অটুট। এবারের মতো জ্যারিকেন খালি করে পরের বারের জন্য যাচ্ছিল ছেলে দুটো। পৃথাদি জানতে চায়, জল কোথা থেকে আনছ?

একজন আঙুল দেখায় পাহাড়ের পিছনে। বলে, নীচে মন্দির কা বগলমে একঠো কুঁয়া হ্যায়।

এখানে কুয়ো! বিস্মিতকণ্ঠে বলে ওঠে পৃথাদি। ছেলে দুটো শুধু হাসে।

পৃথাদির বিস্ময় কাটাতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে লজের মালকিন। বলে, নীচে শিবমন্দির কা পাস মে পানি কা ন্যাচারাল সোর্স হ্যায়। ওহি পানি সে ইঁহাকা সব লজ কাম চালাতা হ্যায়।

ওহ, রিয়েলি! কত নীচে মন্দিরটা? তার মানে ওখানে একটা জলের কুণ্ড আছে। যাবে রায়ন? উত্তেজনা, বিস্ময়, প্রশ্ন সব মিলিয়ে মিশিয়ে করে বসে পৃথাদি।

লজের মালকিন বলে, যাইয়ে না। জাদা দূর নেহি হ্যায়। ইন লড়কো কা সাথ যাইয়ে।

পৃথাদি ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করে, নিয়ে যাবি আমাদের?

BanglaBook.org

ছেলে দুটো একে অপরের দিকে তাকিয়ে হেসে নেয়। তারপর বলে, আইয়ে।

পৃথা তৎক্ষণাৎ ওদের পিছু নিচ্ছে দেখে রায়ন বলে, শাড়ি, হাওয়াই চটি পরে হাঁটতে পারবেন পাহাড়ের রাস্তায়? অ্যাটলিস্ট জুতোটা পরে নিন।

ওরে বাবা, ও জুতো আমি আর পরছি না, ভীষণ পায়ে লাগছে। বলে, ছেলে দুটোকে অনুসরণ করে পৃথা।

রায়ন বাধ্য হয় যেতে। ওর পায়েও হাওয়াই, পৃথাদি তবু মোজা পরে আছে।

পাহাড়ের পিছনে পাথর কেটে সরু রাস্তা। ছেলে দুটো প্রায় হরিণের গতিতে হারিয়ে গেল। মেঘ, জল ভেজা পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে রায়নদের। ইতিমধ্যেই রায়নের পা দু'বার স্লিপ করেছে, সামলে নিয়েছে পাশের ঝোপঝাড়ের ঝুঁটি ধরে।

পৃথার সুবিধে হবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রায়ন, আমাকে ধরে হাঁটুন।

উত্তরে পৃথা বলেছে, দরকার নেই বাবা। তুমি নিজেই যা টলমল করছ ...এই রাস্তার নির্জনতা একদম অন্য রকম। কিশোরীর গোপন কথার মতো। এখানে যেসব পাখি ডাকছে তারা পাহাড়ের অন্য কোথাও যায় না। এখানে মেঘের চলনে ভারী সন্তর্পণ ভাব। হাঁটতে ভালই লাগছে রায়নের, একটাই অস্বস্তি, ছেলে দুটোর টিকিও দেখা যাচ্ছে না। আশঙ্কাটা প্রকাশ করে ফেলে রায়ন। আমরা আবার ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছি না তো?

রাস্তা তো একটাই, ভুল হবে কেন? বলে পৃথাদি। কথাটা দ্ব্যর্থক বলে বোধহয় রায়নের।

রাস্তা দ্রুত নেমে যাচ্ছে, মাথা তুলে ওপরটা দেখে রায়ন, অনেকটাই নেমে এসেছে, ছেলে দুটো জল নিয়ে এতটা উঠবে!

দৃষ্টি নামিয়ে আনার পর রায়ন দেখে পৃথাদি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে! এগিয়ে গিয়ে রায়ন জিজ্ঞেস করে, কী হল, কী দেখছেন?

আঙুল তুলে পৃথাদি বলে, ওটা কী ফুল বলো তো? পাহাড়ের রাস্তায় কতবার যে দেখলাম ফুলটাকে। নামটা জানি না।

BanglaBook.org

নীল ফুলটাকে চেনে রায়ন। বলে, ওটা আইরিশ লিলি।

তুমি কী করে জানলে? ফুল, গাছ নিয়ে আলাদা কোনও ইন্টারেস্ট মানে স্টাডি আছে নাকি তোমার?

ইন্টারেস্ট একটু-আধটু আছে, যেমন সবারই থাকে। এই ফুলটার নাম আমি জেনেছি টুমলিং ট্রেকার্স হাটে। ওদের বাগানে ছিল। নামটাও লেখা ছিল ছোট্ট টিনের পাতে।

ইস। দেখেছ, আমার ভাল করে ঘুরে দেখাই হল না। ঝগড়াঝাঁটি করেই সময় কেটে গেল।

আর একটা ছোট্ট ইনফর্মেশন দিই। আপনারা যে-ঘরে ছিলেন, দরজায় আইরিশ নামটাই ছিল।

কপট রাগে রায়নের পিঠে চাঁটি মারে পৃথা। বলে, এগুলো টুমলিংয়ে বলতে কী হয়েছিল!

যা বাবাঃ, আমি কী করে জানব ফুলটা আপনার ভাল লেগে বসে আছে!

পৃথা হাসে। বলে, ফুলটার গন্ধ আছে কিনা বলতে পারবে?

ঠোঁট উলটে কাঁধ শ্রাগ করে রায়ন, অর্থাৎ বলতে পারবে না। তারপর নিজের উদ্যোগে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে এগিয়ে যায় ফুলগুলোর কাছে। ফুল না তুলে হাঁটু মুড়ে বসে গাছের সামনে। নুয়ে পড়ে নাক ঠেকিয়ে দেয় ফুলে। বড় শ্বাস নিয়ে ঘুরে তাকায় পৃথার দিকে। পৃথা জানতে চায়, আছে গন্ধ? রায়ন মাথা নাড়ে। পৃথা হতাশ সুরে বলে, একটুও নেই?

আছে, ভীষণ হালকা মতন। বলে, উঠে আসে রায়ন।

কেমন গন্ধটা?

ঠিক বলে বোঝানো যাবে না।

তবু বলো।

কেমন যেন আকাশ আকাশ গন্ধ। খুবই সহজ ভাঙ্গিতে কথাটা বলে হাঁটতে থাকে রায়ন। পৃথার শরীরে শিহরন জাগে, সেটা কামের না প্রেমের ঠিক ধরতে পারে না।

রায়ন ডাকে, পৃথাদি আসুন। মন্দির দেখতে পেয়েছি।

জৌলুসহীন মন্দির। লোকাল গুটিকয় মানুষের আরব্ধ দেবতা।

BanglaBook.org

মানুষগুলোর সামর্থ্য নেই, দেবতার চাকচিক্য আসবে কোথা থেকে!

ছেলে দুটোকে দেখা গেল মন্দিরের থেকে আরও একটু নীচে। পৃথা, রায়ন পৌঁছোল ওদের কাছে। বৃত্তাকার কুণ্ডটা খুবই ছোট। ব্যাস তিন-চার হাতের বেশি হবে না। অবিরাম বুড়বুড় করে জল উঠে আসছে, কত যুগ ধরে কে জানে! হয়তো এই জলের উৎস খুঁজে পেয়েই গড়ে উঠেছে এখানকার ছোট্ট জনপদ। এখান থেকে তুষারশৃঙ্গ অপরূপ লাগে বলে নয়।

কুণ্ড থেকে তৈরি হয়েছে ছিপছিপে নদী। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে এটাই হয়তো ঝরনা হয়ে যাবে।

ছেলেগুলোর জল ভরা প্রায় হয়ে গেছে। পৃথা রায়নকে বলে, তুমি ওদের মতো জল নিয়ে উঠতে পারবে?

না।

চেষ্টা না করেই কেন 'না' বলে দিচ্ছ! এটা কিন্তু দায় এড়ানো ভঙ্গি। ওই ছেলে দুটো তোমার থেকে বয়সে, চেহারায় ছোট, ওরা পারছে, তুমি পারবে না কেন?

ওরা পাহাড়ে মানুষ। ট্রেন্ড হয়েছে এভাবে, ওরা যতটা কষ্ট সহ্য করতে পারবে, আমরা কিছুতেই পারব না।

কতটা কষ্ট সহ্য করছে, পরখ তো করা যেতে পারে। বলে, পৃথা মুখ ঘুরিয়ে উঠতে থাকে মন্দিরের দিকে। রায়ন বুঝতে পারে পৃথাদি চটেছে। একটু অপেক্ষা করে রায়ন, পৃথাদি কি চলে যাচ্ছে? না, মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসল।

মন্দিরের চুড়ো বেয়ে নেমে আসছে মেঘ, পৃথা অদৃশ্য হওয়ার আগে রায়ন বলে, ঠিক আছে, আমি ট্রাই করছি। তবে আপনি যেখানে বসে আছেন তত দূর পর্যন্ত।

বেশ, তাই হোক। যদি পারো, একটা গিফ্‌ট পাবে। বলে পৃথা।

ছেলে দুটো রায়নদের কথা কিছু বোঝেনি। ঝুড়ির হ্যান্ডেল মাথায় নিচ্ছে। রায়ন একটি ছেলেকে গিয়ে বলে, হাম থোড়া কোসিস করেগা।

নেহি সেকিয়েগা বাবু। বহুত ভারী হ্যায়। বলে ছেলেটা।

BanglaBook.org

রায়ন কপট তাচ্ছিল্যে বলে, কিতনা ভারী হ্যায়? কিতনা লিটার কা জ্যারিকেন হ্যায়?

পঁয়ত্রিশ লিটার কা বাবু।

শুনেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে রায়নের। বুঝতে পারে বিশাল ভুল করে ফেলেছে পৃথাদির চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করে। আন্দাজ ছিল জ্যারিকেনটা বড় জোর বিশ লিটারের হবে। কিন্তু এখন তো আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

পৃথা মন্দিরের চাতালে বসে রায়নকে ঝুড়ির হ্যান্ডেলটা মাথায় নিতে দেখল। পৃথা জানে রায়ন পারবে না ওই বোঝা বইতে, পাহাড়ি ছেলে দুটোর কষ্টটা খানিকটা বোধ করতে পারবে।

মুখচোখ বেঁকে যাচ্ছে, গোটা এভারেস্টটাই কেউ যেন চাপিয়ে দিয়েছে পিঠে, তবু রায়ন চেষ্টা করে। এক পা করে এগোয়, আর ভাবে, স্যাডিস্ট স্বামীর প্রতি শোধটা কি পৃথাদি তার ওপর দিয়েই নিচ্ছে? রায়নের চোখে একটা আশ্চর্য বিভ্রম তৈরি হয়েছে। এখান থেকে পৃথাদিকে মনে হচ্ছে নৈনিতালের সেই কিশোরী, বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় একা দাঁড়িয়েছিল যে, এখন বড় হয়ে ফিরে এসেছে।

অবশেষে পারল না রায়ন। তবে চিত হয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে নিয়েছে ছেলে দুটো। পৃথাদিও আতঙ্কে চাতাল থেকে উঠে পড়েছিল।

বোঝা নেমে যাওয়ার পরেও মাথা টলমল করে রায়নের। জলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ছেলেগুলো অনায়াসে হেঁটে যায়। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সেই গাঢ় গোপন নির্জনতা।

প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দম নিয়ে রায়ন এসে বসে পৃথার পাশে। পৃথার দিকে তাকানোর শক্তিটুকু নেই।

এত ঠান্ডাতেও রায়নের কপালে, গালে চিজবিজ করছে ঘাম, চশমা নেমে এসেছে নাকের ডগায়, মাথার চুলগুলোও হয়তো ভিজে। যেন না-জন্মানো কোনও বৃষ্টিতে ভিজে এল। রায়নের চুলে হাত ডুবিয়ে দেয় পৃথা। মুখ ঘুরিয়ে নেয় নিজের দিকে। খুলে নেয় রায়নের চশমা। মেঘেদের আড়ালের ওপর ভরসা করে পৃথা না-জন্মানো বৃষ্টিতে ঠোঁট রাখে।

BanglaBook.org

অপ্রত্যাশিত উষ্ণতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে রায়ন। এই নির্জনতায় পৃথাদির শরীরে এক অদ্ভুত অরণ্য সম্মোহন! রায়ন হাতড়ে বেড়ায় সম্পূর্ণতাকে, যা সে প্রথম যৌন অভিজ্ঞতায় রঞ্জনাদির থেকে পায়নি। পৃথাদি তার হাতে তুলে দিয়েছে উপচে পড়া নরম উষ্ণতা। সুডোল স্তনযুগল আপন গরিমায় বেসামাল। স্তনবৃন্তে বাদামি নয়, যেন আইরিশ লিলির নীল উদ্ভাস। মুখ নামিয়ে আনে রায়ন, শিহরিত হয় পৃথাদি, চোখ বোজা আহ্লাদি মুখ তুলে ধরে মেঘেদের দিকে। পৃথাদির শরীর থেকে কুমারীবেলার গন্ধ পায় রায়ন। ওর হাত স্পর্শ করে সেইসব অজানা, অচেনা উপত্যকা, অববাহিকা। কলাগাছের মতো মসৃণ প্রত্যঙ্গ ঘুরে রায়ন যখন নাভির কাছে, হঠাৎ মনে পড়ে যায় নেপাল বর্ডারে সেই ছোট্ট নিরালা হ্রদটার কথা। কুকুরের ডাকটা পর্যন্ত ভেসে আসে।

সজাগ হয় রায়ন। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। পৃথাদির চোখে আকুল তৃষ্ণা, কপালে ছন্দপতনের ভ্রূকুটি।

রায়ন বলে, চলুন, যাওয়া যাক। ছেলেগুলো আবার জল নিতে আসবে।

মেঘ ঢাকা গাছের ডালে বসে একটা পাখি খুব ডাকতে শুরু করেছে, গঞ্জনা দিচ্ছে কি?

পৃথা নিজেকে গুছিয়ে উঠে বসে। তার শরীর জুড়ে স্বপ্নের ওম, এতদিনের কাঙ্ক্ষিত পুরুষস্পর্শ। চেতনার আশ্লেষ আলিঙ্গনে ধরে রাখে এই অনুভূতি।

রায়নের হাত ধরে চড়াই ভাঙতে থাকে পৃথা। মেঘেরা পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

ওপরে উঠে এসেছে দু'জনে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বন্ধুদের খোঁজে রায়ন, দেখা যাচ্ছে না।

রেস্টোরেন্টের সামনে বসে আছে চার-পাঁচজন স্থানীয় নারী-পুরুষ। থালায় করে কী যেন খাচ্ছে। রায়নের খেয়াল হয়, তাদের ব্রেকফাস্ট হয়নি।

লজের দিকে যেতে যেতে পৃথাকে বলে, কোথায় গেল বলুন তো ওরা? আমাদেরই খুঁজতে বেরোয়নি তো?

BanglaBook.org

রায়ন কতটা উদ্বিগ্ন দেখতে গিয়ে পৃথা একটা জিনিস আবিষ্কার করে। বদমাইশির হাসি হাসতে হাসতে বলে, তোমার চশমা কোথায়?

এই রে! বলে চোখে হাত দেয় রায়ন। তারপর বলে, যাই নিয়ে আসি।

আবার এত দূর যাবে, থাক না। পৃথা চাইছে না ফেলে আসা মধুর নির্জনতা নষ্ট হোক। যুক্তি হিসেবে বলে, তোমার হয়ে চশমাটাই ওখানকার প্রকৃতি দেখুক। ওখানকার ভোর রাত সন্ধে দুপুর...

একটু অবাক হয়ে পৃথার দিকে তাকায় রায়ন। জীবনকে কত সজীব, সুন্দর করে ভাবতে পারে পৃথাদি! মুখে বলে, থাক। চশমা হারানো আমার পুরনো বাতিক। আর একটা আছে লাগেজে।

লজে ঢুকে এসেছে পৃথা, রায়ন। পৃথার শরীরী ছন্দে বাড়তি প্রগলভতা। রায়নকে বলে, চলো, আমাদের রুমে গিয়ে বসি।

এখানে চুরির ভয় নেই। তালা লাগানো নেই দরজায়। পাল্লা ঠেলতেই পৃথা দেখে, অনিমেষ বিছানায় বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। কোমর অবধি কম্বলে মোড়া।

প্রাথমিকভাবে থতমত খায় পৃথা। বলে ফেলে, তুমি এখানে!

বিছানা থেকে উঠে আসতে আসতে অনিমেষ বলে, সরি, তোমাদের বোধহয় এই ঘরটা এখন একটু দরকার হবে।

মানে? চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও তেমন পারে না পৃথা।

অনিমেষ এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। পৃথাকে বলে, মানেটা ভেরি সিম্পল, খোলামেলা জায়গায় কতটুকুই বা আন্তরিক হওয়া যায়।

তুমি যে কী বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

পৃথার অপটু অভিনয়ে নার্ভাসনেস ধরা পড়ে যাচ্ছে। রায়ন এতটাই বিপর্যস্ত, মাথা নিচু করে বসে পড়েছে বিছানায়। অনিমেষ বলে যাচ্ছে, আমি যা বলছি, ভাল করেই বুঝতে পারছ তোমরা। এর থেকে বেশি বুঝতে চেয়ো না।

না, তোমাকে বলতেই হবে, কী মিন করছ তুমি?

পৃথা এবার সত্যিই শুনতে চাইছে, অনিমেষ পরিষ্কারভাবে বলুক তোমাদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে নিয়েছি আমি। তা হলে সম্পর্কটার মধ্যে

BanglaBook.org

আইনি বন্ধন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অনিমেষ বলবে না, বললেই তো অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সস্তা থিয়েটারের মতো অনিমেষের কনুই ধরে বারদুয়েক ঝাঁকায় পৃথা। বলে, কী হল, বলো? বলো কী বলতে চাইছ?

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অনিমেষ চলে যায়। রায়ন বসে আছে স্থাণুর মতো। এত অপমানিত জীবনে কখনও হয়নি। পৃথা রায়নের চুল ধরে মাথা সোজা করে। নিজের ডান পা তুলে দেয় বিছানায়। রায়নকে বলে, আঙুলগুলো দেখো, আমি যখন ওকে চার্জ করছিলাম। চটি পরা পা'টা তুলে দিয়েছিল আমার পায়ে।

রায়ন হতবাক হয়ে দেখে, পৃথাদির পায়ের তিনটে আঙুল এবং তার খানিক ওপর পর্যন্ত জমাট বাঁধা রক্তের আভাস। শিউরে ওঠে রায়ন।

সন্ধে উতরে রাত নেমেছে সান্দাকফুতে। রায়নরা এখন নিজেদের রুমে। তাস খেলছে। খেলা কিছুতেই জমছে না। মনটা তেতো হয়ে আছে এত। পৃথার সঙ্গে শারীরিক ব্যাপারটা ঊহ্য রেখে রায়ন সমস্ত ঘটনা বন্ধুদের বলেছে। বাপ্পা এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল, ওর শখের ছোরাটা বার করে ফেলে, মেরেই দেবে অনিমেষদাকে।

সুগত ওকে নিরস্ত করে, আমবনে পলাশির যুদ্ধ যেমন তোর অবিশ্বাস্য লাগে, ছোরাটা তেমনই তোর হাতে বেমানান।

বাপ্পার উত্তেজনার বিশেষ একটা কারণ আছে, তার মেন্টালি রিটার্ডেড বোনের যখন যৌনচেতনা আসে, বাছবিচার না করে যে কোনও পুরুষের কাছে ঘেঁষে যেত। মা একদিন রাগের চোটে ওকে খুন্তির ছ্যাঁকা দেয়। হাবা বোনটা বড্ড কেঁদেছিল। তারপর থেকেই সেক্স নিয়ে এক ধরনের ঘেন্না এসে গেছে। আজ যখন রায়ন বলল, অনিমেষদা পৃথাদির পা মাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, আঙুলে কামড়ে পড়ে গেছে পৃথাদির, মনে পড়েছিল বোনের যন্ত্রণার কথা।

সে যাই হোক, সুগতর পরামর্শে ওরা তিনজনেই পৃথাদিদের মুখোমুখি হয়নি। সম্ভবনা এড়াতে রাতের খাবার রুমে আনিয়েছে।

কলকাতা থেকে বয়ে আনা মদের বোতল আজই প্রথম খোলা হল।

BanglaBook.org

অল্প অল্প করে খাচ্ছে ওরা। ভোলার চেষ্টা করছে এই ট্যুরের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো। অনেকক্ষণ নীরবতার পর সুগত হঠাৎ বলে, আমরা কিন্তু কাল গাড়িফাড়ির চক্করে যাচ্ছি না। স্ট্রেট হাঁটা দেব ফালুটের দিকে।

টু হানড্রেড পারসেন্ট রাইট ডিসিশন, বলে বাপ্পা। বোর্ডে কার্ড ফেলে ফের বলে, অনিমেষদা পৃথাদি যতই ক্যাজুয়াল থাকার চেষ্টা করুক, গাড়িতে ওঠার জন্য রিকোয়েস্ট করুক আমাদের, কিছুতেই রাজি হব না। কী বলিস রায়ন?

রায়ন কোনও উত্তর দেয় না। তার মাথায় একটাই জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে, পৃথাদিকে সে আশ্বাস দিয়েছে, তেমন বুঝলে পৃথাদি যেন তাদের বাড়িতে চলে আসে। রায়ন ঠিকানাও দিয়ে রেখেছে। পৃথাদি যদি সত্যিই সেরকম কিছু ঘটায়, বন্ধুদের কাছে ফলস পজিশনে পড়ে যাবে রায়ন।

করিডরে গুনগুনে কান্নার শব্দ। তিন বন্ধু একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে। সুগত বলে, কেউ কাঁদছে।

বাপ্পা বলে, নিশ্চয়ই পৃথাদি। ফের ঝামেলা করেছে অনিমেষদা।

সুগত বলে, আমরা কিন্তু যাব না।

বাপ্পা বলে, মাথা খারাপ!

দু'জনের কথার মাঝখান থেকে তাস ফেলে উঠে পড়ে রায়ন। সুগত বলে, কোথায় যাচ্ছিস?

দরজার ছিটকিনি খুলতে খুলতে রায়ন বলে, একটা মেয়ে বাইরে বসে কাঁদবে, আমরা তিনজন ইয়াং ঘরে খিল এঁটে থাকব!

অগত্যা উঠতেই হয় সুগত, বাপ্পাকে। করিডোরে ম্রিয়মাণ আলো। কান্না অনুসরণ করে ওরা পৌঁছে যায় কাঠের সিঁড়ির সামনে। যে সিঁড়ির ওপরে মালকিনের ফ্যামেলি হাউস।

সুগতদের আন্দাজ মিলে গেছে, পৃথাদি কাঠের সিঁড়ির একটা ধাপে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে।

রায়ন হাঁটু মুড়ে বসে পৃথার সামনে। জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? গায়ে চাদর নেই কেন? এইখানে এইভাবে...

মুখ তোলে পৃথা। গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। ফোঁপাতে

BanglaBook.org

ফোঁপাতে বলে, শাড়িটাও খুলে নিচ্ছিল। আগেও এরকম মারধর করে রাতে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে।

রায়ন এতটাই বিমূঢ়, মুখ থেকে কথা সরছে না। সিঁড়ির মাথায় ঝুলছে ঝিমোনো হলুদ আলোর বাল্‌ব। লজের মালকিন ও তার পরিবার একে একে জমা হচ্ছে সেখানে। তাদের মুখে বিরক্তি মেশানো কৌতূহল। সমতলের জটিলতায় তারা তেমন অভ্যস্ত নয়। যে সুগত একটু আগে রায়নকে বেরোতে বারণ করছিল, সে এখন খেপে উঠে বলে, চল তো, শুয়োরের বাচ্চাকে উচিত শিক্ষা দিই।

অনিমেষের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় তিন বন্ধু। সিগারেট টানতে টানতে এক মনে বই পড়ে যাচ্ছে অনিমেষদা। বাপ্পা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বহুত পড়াশোনা করছেন দেখছি, কানে যাচ্ছে না বউয়ের কান্না?

পেজ মার্ক দিয়ে বই সরিয়ে রাখে অনিমেষদা। বলে, গেছে। একটু আগে বলে গেল, তোমাদের দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে।

আপনি কিন্তু চালাকি করার চেষ্টা করছেন অনিমেষদা। হুমকির সুরে বলে রায়ন।

গায়ে কম্বল জড়িয়ে খাট থেকে নেমে আসে অনিমেষ। নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে পায়ে চটি গলায়। সুগতর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। সব থেকে ভাল হয় তোমরা যদি লজের বাইরে আসো। পৃথা যে-কোনও মুহূর্তে আরও অনেক সিন করতে পারে। লজ ওনারকে মিছিমিছি বিব্রত করা হবে। সারাদিন খেটেখুটে শুয়েছে। আমাদের একটু দূরে চলে যাওয়া উচিত। তোমরা মাফলার, চাদর ভাল করে দিয়ে নাও গায়ে।

একদম খাদের ধারে একটা পাথরের ওপর বসেছে অনিমেষদা। বসার আগে বলেছে, আমি এই জায়গাটা বেছে নিলাম এই কারণে, আমার কথা যদি তোমাদের অবিশ্বাস হয়, ছোট্ট করে একটা ধাক্কা মারলে আমি ভ্যানিশ হয়ে যাব। কেউ সাক্ষী থাকবে না। পর্বত অভিযানে গিয়ে অনেকেই খাদে পড়ে যায়।

বিরক্তি দেখিয়ে সুগত বলেছিল, আপনি আসল কথায় আসুন।

BanglaBook.org

সেই আসল কথাটাই এখন বলছে অনিমেষদা, পৃথাকে তোমরা যখন থেকে কাঁদতে দেখছ, তার জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে আমি ঘরে ঢুকেছিলাম। বিশ্বাস না হয় লজ মালকিনকে জিজ্ঞেস করতে পারো। কিচেনে বসে মালকিনের সঙ্গে ছ্যাং খাচ্ছিলাম আমি।

তারপর? জানতে চায় বাপ্পা।

অনিমেষদা বলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমুল ঝগড়া, মারপিট, শাড়ি খুলে নেওয়া কখনওই সম্ভব নয়।

তা হলে কেন উনি আপনার নামে এরকম ব্লেম দিচ্ছেন? এই প্রশ্নটা সুগতর।

অনিমেষদা বলেন, পৃথা সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট। ও নিশ্চয়ই তোমাদের এখনও বলেনি। ওর দিদি সিজোফ্রেনিক। ওদের ফ্যামিলিতে মানসিক রোগের প্রাধান্য দেখা যায়। আমি সেইসব জেনেশুনে, পৃথাকে ভালবেসে বিয়ে করি। তখন পৃথার রোগটা তেমন বোঝা যেত না। উপসর্গগুলো ইদানীং খুব দেখা যাচ্ছে। সুইসাইড করার ঝোঁক ওই উপসর্গের একটা।

আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন? জেরার ভঙ্গিতে জানতে চায় বাপ্পা।

উত্তরে অনিমেষদা বলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুর পরামর্শ নিয়েছি। ওর কথামতো বেড়াতে এলাম, লাভ হল না। বেড়ে গেল। এর জন্য অবশ্য আমিই দায়ী।

কীরকম? সুগত বুঝতে চায় ব্যাপারটা।

আকাশে চাঁদের আলোয় আজ মোটামুটি জোর আছে। মুখ পড়া যাচ্ছে একে অপরের। অনিমেষদা বলে যান, ব্যাপারটা হয়েছে কী, আজ ভোরে এবং দুপুরে পৃথাকে আমি রায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখি। অনেক চেষ্টা করি নিজেকে সংযত রাখতে, পারি না। ইঙ্গিতে বলে ফেলি পৃথাকে। কী করব, পৃথাকে এখনও যে ভালবাসি আমি। সেটাই কাল হল, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে, পৃথা উলটো আঘাত হানল ...

রায়ন আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বজ্রপাত হয়নি, তবু তালা লেগে গেছে তার কানে। পাহাড়ের নীচে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই প্রথম পায়ের

BanglaBook.org

দিকে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখছে রায়ন। ওখানে আর একটা আকাশ! তার নীচের গ্রামে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।

অনিমেষদা নেমে আসছেন পাথরটা থেকে। শেষ কথাগুলো কানে ঢোকে রায়নের, প্রথম যখন দেখেছিলাম তোমাদের, বেশ ভাল লেগেছিল। ভদ্র, সভ্য, কালচারড ছেলে। তোমরা যে এমন লোলুপ টাইপের আগে ধরতে পারিনি। নিজেদের সম্মান বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করে বাপ্পা, পৃথাদির পায়ের কালশিটেটা কি পৃথাদি নিজেই ফেলেছেন? আপনি নিশ্চয়ই সেরকমই কিছু একটা বলবেন।

না, বলব না। ওই দাগটা পৃথার জুতোর থেকে হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে ট্রেক করার পর থেকে জুতোটা আর পরেনি। ওই দাগটাকে সুযোগমতো কাজে লাগিয়েছে।

তিনজনের মাঝখান দিয়ে ট্রেকার্স হাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ান অনিমেষদা। বলেন, তোমাদের একটা অনুরোধ। তোমরা আর পৃথার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না।

পাথরের মূর্তির মতো তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে খোলা আকাশের নীচে। ভীষণ ঠান্ডা! নিজেদের অনাবৃত, নগ্ন মনে হয়।

ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। আকাশের তারা জ্বলজ্বল করছে। তিন বন্ধু নেমে আসছে সান্দাকফু থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা নিজেদের বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে ফিরতে চায়। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা ফিরে পেতে হবে।

রায়নের মাথাঘোরা রোগ ফিরে এসেছে। মাঝেমধ্যেই বসে পড়ছে। সামনের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে সাপের ফেলে যাওয়া খোলস। সুগত বাপ্পা তাকে বলছে, এরকম করিস না রায়ন। একটু স্টেডি হ।

স্টেডি হতে পারছে কই রায়ন, আকাশ থেকে খসে পড়া তারা দেখলেই অদ্ভুত বিভ্রম জাগছে তার। যেমনটা বাবার অফিসের উঁচুতলার বারান্দা থেকে হয়েছিল। এখানে তারার ঝাঁপ দেওয়া দেখে মনে হচ্ছে পৃথাদিই লাফ দিচ্ছে অন্তহীন অন্ধকার খাদে।

BanglaBook.org

বারো

এক মাস কেটে গেছে। পৃথা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে শ্রীরামপুরে। যা সে কখনওই আসতে চায়নি। হার হয়েছে পৃথার।

রবিবার বিকেল। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অলসভাবে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। হাতটা থেমে যায়। এর থেকে বেশি কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না। রায়ন আসছে।

জানলা থেকে সরে আসে পৃথা। দিদিকে বলে, একজন আমাকে ডাকবে। বলে দিবি বাড়ি নেই। কখন ফিরব জানিস না।

রায়ন ডোরবেল টেপার আগেই দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে পৃথাদির আদলে অপ্রকৃতিস্থ চেহারার এক মহিলা। সম্ভবত পৃথাদির দিদি ইনিই। রায়ন বলে, পৃথাদি আছে?

না, নেই।

কখন ফিরবে?

সেটা পৃথাই জানে।

ঘরে বসে দিদিদের কথোপকথন শুনল পৃথা। রায়নের গলা শুনে এতটুকু বিচলিত হল না। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসছে দিদি। পৃথাকে জিজ্ঞেস করে, ছেলেটা কে রে বোন?

আমি ঠিক চিনি না। দিদির টাইপের উত্তর দেয় পৃথা। আজকাল দিদিকে নকল করে বেশ একটা রিলিফ পায়।

চিনিস না যদি, ছেলেটাকে জানলা দিয়ে দেখে কী করে আন্দাজ করলি, তোকেই ডাকতে আসছে?

দিদি এক এক সময় এমন স্বাভাবিক আচরণ করে, পৃথা দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। দিদির কথার উত্তর না দিয়ে, পৃথা মনে মনে দিদিকেই বলে, ছেলেটা আমার কল্পনার। কল্পনাকে পেতে চেয়েছিলাম তোকে নকল করে, অনিমেষের ছোট ছোট অত্যাচারগুলোকে একত্র করে নাটকীয় রূপ দিয়েছিলাম। আমার মিথ্যে বিশ্বাস করেনি ছেলেটা। ধরা পড়ে গেছি আমি।

দিদি যেন মনের কথা শুনতে পেল। বলল, এখন কী করবি দেখ,

BanglaBook.org

ছেলেটা বসে রইল দোরগোড়ায়। আমার কথার কোনও গুরুত্বই দিল না। কেউই দেয় না।

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে দিদি।এ ঘরে মিথ্যে,দরজার ওপারে কল্পনা। মিথ্যে দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। এই যাওয়াটুকুই হয়তো সত্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG